সহায়ক পাঠ

প্রোফেসর শঙ্কুর ডায়রি

সত্যজিৎ রায়

বাংলা । প্রথম ভাষা

নবম শ্রেণি

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে গঠিত 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-র সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি মাধ্যমিক স্তরে ২০১৫ সালের নতুন শিক্ষাবর্ষে বলবৎ করতে আমরা সচেষ্ট হয়েছি। সেই সূত্রে নবম শ্রেণির 'সাহিত্য সঞ্চয়ন'-এর সহায়ক পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে গৃহীত হয়েছে সত্যজিৎ রায়ের শঙ্কু-কাহিনি সংবলিত বই 'প্রোফেসর শঙ্কুর ডায়রি'। পাঠ্যপুস্তকের ছয়টি শঙ্কু-কাহিনি থাকলেও চিহ্নিত তিনটি গল্প পাঠ্যসূচির অন্তর্গত। এই গল্প-সংকলনে রয়েছে কল্পনা ও বিজ্ঞানের চমকপ্রদ সংমিশ্রণ। গল্পগুলি ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে লেখক-পুত্র সন্দীপ রায় আমাদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। শিল্পী সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় বইটির একটি আকর্ষণীয় প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন। তাঁকেও ধন্যবাদ জানাই। অভিনব এই উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড.পার্থ চ্যাটার্জীকে কৃতজ্ঞতা জানাই। রূপায়ণের ক্ষেত্রে 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-র সক্রিয়তা উল্লেখযোগ্য। তাঁদের ধন্যবাদ। আশা করা যায়, 'প্রোফেসর শঙ্কুর ডায়রি' শিক্ষার্থীদের সমাদর পাবে। বইটির উৎকর্ষবৃদ্ধি-র জন্য শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মতামত আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

ডিসেম্বর ২০১৭
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০ ০১৬

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়
সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
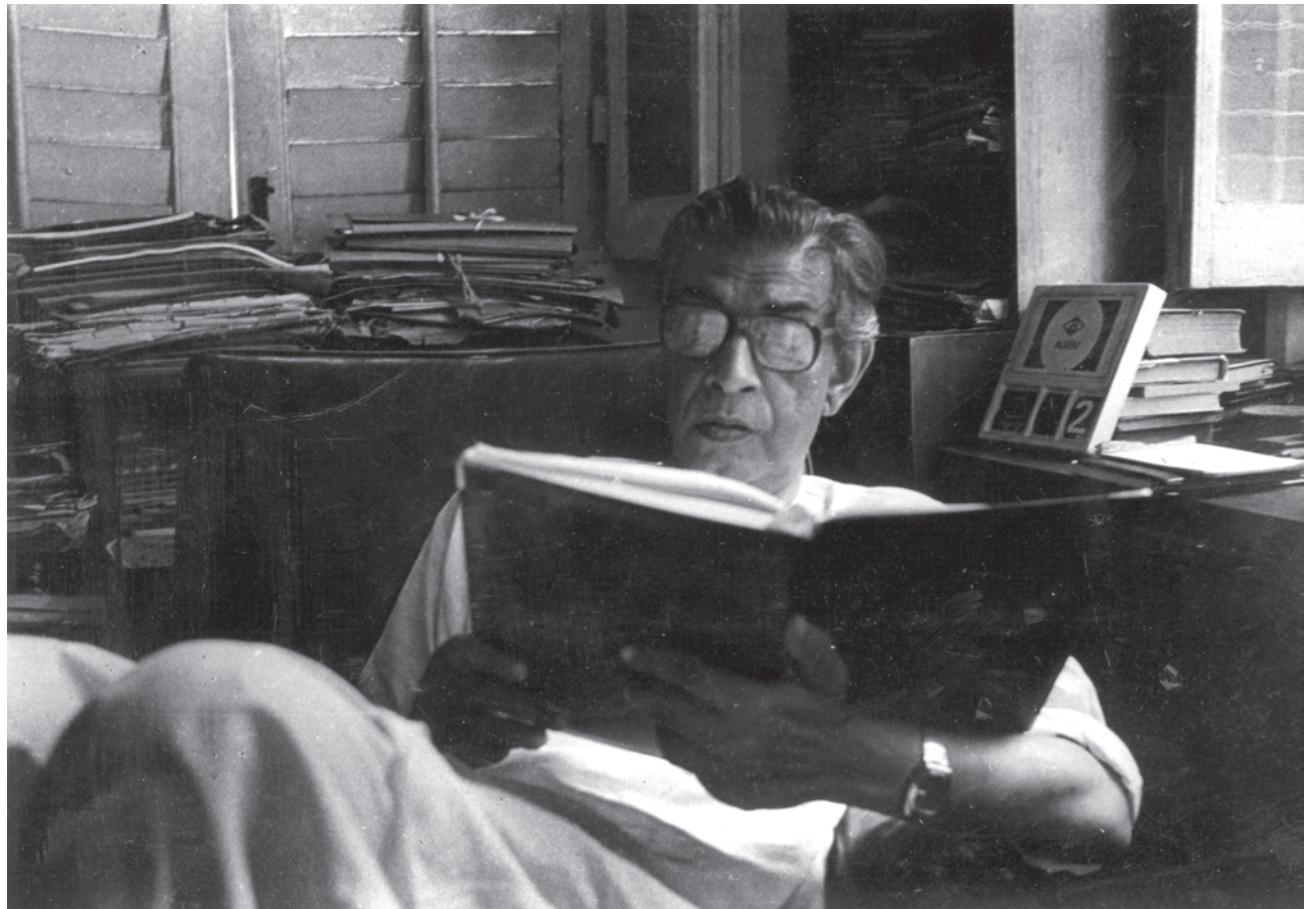
আলোকচিত্র সৌজন্য : হীরক সেন

সত্যজিৎ রায় (১৯২১ — ১৯৯২)

সূচনা-কথা

সত্যজিৎ রায়ের প্রোফেসর শঙ্কুর বিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনি পাঠ্যপুস্তক হিসেবে প্রকাশ হচ্ছে, এই সিদ্ধান্ত শুনে খুবই আনন্দ পেয়েছি। অনেক আগেই এই পদক্ষেপ অভিপ্রেত ছিল। নতুন পাঠক্রমে কাহিনিগুলি অন্তর্ভুক্ত করায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী এবং বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরকে সাধুবাদ জানাই। ছয়টি শঙ্কু-কাহিনি সংবলিত এই বইটির নাম — 'প্রোফেসর শঙ্কুর ডায়রি'। আমি নিশ্চিত, জমজমাট শঙ্কু-কাহিনি আর সেইসঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের অনবদ্য অলংকরণ নবম শ্রেণির পড়ুয়াদের মন জয় করবে।

১৬.১১.২০১৪

শুভেচ্ছাসহ

সন্দীপ রায়

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

সদস্য

অভীক মজুমদার (চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি) রথীন্দ্রনাথ দে (সদস্য-সচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

ঋত্বিক মল্লিক সৌম্যসুন্দর মুখোপাধ্যায় রুদ্রশেখর সাহা মিথুন নারায়ণ বসু

ইলোরা ঘোষ মির্জা

পুস্তক নির্মাণ

বিপ্লব মণ্ডল

সূ ◆ চি ◆ প ◆ ত্র

* চিহ্নিত পাঠগুলি পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত

প্রোফেসর শঙ্কু

প্রোফেসর শঙ্কু কে? তিনি এখন কোথায়? এটুকু জানা গেছে যে তিনি একজন বৈজ্ঞানিক।

কেউ কেউ বলে যে তিনি নাকি একটা ভীষণ পরীক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ হারান। আবার এও শোনা যায় যে তিনি কোনো অজ্ঞাত অঞ্চলে গা ঢাকা দিয়ে নিজের কাজ করে যাচ্ছেন, সময় হলেই আত্মপ্রকাশ করবেন।

প্রোফেসর শঙ্কুর প্রত্যেকটি ডায়রিতে কিছু না কিছু আশ্চর্য অভিজ্ঞতার বিবরণ আছে। কাহিনিগুলি সত্য কি মিথ্যা, সম্ভব কি অসম্ভব, সে বিচার পাঠকেরা করবেন!

ব্যোমযাত্রীর ডায়রি

প্রোফেসর ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কুর ডায়রিটা আমি পাই তারক চাটুজ্যের কাছ থেকে।

একদিন দুপুরের দিকে আপিসে বসে পুজো সংখ্যার জন্য একটা লেখার প্রুফ দেখছি, এমন সময় তারকবাবু এসে একটা লাল খাতা আমার সামনে ফেলে দিয়ে বললেন, 'পড়ে দেখো। গোল্ড মাইন।'

তারকবাবু এর আগেও কয়েকবার গল্পটল্প এনেছিলেন। খুব যে ভালো তা নয়; তবে বাবাকে চিনতেন, আর ছেঁড়া জামাটামা দেখে মনে হতো, ভদ্রলোক বেশ গরিব; তাই প্রতিবারই লেখাগুলোর জন্য পাঁচ-দশ টাকা করে দিয়েছি।

এবার গল্পের বদলে ডায়রিটা দেখে একটু আশ্চর্য হলাম।

প্রোফেসর শঙ্কু বছর পনেরো নিরুদ্দেশ। কেউ কেউ বলেন তিনি নাকি কী একটা ভীষণ এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে প্রাণ হারান। আবার এও শুনেছি যে তিনি নাকি জীবিত; ভারতবর্ষের কোনো অখ্যাত অজ্ঞাত অঞ্চলে গা ঢাকা দিয়ে চুপচাপ নিজের কাজ করে যাচ্ছেন, সময় হলে আত্মপ্রকাশ করবেন। এ-সব সত্যিমিথ্যে জানি না, তবে এটা জানতাম যে তিনি বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তাঁর যে ডায়রি থাকতে পারে সেটা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু সে ডায়রি তারকবাবুর কাছে এল কী করে?

জিজ্ঞেস করতে তারকবাবু একটু হেসে হাত বাড়িয়ে আমার মশলার কৌটোটা থেকে লবঙ্গ আর ছোটো এলাচ বেছে নিয়ে বললেন, 'সুন্দরবনের সে ব্যাপারটা মনে আছে তো?'

এই রে আবার বাঘের গল্প। তারকবাবু তাঁর সব ঘটনার মধ্যে বাঘ জিনিসটাকে যেভাবে টেনে আনেন সেটা আমার মোটেই ভালো লাগে না। তাই একটু বিরক্ত হয়েই বললাম, 'কোন ব্যাপারটার কথা বলছেন?'

'উল্কাপাত! ব্যাপার তো একটাই।'

ঠিক ঠিক। মনে পড়েছে। এটা সত্যি ঘটনা। কাগজে বেরিয়েছিল। বছরখানেক আগে একটা উল্কাখণ্ড সুন্দবনের মাথারিয়া অঞ্চলে এসে পড়েছিল। বেশ বড়ো পাথর। কলকাতার জাদুঘরে যেটা আছে তার প্রায় দ্বিগুণ। মনে আছে, কাগজে ছবি দেখে হঠাৎ একটা কালো মড়ার খুলি বলে মনে হয়েছিল।

বললাম, 'তার সঙ্গে এই খাতাটার কী সম্পর্ক?'

তারকবাবু বললেন, 'বলছি। ব্যস্ত হয়ো না। আমি গেসলাম ওই মওকায় যদি কিছু বাঘছাল জোটে। ভালো দর পাওয়া যায়, জান তো? আর ভাবলুম অত জন্তুজানোয়ার মোলো, তার মধ্যে কি গুটি চারেক বাঘও পড়ে থাকবে না? কিন্তু সে গুড়ে বালি। লেট হয়ে গেল। হরিণটরিণ কিচ্ছু নেই।'

'তা হলে?'

'ছিল কিছু গোসাপের ছাল। তাই নিয়ে এলুম। আর এই খাতাটা।'

একটু আবাক হয়ে বললাম, 'খাতাটা কি ওইখানে...?'

'গর্তের ঠিক মধ্যিখানে। পাথরটা পড়ায় একটা গর্ত হয়েছিল জান তো? তোমাদের চারখানা হেদো তার মধ্যে ঢুকে যায়। এটা ছিল তার ঠিক মধ্যিখানে।

'বলেন কী!'

'বোধহয় পাথরটা যেখানে পড়েছিল তার খুব কাছেই। লাল-লাল কী একটা মাটির ভেতর থেকে উঁকি মারছে দেখে টেনে তুললাম। তারপর খুলতেই শঙ্কুর নাম দেখে পকেটস্থ করলাম।'

'উল্কার গর্তের মধ্যে খাতা? তার মানে কি...?'

'পড়ে দেখো। সব জানতে পারবে। তোমরা তো বানিয়ে গল্পটল্প লেখো, আমিও লিখি। এ তার চেয়ে ঢের মজাদার। এ আমি হাতছাড় করতাম না, বুঝলে! নেহাত বড়ো টানাটানি যাচ্ছে তাই—'

টাকা বেশি ছিল না কাছে। তা ছাড়া ঘটনাটা পুরোপুরি বিশ্বাস হচ্ছিল না, তাই কুড়িটা টাকা দিলাম ভদ্রলোককে। দেখলাম তাতেই খুশি হয়ে আমায় আশীর্বাদ করে চলে গেলেন।

তার পর পুজোর গোলমালে খাতাটার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। এই সেদিন আলমারি খুলে চলন্তিকাটা টেনে বার করতে গিয়ে ওটা বেরিয়ে পড়ল।

খাতাটা হাতে নিয়ে খুলে কেমন যেন খটকা লাগল।

যতদূর মনে পড়ে প্রথমবার দেখেছিলাম কালির রং সবুজ। আর আজ দেখছি লাল? এ কেমন হলো?

খাতাটা পকেটে নিয়ে নিলাম। মানুষের তো ভুলও হয়। নিশ্চয়ই অন্য কোনো লেখার সবুজ কালির সঙ্গে গোলমাল করে ফেলেছি।

বাড়িতে এসে আবার খাতাটা খুলতেই বুকটা ধড়াস করে উঠল।

এবার দেখি কালির রং নীল।

তারপর এক আশ্চর্য অদ্ভুত ব্যাপার। দেখতে চোখের সামনে নীলটা হয়ে গেল হলদে।

এবার তো আর কোনো ভুল নেই; কালির রং সত্যি বদলাচ্ছে।

হাতের কাঁপুনিতে খাতাটা মাটিতে পড়ে গেল। আমার ভুলো কুকুরটা যা পায় তাতেই দাঁত বসায়। খাতাও বাদ গেল না। কিন্তু আশ্চর্য! যে দাঁত এই দু' দিন আগেই আমার নতুন তালতলার চটিটা ছিঁড়েছে, ওই খাতার কাগজ তার কামড়ে কিচ্ছু হলো না।

হাত দিয়ে টেনে দেখলাম এ কাগজ ছেঁড়া মানুষের সাধ্যি নয়।

টানলে রবারের মতো বেড়ে যাচ্ছে, আর ছাড়লে যে-কে-সেই।

কী খেয়াল হলো, একটা দেশলাই জ্বেলে কাগজটায় ধরালাম। পুড়ল না। খাতাটা পাঁচ ঘণ্টা উনুনের মধ্যে ফেলে রেখে দিলাম। কালির রং যেমন বদলাচ্ছিল, বদলাল, কিন্তু আর কিচ্ছু হলো না।

সেই দিনই রাত্রে ঘুমটুম ভুলে গিয়ে তিনটে অবধি জেগে খাতাটা পড়া শেষ করলাম। যা পড়লাম তা তোমাদের হাতে তুলে দিচ্ছি। এ সব সত্যি কি মিথ্যা, সম্ভব কি অসম্ভব, তা তোমরা বুঝে নিও।

১লা জানুয়ারি

আজ দিনের শুরুতেই একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটে গেল।

রোজকার মতো আজও নদীর ধারে মর্নিং ওয়াক সেরে ফেলেছি। শোবার ঘরে ঢুকতেই একটা বিদঘুটে চেহারার লোকের সামনে পড়তে হলো। চমকে গিয়ে চিৎকার করেই বুঝতে পারলাম যে ওটা আসলে আয়না, এবং লোকটা আর কেউ নয়—আমারই ছায়া। এ ক'বছরে আমারই চেহারা ওই রকম হয়েছে। আমার আয়নার প্রয়োজন হয় না বলে ওটার ওপর ক্যালেন্ডারটা টাঙিয়ে রেখেছিলাম; আজ সকালেই বোধহয় প্রহ্লাদটা বছর শেষ হয়ে গেছে বলে সর্দারি করে ওটাকে নামিয়ে রেখেছে। ওকে নিয়ে আর পারা গেল না। সাতাশ বছর ধরে আমার সঙ্গে থেকে আমার কাজ করেও ওর বুদ্ধি হলো না। আশ্চর্য!

চিৎকার শুনে প্রহ্লাদ ঘরে এসে পড়েছিল। ওকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার মনে করে আমার Snuff-gun বা নস্যাস্ত্রটা ওর ওপর পরীক্ষা করা গেল। দেখলাম, এ নস্যির যা তেজ, তাক করে গোঁফের কাছাকাছি মারতে পারলেই যথেষ্ট কাজ হয়! এখন রাত এগারোটা। ওর হাঁচি এখনও থামেনি। আমার হিসাব যদি ঠিক হয় তো তেত্রিশ ঘণ্টার আগে ও হাঁচি থামবে না।

২রা জানুয়ারি

রকেটটা নিয়ে যে চিন্তাটা ছিল, ক্রমেই সেটা দূর হচ্ছে। যাবার দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই মনে জোর পাচ্ছি, উৎসাহ পাচ্ছি।

এখন মনে হচ্ছে যে প্রথমবারের কেলেঙ্কারিটার জন্য একমাত্র প্রহ্লাদই দায়ী। ঘড়িটায় দম দিতে গিয়ে সে যে ভুল করে কাঁটাটাই ঘুরিয়ে ফেলেছে তা আর জানব কী করে। এক সেকেন্ড এ দিক ও দিক হলেই এ সব কাজ পণ্ড হয়ে যায়। আর কাঁটা ঘোরানোর ফলে আমার হয়ে গেল প্রায় সাড়ে তিনঘণ্টা লেট। রকেট যে খানিকটা উঠেই গোঁৎ খেয়ে পড়ে যাবে তাতে আর আশ্চর্য কী?

রকেট পড়ায় অবিনাশবাবুর মুলোর ক্ষেত নষ্ট হওয়ার দরুন ভদ্রলোক পাঁচশো টাকা ক্ষতিপূরণ চাইছেন। একেই বলে দিনে ডাকাতি। এ দিকে এত বড় একটা প্রচেষ্টা যে ব্যর্থ হতে চলেছিল তার জন্য কোনো আক্ষেপ বা সহানুভূতি নেই।

এই সব লোককে জব্দ করার জন্য একটা নতুন কোনো অস্ত্রের কথা ভাবা দরকার।

৫ই জানুয়ারি

প্রহ্লাদটা বোকা হলেও ওকে সঙ্গে নিলে হয়তো সুবিধে হবে। আমি মোটেই বিশ্বাস করি না যে এই ধরনের অভিযানে কেবলমাত্র বুদ্ধিমান লোকেরই প্রয়োজন। অনেক সময় যাদের বুদ্ধি কম হয় তাদের সাহস বেশি হয়, কারণ ভয় পাবার কারণটা ভেবে বের করতেও তাদের সময় লাগে।

প্রহ্লাদ যে সাহসী সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সে বার যখন কড়িকাঠ থেকে একটা টিকটিকি আমার বাইকর্নিক অ্যাসিডের শিশিটার উপর পড়ে সেটাকে উলটে ফেলে দিল, তখন আমি সামনে দাঁড়িয়ে থেকেও কিছু করতে পারছিলাম না। স্পষ্ট দেখছি অ্যাসিডটা গড়িয়ে গড়িয়ে প্যারাডক্সাইট পাউডারের স্তূপটার দিকে চলেছে, কিন্তু দুটোর কনট্যাক্ট হলে যে কী সাংঘাতিক ব্যাপার হবে তাই ভেবেই আমার হাত পা অবশ হয়ে আসছে।

এমন সময় প্রহ্লাদ ঢুকে কাণ্ডকারখানা দেখে এক গাল হেসে হাতের গামছাটা দিয়ে অ্যাসিডটা মুছে ফেলল। আর পাঁচ সেকেন্ড দেরি হলেই আমি, আমার ল্যাবরেটারি, বিধুশেখর, প্রহ্লাদ, টিকটিকি এ সব কিছুই থাকত না।

তাই ভাবছি হয়তো ওকে নেওয়াই ভালো। ওজনেও কুলিয়ে যাবে। প্রহ্লাদ হলো দু'মন সাত সের, আমি এক মন এগারো সের, বিধুশেখর সাড়ে পাঁচ মন, আর জিনিসপত্তর সাজসরঞ্জাম মিলিয়ে মন পাঁচেক। আমার রকেটে কুড়ি মন পর্যন্ত জিনিস নির্ভয়ে নেওয়া চলতে পারে।

৬ই জানুয়ারি

আমার রকেটের পোশাকটার আস্তিনে কতগুলো উচ্চিংড়ে ঢুকেছিল, আজ সকালে সেগুলো ঝেড়েঝুড়ে বার করছি, এমন সময় অবিনাশবাবু এসে হাজির। বললেন, 'কী মশাই, আপনি তো চাঁদপুর না মঙ্গলপুর কোথায় চললেন। আমার টাকাটার কী হলো?'

এই হলো অবিনাশবাবুর রসিকতার নমুনা। বিজ্ঞানের কথা উঠলেই ঠাট্টা আর ভাঁড়ামো। রকেটটা যখন প্রথম তৈরি করছি তখন একদিন এসে বললেন, 'আপনার ওই হাউইটা এই কালীপুজোর দিনে ছাড়ুন না। ছেলেরা বেশ আমোদ পাবে!'

এক-এক সময় মনে হয় যে পৃথিবীটা যে গোল এবং সেটা যে ঘুরতে ঘুরতে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে সেটাও বোধহয় অবিনাশবাবু বিশ্বাস করেন না।

যাই হোক; আজ আমি তাঁর ঠাট্টায় কান না দিয়ে বরং উলটে তাঁকে খুব খাতির টাতির করে বসতে বললাম। তারপর প্রহ্লাদকে বললাম চা আনতে। আমি জানতাম যে অবিনাশবাবু চায়ে চিনির বদলে স্যাকারিন খান। আমি স্যাকারিনের বদলে ঠিক সেই রকমই দেখতে একটি বড়ি তাঁর চায়ে ফেলে দিলাম। এই বড়িই হলো আমার নতুন অস্ত্র। মহাভারতের জৃম্ভণাস্ত্র থেকেই

আইডিয়াটা এসেছিল, কিন্তু এটায় যে শুদ্ধ হাই উঠবে তা নয়। হাই-এর পর গভীর ঘুম হবে এবং সেই ঘুমের মধ্যে সব অসম্ভব ভয়ংকর রকমের স্বপ্ন দেখতে হবে।

আমি নিজে কাল চার ভাগের এক ভাগ বড়ি ডালিমের রসে ডাইলিউট করে খেয়ে দেখেছি। সকালে উঠে দেখি স্বপ্ন দেখে ভয়ের চোটে দাড়ির বাঁ দিকটা একেবারে পেকে গেছে।

৮ই জানুয়ারি

নিউটনকে সঙ্গে নেব। কদিন ধরেই আমার ল্যাবরেটরির আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছে এবং করুণস্বরে ম্যাও ম্যাও করছে। বোধহয় বুঝতে পারছিল যে আমার যাবার সময় হয়ে আসছে।

কাল ওকে Fish Pillটা খাওয়ালাম। মহা খুশি।

আজ মাছের মুড়ো আর বড়ি পাশাপাশি রেখে পরীক্ষা করে দেখলাম। ও বড়িটাই খেল। আর কোনো চিন্তা নেই! এবার চটপট ওর জন্য একটা পোশাক আর হেলমেট তৈরি করে ফেলতে হবে।

১০ই জানুয়ারি

দু'দিন থেকে দেখছি বিধুশেখর মঝে মাঝে একটা গাঁ গাঁ শব্দ করছে। এটা খুবই আশ্চর্য, কারণ বিধুশেখররের তো শব্দ করার কথা নয়। কলকজ্জার মানুষ কাজ করতে বললে চুপচাপ কাজ করবে; এক নড়াচড়ার যা ঠং ঠং শব্দ। ও তো আমারই হাতের তৈরি, তাই আমি জানি ওর কতখানি ক্ষমতা। আমি জানি ওর নিজস্ব বুদ্ধি বা চিন্তাশক্তি বলে কিছু থাকতেই পারে না। কিন্তু বেশ কিছুদিন থেকেই মাঝে মাঝে এর ব্যতিক্রম লক্ষ করছি।

এক দিনের ঘটনা খুব বেশি করে মনে পড়ে।

আমি তখন সবে রকেটের পরিকল্পনাটা করছি। জিনিসটা যে কোনো সাধারণ ধাতু দিয়ে তৈরি হতে পারে না, সেটা প্রথমেই বুঝেছিলাম। অনেক এক্সপেরিমেন্ট করার পর, ব্যাঙের ছাতা, সাপের খোলস আর কচ্ছপের ডিমের খোলা মিশিয়ে একটা কমপাউন্ড তৈরি করেছি এবং বেশ বুঝতে পারছি যে এবার হয় ট্যানট্রাম বোরোপ্যাক্সিনেট, না-হয় একুইয়স্ ভেলোসিলিকা মেশালেই ঠিক জিনিসটা পেয়ে যাব।

প্রথমে ট্যানট্রামটাই দেখা যাক ভেবে এক চামচ ঢালতে যাব এমন সময়ে ঘরে একটা প্রচণ্ড ঘটাং ঘটাং শব্দ আরম্ভ হলো। চমকে গিয়ে পিছন ফিরে দেখি বিধুশেখরের লোহার মাথাটা ভীষণভাবে এপাশ-ওপাশ হচ্ছে এবং তাতেই আওয়াজ হচ্ছে। খুব জোর দিয়ে বারণ করতে গেলে মানুষে যেভাবে মাথা নাড়ে ঠিক সেই রকম।

কী হয়েছে দেখতে যাব মনে করে ট্যানট্রামটা যেই হাত থেকে নামিয়েছি অমনি মাথা নাড়া থেমে গেল।

কাছে গিয়ে দেখি কোনো গোলমাল নেই। কলকজ্জা তেলটেল সবই ঠিক আছে। টেবিলে ফিরে এসে আবার যেই ট্যানট্রামটা হাতে নিয়েছি অমনি আবার ঘটাং ঘটাং।

এ তো ভারী বিপদ! বিধুশেখর কি সত্যিই বারণ করছে নাকি?

এবার ভেলোসিলিকাটা হাতে নিলাম। নিতেই আবার সেই শব্দ। কিন্তু এবার মাথা নড়ছে উপর নীচে ঠিক যেমন করে মানুষে হ্যাঁ বলে।

শেষ পর্যন্ত ভেলোসিলিকা মিশিয়েই ধাতুটা তৈরি হলো।

পরে ট্যানট্রামটা দিয়েও পরীক্ষা করে দেখেছিলাম। না করলেই ভালো ছিল। সেই চোখ-ধাঁধানো সবুজ আলো আর বিস্ফোরণের বিকট শব্দ কোনোদিন ভুলব না।

১১ই জানুয়ারি

আজ বিধুশেখরের কলকব্জা খুলে ওকে ভালো করে পরীক্ষা করেও ওর আওয়াজ করার কোনো কারণ খুঁজে পেলাম না। তবে এও ভেবে দেখলাম যে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আমি আগেও অনেকবার দেখেছি যে আমার বৈজ্ঞানিক বিদ্যেবুদ্ধি দিয়ে আমি যে জিনিস তৈরি করি, সেগুলো অনেক সময়েই আমার হিসেবের বেশি কাজ করে। তাতে এক এক সময় মনে হয়েছে যে হয়তো বা কোনো অদৃশ্য শক্তি আমার অজ্ঞাতে আমার উপর খোদকারি করছে। কিন্তু সত্যিই কি তাই? বরঞ্চ আমার মনে হয় যে আমার ক্ষমতার দৌড় যে ঠিক কতখানি তা হয়তো আমি নিজেই বুঝতে পারি না। খুব বড়ো বড়ো বৈজ্ঞানিকদের শুনেছি এ রকম হয়।

আর একটা কথা আমার প্রায়ই মনে হয়। সেটা হচ্ছে, বাইরের কোনো জগতের প্রতি আমার যেন একটা টান আছে, এই টানটা লিখে বোঝানো শক্ত। মাধ্যাকর্ষণের ঠিক উলটো কোনো শক্তি যদি কল্পনা করা যায়, তা হলে এটার একটা আন্দাজ পাওয়া যাবে। মনে হয় যেন পৃথিবীর প্রভাব ছাড়িয়ে যদি কিছুদূর উপরে উঠতে পারি, তা হলেই এই টানটা আপনা থেকেই আমাকে অন্য কোনো গ্রহে টহে নিয়ে গিয়ে ফেলবে।

এ টানটা যে চিরকাল ছিল তা নয়। একটা বিশেষ দিন থেকে এটা আমি অনুভব করে আসছি। সেই দিনটার কথা আজও বেশ মনে আছে।

বারো বছর আগে। আশ্বিন মাস। আমি আমার বাগানে একটা আরামকেদারায় শুয়ে শরৎকালের মৃদু মৃদু বাতাস উপভোগ করছি। আশ্বিন-কার্তিক মাসটা আমি রোজ রাত্রে খাবার পরে তিন ঘণ্টা এই ভাবে শুয়ে থাকি, কারণ এই দুটো মাসে উল্কাপাত হয় সবচেয়ে বেশি। এক ঘণ্টায় অন্তত আট-দশটা উল্কা রোজই দেখা যায়। আমার দেখতে ভারি ভালো লাগে।

সে দিন কতক্ষণ শুয়ে ছিলাম খেয়াল নেই হঠাৎ একটা উল্কা দেখলাম যেন একটু অন্য রকম। সেটা ক্রমশ বড়ো হচ্ছে, এবং মনে হলো যেন আমার দিকেই আসছে। আমি একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম। উল্কাটা ক্রমে ক্রমে কাছে এসে আবার বাগানের পশ্চিম দিকের গোলঞ্চ গাছটার পাশে থেমে একটা প্রকাণ্ড জোনাকির মতো জ্বলতে লাগল। সে এক আশ্চর্য দৃশ্য!

আমি উল্কাটাকে ভালো করে দেখব বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে যেতেই আমার ঘুমটা ভেঙে গেল।

এটাকে স্বপ্ন বলেই বিশ্বাস করতাম, কিন্তু দুটো কারণে খটকা রয়ে গেল। এক হলো ওই আকর্ষণ, যেটার বশে আমি তার পরদিন থেকেই রকেটের বিষয় ভাবতে শুরু করি।

আরেক হলো এই গোলঞ্চ গাছ। সেই দিন থেকেই গাছটাতে গোলঞ্চর বদলে একটা নতুন রকমের ফুল হচ্ছে। এ রকম ফুল কেউ কোথাও দেখেছে কি না জানি না। আঙুলের মতো পাঁচটা করে ঝোলা ঝোলা পাপড়ি। দিনেরবেলা কুচকুচে কালো কিন্তু রাত হলেই ফসফরাসের মতো জ্বলতে থাকে। আর যখন হাওয়ায় দোলে তখন ঠিক মনে হয় যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

১২ই জানুয়ারি

কাল ভোর পাঁচটায় মঙ্গলযাত্রা।

আজ প্রহ্লাদকে ল্যাবরেটরিতে ডেকে এনে ওর পোশাক আর হেলমেটটা পরিয়ে দেখলাম। ও তো হেসেই অস্থির। সত্যি কথা বলতে কী আমারও ওর চেহারা ও হাবভাব দেখে হাসি পাচ্ছিল। এমন সময় একটা ঠং ঠং ঘং ঘং শব্দ শুনে দেখি বিধুশেখর তার লোহার চেয়ারটায় বসে দুলছে আর গলা দিয়ে একটা নতুন রকম শব্দ করছে। এই শব্দের মানে একটাই হতে পারে। বিধুশেখরও প্রহ্লাদকে দেখে হাসছিল।

নিউটন হেলমেটটা পরানোর সময় একটু আপত্তি করেছিল। এখন দেখছি বেশ চুপচাপ আছে, আর মাঝে মাঝে জিভ বার করে হেলমেটের কাচটা চেটে চেটে দেখছে।

২১শে জানুয়ারি

আমরা সাত দিন হলো পৃথিবী ছেড়েছি। এ বার যাত্রায় কোনো বাধা পড়েনি। ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় রওনা হয়েছি।

যাত্রী এবং মালপত্র নিয়ে ওজন হলো পনেরো মন বত্রিশ সের তিন ছটাক। পাঁচ বছরের মতো রসদ আছে সঙ্গে। নিউটনের এক-একটা Fish Pill-এ সাত দিনের খাওয়া হয়ে যায়। আমার আর প্রহ্লাদের জন্য বটফলের রস থেকে যে বড়িটা তৈরি করেছিলাম—বটিক-ইন্ডিকা—কেবল মাত্র সেইটাই নিয়েছি। বটিকা-ইন্ডিকার একটা হোমিওপ্যাথিক বড়ি খেলেই পুরো চব্বিশ ঘণ্টার জন্য খিদে তেষ্টা মিটে যায়। এক মন বড়ি সঙ্গে আছে।

নিউটনের এত ছোটো জায়গায় বেশিক্ষণ বন্ধ থেকে অভ্যাস নেই তাই বোধ হয় প্রথম ক'দিন একটু ছটফট করেছিল। কাল থেকে দেখছি আমার টেবিলের উপর বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাইরের দৃশ্য দেখছে। কুচকুচে কালো আকাশ, তার মধ্যে অগণিত জ্বলন্ত গ্রহনক্ষত্র। নিউটন দেখে আর মাঝে মাঝে আস্তে লেজের ডগাটা নাড়ে। ওর কাছে বোধ হয় ওগুলোকে অসংখ্য বেড়ালের চোখের মতো মনে হয়।

বিধুশেখরের কোনো কাজকর্ম নেই, চুপচাপ বসে থাকে। ওর মন বা অনুভূতি বলে যদি কিছু থেকেও থাকে সেটা ওর গোল গোল বলের মতো নিষ্পলক কাচের চোখ দেখে বোঝবার কোনো উপায় নেই।

প্রহ্লাদের দেখছি বাইরের দৃশ্য সম্পর্কে কোনো কৌতূহলই নেই, ও বসে বসে কেবলমাত্র রামায়ণ পড়ে। ভাগ্যে বাংলাটা শিখেছিল আমার কাছে।

২৫শে জানুয়ারি

বিধুশেখরকে বাংলা শেখাচ্ছি। বেশ সময় লাগবে বলে মনে হচ্ছে, তবে চেষ্টা আছে। প্রহ্লাদ যে ওর উচ্চারণের ছিরি দেখে হাসে, সেটা ও মোটেই পছন্দ করে না। দু-একবার দেখেছি ও মুখ দিয়ে গঁ গঁ আওয়াজ করছে আর পা দুটো ঠং ঠং করে মাটিতে ঠুকছে। ওর লোহার হাতের একটা বাড়ি খেলে যে কী দশা হবে সেটা কি প্রহ্লাদ বোঝে না?

আজ বিধুশেখরকে পরীক্ষা করবার জন্য জিজ্ঞেস করলাম, 'কেমন লাগছে?'

ও প্রশ্নটা শুনে দু-তিন সেকেন্ড চুপ করে থেকে হঠাৎ দুলতে আরম্ভ করল, কিছুক্ষণ সামনে পিছনে দুলে তারপর হাত দুটোকে পরস্পরের কাছে এনে ঠং ঠং করে তালির মতো বাজাল। দু-পায়ে খানিকটা সোজা হয়ে উঠে ঘাড়টাকে চিত করে বলল, 'গাগোঃ'।

ও যে আসলে বলতে চাচ্ছিল, 'ভালো' সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

আজ মঙ্গলগ্রহটাকে একটা বাতাবিলেবুর মতো দেখাচ্ছে। আমার হিসেব অনুযায়ী আরেক মাস পরে ওখানে পৌঁছব। এই ক' মাস নির্বিঘ্নে কেটেছে। প্রহ্লাদ রামায়ণ শেষ করে মহাভারত ধরেছে।

আজ সকালে দূরবিন দিয়ে গ্রহটাকে দেখছি এমন সময় খেয়াল হলো বিধুশেখর কী জানি বিড়বিড় করছে। প্রথমে মন দিইনি, তারপর লক্ষ করলাম যে বেশ লম্বা একটা কথা বারবার বলছে। প্রতিবার একই কথা। আমি সেটা খাতায় নোট করে নিলাম, এই রকম দাঁড়াল।

'ঘঙো ঘাংঙ কুঁক্ক ঘঙা আগাঁকেকেই ককুং খঙা।'

লেখাটা পড়ে এবং ওর কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ বুঝতে পারলাম ও কী বলছে। কিছুদিন আগে দ্বিজু রায়ের একটা গান গুনগুন করে গাইছিলাম, এটা তারই প্রথম লাইন—'ধনধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা'।

বিধুশেখরের উচ্চারণের প্রশংসা করতে না পারলেও ওর স্মরণশক্তি দেখে অবাক হয়ে গেলাম।

জানালা দিয়ে এখন মঙ্গলগ্রহ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। আস্তে আস্তে গ্রহের গায়ের রেখাগুলি স্পষ্ট হয়ে আসছে। কাল এই সময়ে ল্যান্ড করব। অবিনাশবাবুর ঠাট্টার কথা মনে পড়লে হাসি পায়।

আমাদের যে সমস্ত জিনিস সঙ্গে নিয়ে নামতে হবে সেগুলো গুছিয়ে রেখেছি—ক্যামেরা, দূরবিন, অস্ত্রশস্ত্র, ফার্স্ট-এড বক্স, এ সবই নিতে হবে।

মঙ্গলগ্রহে যে প্রাণী আছে, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। তবে তারা যে কী রকম—ছোটো কি বড়ো, হিংস্র না অহিংস্র—তা জানি না। একেবারে মানুষের মতো কিছু হবে সেটাও অসম্ভব বলে মনে হয়। যদি বিদ্‌ঘুটে কোনো প্রাণী হয় তা হলে প্রথমটা ভয়ের কারণ হতে পারে। কিন্তু এটা মনে রাখা দরকার যে আমরা যেমন তাদের কখনও দেখিনি, তারাও কখনও মানুষ দেখেনি।

প্রহ্লাদকে দেখলাম তার ভয়–ভাবনা নেই। সে দিব্যি নিশ্চিন্ত আছে। তার বিশ্বাস গ্রহের নাম যখন মঙ্গল তখন সেখানে কোনো অনিষ্ট হতেই পারে না। আমিও ওর সরল বিশ্বাসে—

তখন ডায়রি লিখতে লিখতে এক কাণ্ড হয়ে গেল। বিধুশেখরকে কদিন থেকেই একটু চুপচাপ দেখছিলাম, কেন তা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। এখনও প্রশ্ন করলে ঠিক উত্তর দিতে পারে না। কেবল কোনো একটা কথা বললে সেটা শুনে নকল করার চেষ্টা করে।

আজ চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ কী যে হলো এক লাফে যন্ত্রপাতির বোর্ডটার কাছে উঠে গিয়ে যে হ্যান্ডেলটা টানলে রকেটটা উলটো দিকে যায় সেইটা ধরে প্রচণ্ড টান। আমরা তো ঝাঁকুনির চোটে সব কেবিনের মেঝেয় গড়াগড়ি।

কোনোমতে উঠে গিয়ে বিধুশেখরের কাঁধের বোতামটা টিপতেই ও বিকল হয়ে হাত-পা মুড়ে পড়ে গেল। তারপর হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে মোড় ফিরিয়ে আবার মঙ্গলের দিকে যাত্রা।

বিধুশেখরের এরকম পাগলামির কারণ কী? ওকে আপাতত অকেজো করেই রেখে দেবো। ল্যান্ড করবার পর আবার বোতাম টিপে চালু করব। আমার বিশ্বাস ওর 'মনের' উপর চাপ পড়ছিল বেশি, বড্ড বেশি কথা বলা হয়েছে ওর সঙ্গে, তাই বোধহয় ওর 'মাথাটা' বিগড়ে গিয়েছিল।

আর পাঁচ ঘণ্টা আছে আমাদের ল্যান্ড করতে। গ্রহের গায়ে যে নীল জায়গাগুলো প্রথমে জল বলে মনে হয়েছিল, সেটা এখন অন্য কিছু বলে মনে হচ্ছে। সরু সরু লাল সুতোগুলো যে কী এখনও বুঝতে পারছি না।

আমরা দু' ঘণ্টা হলো মঙ্গলগ্রহে নেমেছি। একটা হলদে রঙের নরম 'পাথরের' ঢিপির উপরে বসে আমি ডায়রি লিখছি। এখানে গাছপালা মাটি পাথর সবই কেমন জানি নরম রবারের মতো।

সামনেই হাত বিশেক দূরে একটা লাল নদী বয়ে যাচ্ছে। সেটাকে প্রথমে নদী বলে বুঝিনি কারণ 'জল'টা দেখলে ঠিক মনে হয় যেন স্বচ্ছ পেয়ারার জেলি। এখানে সব নদীই বোধহয় লাল। এবং সেগুলোকেই আকাশ থেকে লাল সুতোর মতো দেখায়। যেটাকে রকেট থেকে জল বলে মনে হয়েছিল সেটা আসলে ঘাস আর গাছপালা—সবই সবুজের বদলে নীল। আকাশের রং কিন্তু সবুজ, তাই সব কী রকম উলটো মনে হয়।

এখন পর্যন্ত কোনো প্রাণী চোখে পড়েনি। আমার হিসেব তা হলে ভুল হলো নাকি? কোনো সাড়াশব্দও পাচ্ছি না? কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। এক নদীর জলের কুলকুল শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দই নেই; আশ্চর্য নিস্তব্ধ।

ঠান্ডা নেই; বরঞ্চ গরমের দিকে। কিন্তু মাঝে মাঝে এক একটা হাওয়া আসে, সেটা ক্ষণস্থায়ী হলেও একেবারে হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয়। দূরে হয়তো বরফের পাহাড় টাহাড় জাতীয় কিছু আছে।

নদীর জলটা প্রথমে পরীক্ষা করতে সাহস পাচ্ছিলাম না। তারপর নিউটনকে খেতে দেখে ভরসা পেলাম। আঁজলা করে তুলে চেখে দেখি অমৃত! মনে পড়ল একবার গারো পাহাড়ে একটা ঝরনার জল খেয়ে আশ্চর্য ভালো লেগেছিল। কিন্তু এর কাছে সে জল কিছুই না। এক ঢোঁক খেয়েই শরীর ও মনের সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গেল।
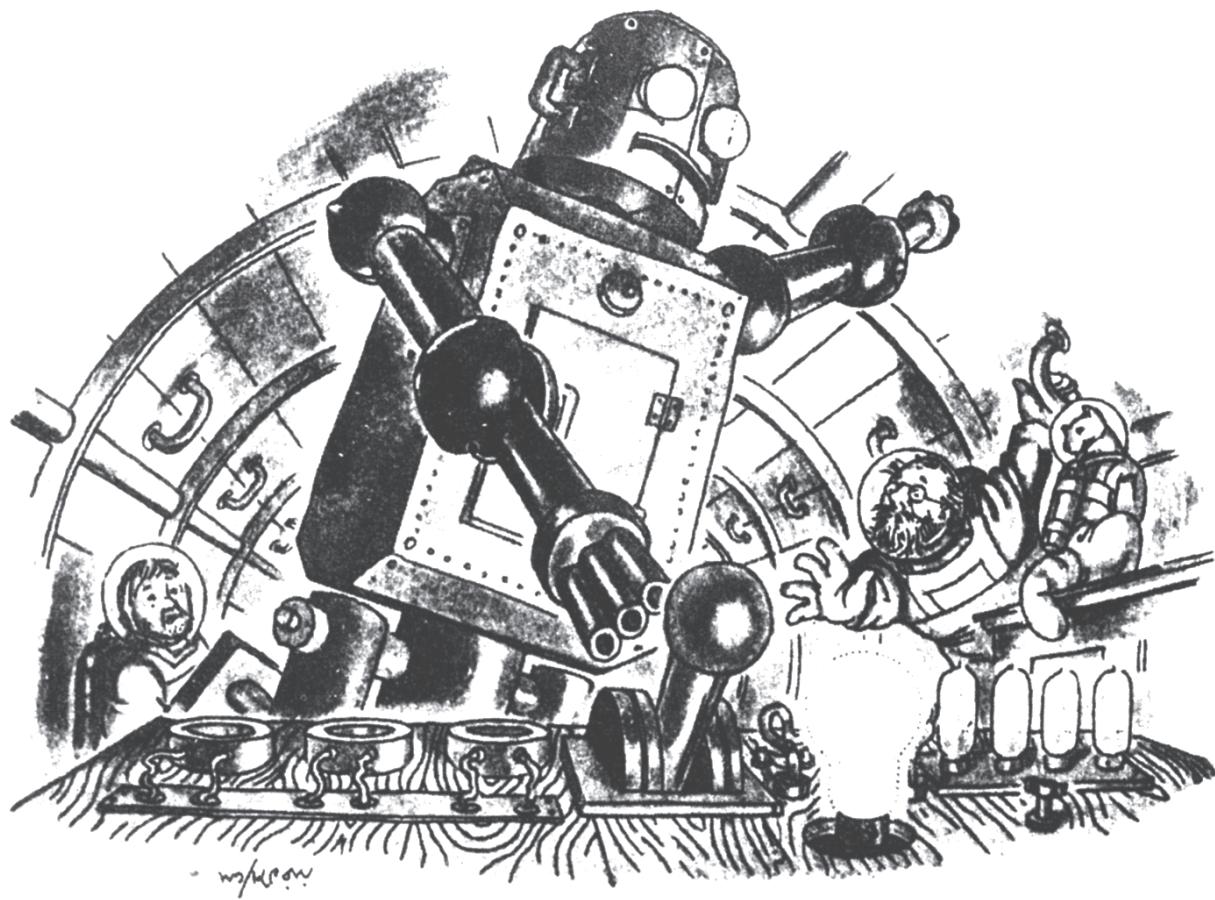
বিধুশেখরকে নিয়ে আজ এক ফ্যাসাদ। ওর যে কী হয়েছে জানি না। রকেট ল্যান্ড করার পর বোতাম টিপে ওকে চালু করে দিলাম, কিন্তু নড়েও না চড়েও না। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হয়েছে, তুমি নামবে না?'

ও মাথা নেড়ে না বলল।

বললাম, 'কেন, কী হয়েছে?'

এবার বিধুশেখর হাত দুটো মাথার উপর তুলে গম্ভীর ভয়-পাওয়া গলায় বলল, 'বিভং'।

বিধুশেখরের ভাষা বুঝতে আমার কোনো অসুবিধা হয় না। তাই বুঝলাম ও বলছে, 'বিপদ'। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী বিপদ বিধুশেখর? কীসের ভয়?'

বিধুশেখর আবার গম্ভীর গলায় বলল, 'বিভং ভীবং বিভং'।

বিপদ! ভীষণ বিপদ।

অগত্যা বিধুশেখরকে রকেটে রেখেই আমরা তিনটি প্রাণী মঙ্গলগ্রহের মাটিতে পদার্পণ করলাম।

প্রথম পরিচয়ের অবাক ভাবটা দু'ঘণ্টার মধ্যে অনেকটা কেটে গেছে। নতুন জগতের যে একটা গন্ধ থাকতে পারে সেটা ভাবতে পারিনি। রকেট থেকে নেমেই সেটা টের পেলাম। এটা গাছপালা জলমাটির গন্ধ নয়—কারণ আলাদা করে প্রত্যেকটা জিনিস শুঁকে দেখেছি। এটা মঙ্গলগ্রহেরই গন্ধ, আবহাওয়ার সঙ্গে মিশে রয়েছে। হয়তো পৃথিবীরও একটা গন্ধ রয়েছে যেটা আমরা টের পাই না, কিন্তু অন্য কোনো গ্রহের লোক সেখানে গেলেই পাবে।

প্রহ্লাদ পাথর কুড়িয়ে বেরাচ্ছে। ওকে বলছি কোনো প্রাণীটানি দেখলে আমায় খবর দিতে।

একদিকের আকাশে দেখছি সবুজ রঙে লালের ছোপ পড়েছে। এখন তা হলে বোধহয় ভোর, শিগগিরই সূর্য উঠবে।

মঙ্গলগ্রহের বিভীষিকা মন থেকে দূর হতে কত দিন লাগবে জানি না। কী করে যে প্রাণ নিয়ে বাঁচলাম সেটা ভাবতে এখনও অবাক লাগে। মঙ্গল যে কত অমঙ্গল হতে পারে, সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি।

ঘটনাটা ঘটল প্রথম দিনই!

সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমি টিলার উপর থেকে উঠে জায়গাটা দিনের আলোয় একটু ভালো করে ঘুরে দেখব ভাবছি। এমন সময় একটা আঁশটে গন্ধ আর একটা অদ্ভুত শব্দ শুনতে পেলাম। ঠিক মনে হলো যেন একটা বেশ বড়ো রকমের ঝিঁঝি 'তিন্তিড়ি তিন্তিড়ি' বলে ডাকছে। আওয়াজটা কোন দিক থেকে আসছে সেটা বুঝবার চেষ্টা করছি এমন সময় একটা বিকট চিৎকারে আমার রক্ত জল হয়ে গেল।

তারপর দেখলাম প্রহ্লাদকে, তার চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, ডান হাতের মুঠোয় নিউটনকে ধরে উর্ধ্বশ্বাসে এক-এক লাফে বিশ-পঁচিশ হাত করে রকেটের দিকে চলেছে।

তার পিছু নিয়েছে যে জিনিসটা সেটা মানুষও নয়, জন্তুও নয়, মাছও নয় কিন্তু তিনের সঙ্গেই কিছু কিছু মিল আছে। লম্বায় তিন হাতের বেশি নয়, পা আছে, কিন্তু হাতের বদলে মাছের মতো ডানা, বিরাট মাথায় মুখজোড়া দন্তহীন হাঁ, ঠিক মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা সবুজ চোখ, আর সর্বাঙ্গে মাছের মতো আঁশ সকালের রোদে চিকচিক করছে।

জন্তুটা ভালো ছুটতে পারে না, পদে পদে হোঁচট খাচ্ছে। তাই হয়তো প্রহ্লাদের নাগাল পাবে না।

আমার যেটা সবচেয়ে সাংঘাতিক অস্ত্র সেটা হাতে নিয়ে আমি জন্তুটার পিছনে রকেটের দিকে ছুটলাম প্রহ্লাদের যদি অনিষ্ট হয় তা হলেই অস্ত্রটা ব্যবহার করব, নয়তো প্রাণীহত্যা করব না।

আমি যখন জন্তুটার থেকে বিশ কি পঁচিশ গজ দূরে, তখনই প্রহ্লাদ রকেটে উঠে পড়েছে। কিন্তু এবারে আরেক কাণ্ড। বিধুশেখর এক লাফে রকেট থেকে নেমে জন্তুটাকে রুখে দাঁড়াল।

ব্যাপার দেখে আমিও থমকে দাঁড়ালাম। এমন সময় একটা দমকা হাওয়ার সঙ্গে আবার সেই আঁশটে গন্ধটা পেয়ে ঘুরেই দেখি ঠিক ওইটার মতো আরও অন্তত দু'-তিনশো জন্তু দূর থেকে দুলতে দুলতে রকেটের দিকে এগিয়ে আসছে। তাদের মুখ দিয়ে সেই বিকট ঝিঁঝির শব্দ—'তিন্তিড়ি! তিন্তিড়ি! তিন্তিড়ি! তিন্তিড়ি! তিন্তিড়ি—'

বিধুশেখরের লোহার হাতের এক বাড়িতেই জন্তুটা 'চী' শব্দ করে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে মাটিতে পড়ে গেল। পাছে ও রোখের মাথায় একাই ওই মঙ্গলীয় সৈন্যকে আক্রমণ করে, তাই দৌড়ে গিয়ে বিধুশেখরকে জাপটে ধরলাম। কিন্তু ওর গোঁ সাংঘাতিক, আমায় সুদ্ধ হিঁচড়ে টেনে নিয়ে জন্তুগুলোর দিকে এগিয়ে চলল। আমি কোনোমতে কাঁধের কাছে হাতটা পৌঁছিয়ে বোতামটা টিপে দিলাম, বিধুশেখর অচল হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

এ দিকে মঙ্গলীয় সৈন্য এখন একশো গজের মধ্যে। তাদের আঁশটে গন্ধে আমার মাথা ঘুরছে। ভৌতিক তিন্তিড়ি চিৎকারে কান ভোঁ ভোঁ করছে।

এখন এই পাঁচ-মনি যন্ত্রের মানুষটাকে রকেটে ওঠাই কী করে?

প্রহ্লাদকে ডেকে উত্তর পেলাম না।

কী বুদ্ধি হলো, হাত দিয়ে বিধুশেখরের কোমরের কবজাটা খুলতে লাগলাম। বুঝতে পারছি মঙ্গলীয় সৈন্যের ঢেউ দুলতে দুলতে ক্রমশই এগিয়ে আসছে। আড়চোখে চেয়ে দেখি এখন প্রায় হাজার জন্তু, রোদ পড়ে তাদের আঁশের চকচকানিতে প্রায় চোখ ঝলসে যায়!
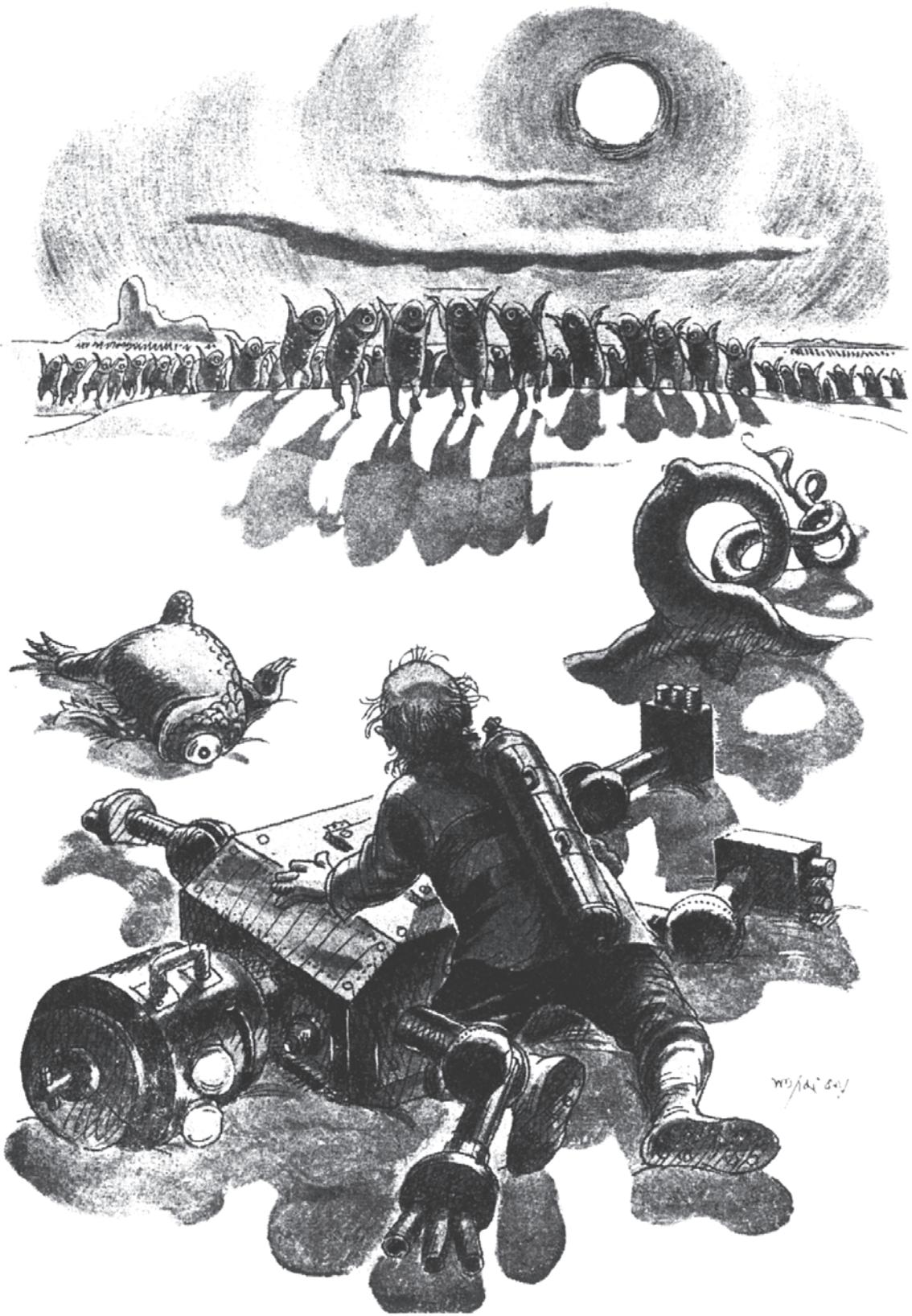
কোনোমতে বিধুশেখরকে দু'ভাগে ভাগ করে ফেলে তার মাথার অংশটা টানতে টানতে রকেটের দরজার সামনে এনে ফেললাম। এবার পায়ের দিকটা। সৈন্য এখন পঞ্চাশ গজের মধ্যে। আমার হাত পা অবশ হয়ে আসছে। অস্ত্রের কথা ভুলে গিয়েছি।

পা ধরে টানতে টানতে বিধুশেখরের তলার অংশটা যখন রকেটের দরজায় এনে ফেললাম, তখন দেখি প্রহ্লাদের জ্ঞান হয়েছে। সে এরই মধ্যে ওপরের দিকটা ক্যাবিনের ভিতর তুলে দিয়েছে।

বাকি অংশটা ভিতরে তুলে ক্যাবিনের দরজা বন্ধ করার ঠিক আগের মুহূর্তে আমার পায়ে একটা ঠান্ডা স্যাঁতস্যাতে ঝাপটা অনুভব করলাম।

তারপর আর কিছুই মনে ছিল না।

যখন জ্ঞান হলো দেখি রকেট উড়ে চলেছে। আমার ডান পায়ে একটা চিনচিনে যন্ত্রণা ও ক্যাবিনের মধ্যে একটা মেছো গন্ধ এখনও রয়ে গেছে।

কিন্তু রকেটটা উড়ল কী করে? চালাল কে? প্রহ্লাদ তো যন্ত্রপাতির কিছুই জানে না। আর বিধুশেখর তো এখনও দু'খান হয়ে পড়ে আছে। তবে কি আপনিই উড়ল নাকি? কিন্তু তাই যদি হয় তবে কোথায় চলেছে এই রকেট? কোথায় যাচ্ছি আমরা? সৌরজগতের অগণিত গ্রহনক্ষত্রের মধ্যে কোনটিতে গিয়ে আমাদের পাড়ি শেষ হবে? শেষ কি হবে, না অনির্দিষ্ট কাল আমাদের আকাশপথে অজানা উদ্দেশে ঘুরে বেড়াতে হবে?

কিন্তু রসদ? সে তো অফুরন্ত নয়। আর তিন বছর পরে আমরা খাব কী?

রকেটের যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করে দেখছি তার কোনোটাই কাজ করছে না। এই অবস্থায় রকেটের চলবারই কথা নয়। কিন্তু তাও আমরা চলেছি। কী করে চলেছি জানি না, কিছুই জানি না।

মনে অসংখ্য প্রশ্ন গিজগিজ করছে। কিন্তু কোনোটারই উত্তর দেবার শক্তি আমার নেই।

আজ থেকে আমি অজ্ঞান অসহায়।

ভবিষ্যৎ অজ্ঞেয়, অন্ধকার।

এখনও আমরা একইভাবে উড়ে চলেছি।

কিছু দেখবার নেই, তাই জানালাটা বন্ধ করে রেখেছি।

প্রহ্লাদ এখন অনেকটা সামলে নিয়েছে। দাঁতকপাটি লাগাটাও কমেছে। নিউটনের অরুচিটাও কমেছে। মঙ্গলীয়ের গায়ে দাঁত বসানোর ফলেই বোধহয় ওটা হয়েছিল। কাণ্ডই বটে! প্রহ্লাদের কথাবার্তা এখনও অসংলগ্ন, কিন্তু যেটুকু বলেছে তার থেকে বুঝেছি যে নদীর ধারে পাথর কুড়োতে কুড়োতে সে হঠাৎ একটা আঁশটে গন্ধ পায়। তাতে সে মুখ তুলে দেখে কিছু দূরেই একটা না-মানুষ না-জন্তু না-মাছ নদীর ধারে দাঁড়িয়ে আছে। আর নিউটন লেজ খাড়া করে চোখ বড়ো বড়ো করে গুটি গুটি সেটার দিকে এগোচ্ছে। প্রহ্লাদ কিছু করার আগেই নিউটন নাকি এক লাফে জন্তুটার কাছে গিয়ে তার হাঁটুতে এক কামড় দেয়। তাতে সেটা ঝিঁঝির মতো এক বিকট চিৎকার করে পালিয়ে যায়। কিন্তু তার পরমুহূর্তেই নাকি ঠিক ওইরকম আরেকটা জন্তু কোথা থেকে এসে প্রহ্লাদকে তাড়া করে। তার পরের ঘটনা অবিশ্যি আমার নিজের চোখেই দেখা।

বিধুশেখর আশ্চর্য সাহসের পরিচয় দিয়েছিল। তাই খুশি হয়ে এ-ক'দিন আমি ওকে বিশ্রাম দিয়েছি। আজ সকালে প্রহ্লাদ ও আমি ওকে জোড়া দিয়ে ওর কাঁধের বোতাম টিপে দিতেই ও স্পষ্ট উচ্চারণে বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ'।

তারপর থেকেই ও আমার সঙ্গে বেশ পরিষ্কার ভাবে প্রায় মানুষের মতো কথা বলছে। কিন্তু কেন জানি না ও চলতি ভাষা না বলে শুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করছে। বোধহয় এতদিন প্রহ্লাদের মুখে রামায়ণ মহাভারত শোনার ফল।

আর সময়ের হিসেব নেই। সন-তারিখ সব গুলিয়ে গেছে। রসদ আর কয়েক দিনের মতো আছে। শরীর মন অবসন্ন। প্রহ্লাদ আর নিউটন নির্জীবের মতো পড়ে আছে। কেবল বিধুশেখরের কোনো গ্লানি নেই। ও বিড়বিড় করে সেই কবে প্রহ্লাদের মুখে শোনা ঘটোৎকচবধের অংশটা আবৃত্তি করে যাচ্ছে।

আজও সেই ঝিমধরা ভাবটা নিয়ে বসেছিলাম এমন সময় বিধুশেখর হঠাৎ তার আবৃত্তি থামিয়ে বলে উঠল, 'বাহবা, বাহবা, বাহবা'।

আমি বললাম, 'কী হলো বিধুশেখর, এত ফুর্তি কীসের?'

বিধুশেখর বলল, 'গবাক্ষ উদ্‌ঘাটন করহ'।

এর আগে বিধুশেখরের কথা না শুনে ঠকেছি। তাই হাত বাড়িয়ে জানালাটা খুলে দিলাম। খুলতেই চোখঝলসানো দৃশ্য আমায় কিছুক্ষণের জন্য অন্ধ করে দিল। যখন দৃষ্টি ফিরে পেলাম, দেখি আমরা এক অদ্ভুত অবিশ্বাস্য জগতের মধ্য দিয়ে উড়ে চলেছি। যত দূর চোখ যায় আকাশময় কেবল বুদ্‌বুদ্‌ ফুটছে আর ফাটছে, ফুটছে আর ফাটছে। এই নেই এই আছে, এই আছে এই নেই।

অগুনতি সোনার বল আপনা থেকেই বড়ো হতে হতে হঠাৎ ফেটে সোনার ফোয়ারা ছড়িয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে।

আমি যে অবাক হব তাতে আর আশ্চর্য কী। কিন্তু প্রহ্লাদ যে প্রহ্লাদ, সেও এই দৃশ্য দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারেনি। আর নিউটন? সে ক্রমাগত ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে জানালার কাচটা খামচাচ্ছে, পারলে যেন কাচ ভেদ করে বাইরে চলে যায়।

সে দিন থেকে আর জানালা বন্ধ করিনি। কারণ কখন যে কোন বিচিত্র জগতের মধ্যে এসে পড়ি তার ঠিক নেই। খিদেতেষ্টা ভুলে গেছি। ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্য পরিবর্তন হচ্ছে। এখন দেখছি সারা আকাশময় সাপের মতো কিলবিলে সব আলো এদিক ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে। এক একটা জানালার খুব কাছে এসে পড়ে, আর কেবিনের ভেতরটা আলো হয়ে ওঠে। এ যেন সৌরজগতের কোনও বাদশাহের উৎসবে আতসবাজির খেলা।

আজকের অভিজ্ঞতা এক বিধুশেখর ছাড়া আমাদের সকলের ঘাম ছুটিয়ে দিয়েছিল। আকাশভর্তি বিশাল বিশাল গোলাকৃতি এবড়োখেবড়ো পাথরের চাঁই। তাদের গায়ের সব গহ্বরের ভিতর থেকে অগ্ন্যুদ্‌গার হচ্ছে। আমরা সেই পাথরের ফাঁক দিয়ে ফাঁক দিয়ে কলিশন বাঁচিয়ে বিদ্যুৎবেগে ছুটে চলেছি। প্রহ্লাদ ক্রমাগত ইষ্টনাম জপ করছে। নিউটন টেবিলের তলায় ঢুকে থরথর করে কাঁপছে। কতবার মনে হয়েছে এই বুঝি গেলাম। কিন্তু রকেট ঠিক শেষ মুহূর্তে ম্যাজিকের মতো মোড় ঘুরে নিজের পথ বেছে নিয়ে বেরিয়ে গেছে।

আমরা ভয়ে মরছি, কিন্তু বিধুশেখরের ভ্রুক্ষেপ নেই। সে তার চেয়ারে বসে দুলছে ও মধ্যে মধ্যে 'টাফা' বলছে।

এই একটা নতুন কথা কদিনই ওর মুখে শুনছি। বোধহয় বাইরের দৃশ্য দেখে তারিখ করে 'তোফা' কথাটা বলতে গিয়ে টাফা বলছে। আজ নিউটনকে বড়ি খাওয়াচ্ছি এমন সময় বিধুশেখর হঠাৎ এক লাফে জানালার কাছে গিয়ে 'টাফা' বলে চিৎকার করে উঠল। আমি জানালার দিকে তাকিয়ে দেখি—আকাশে আর কিছু নেই, কেবল একটা ঝলমলে সাদা গ্রহ নির্মল নিষ্কলঙ্ক একটি চাঁদের মতো আমাদের দিকে চেয়ে আছে।

রকেটটা নিঃসন্দেহে ওই গ্রহটার দিকেই এগিয়ে চলেছে। বিধুশেখরের কথা যদি সত্যি হয় তা হলে ওটার নাম টাফা।

আজ জানালা দিয়ে অপূর্ব দৃশ্য। টাফার সর্বাঙ্গে যেন অসংখ্য জোনাকি জ্বলছে আর নিবছে। সেই আলোয় আমাদের কেবিনও আলো হয়ে গেছে। আমার সেই স্বপ্নের জোনাকির কথা মনে পড়েছে। মন আজ সকলেরই খুশি।

শেষ পর্যন্ত হয়তো আমাদের অভিযান ব্যর্থ হবে না।

টাফার দূরত্ব দেখে আন্দাজে মনে হচ্ছে কালই হয়তো আমরা ওখানে পৌঁছে যাব। গ্রহটা ঠিক কী রকম দেখতে সেটা ওই জোনাকিগুলোর জন্য বোঝবার উপায় নেই।

আজ বিধুশেখর যে সব কথাগুলো বলছিল সেগুলো বিশ্বাস করা কঠিন। আমি ক'দিন থেকেই ওর অতিরিক্ত ফুর্তি দেখে বুঝেছি যে ওর 'মাথা'টা হয়তো আবার গোলমাল করছে।

ও বলল টাফায় নাকি সৌরজগতের প্রথম সভ্য লোকেরা বাস করে। পৃথিবীর সভ্যতার চেয়ে ওদের সভ্যতা নাকি বেশ কয়েক কোটি বছরের পুরানো! ওদের প্রত্যেকটি লোকই নাকি বৈজ্ঞানিক এবং এত বুদ্ধিমান লোক একসঙ্গে হওয়াতে নাকি ওদের অনেক দিন থেকেই অসুবিধে হচ্ছে। তাই কয়েক বছর থেকেই নাকি ওরা অন্যান্য সব গ্রহ থেকে একটি কমবুদ্ধি লোক বেছে নিয়ে টাফায় আনিয়ে বসবাস করাচ্ছে।

আমি বললাম, 'তা হলে ওদের প্রহ্লাদকে পেয়ে খুব সুবিধে হবে বলো'। তাই শুনে বিধুশেখর ঠং ঠং করে হাততালি দিয়ে এমন বিশ্রীরকম অট্টহাসি আরম্ভ করল যে আমি বাধ্য হয়ে তার কাঁধের বোতামটা টিপে দিলাম।

কাল টাফায় পৌঁছেছি। রকেট থেকে নেমে দেখি বহুলোক আমায় অভ্যর্থনা করতে এসেছে। লোক বলছি, কিন্তু এরা আসলে মোটেই মানুষের মতো নয়। অতিকায় পিঁপড়ে জাতীয় একটা কিছু কল্পনা করতে পারলে এদের চেহারার কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যাবে। বিরাট মাথা, আর চোখ, কিন্তু সেই অনুপাতে হাত-পা-সরু—যেন কোনো কাজেই লাগে না। এদের সম্বন্ধে বিধুশেখর যা

বলেছিল তা যে একদম ভুল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমার বিশ্বাস ব্যাপারটা আসলে ঠিক তার উলটো। অর্থাৎ এরা মানুষের অবস্থা থেকে এখনও অনেক পিছিয়ে আছে, এবং সে অবস্থায় পৌঁছতে ঢের সময় লাগবে।

টাফার অবস্থা যে পৃথিবীর তুলনায় কত আদিম তা এতেই বেশ বোঝা যায় যে এদের ঘরবাড়ি বলে কিছু নেই—এমনকী গাছপালাও নেই। এরা গর্ত দিয়ে মাটির ভিতর ঢুকে যায় এবং সেখানেই বাস করে। অবিশ্যি আমাকে এরা ঠিক আমার দেশের বাড়ির মতো একটা বাড়ি দিয়েছে। কেবল ল্যাবরেটরিটাই নেই, আর সবই যেমন ছিল ঠিক তেমনি।

প্রহ্লাদ ও নিউটন দিব্যি আছে। নতুন গ্রহে এসে নতুন পরিবেশে যে বাস করছে সে বোধটাই যেন নেই।

বিধুশেখরকেই কেবল দেখতে পাচ্ছি না, ও কাল থেকেই উধাও। টাফা সম্পর্কে এতগুলো মিথ্যে কথা বলে হয়তো আর মুখ দেখানোর সাহস নেই।

আজ থেকে ডায়রি লেখা বন্ধ করব—কারণ এখানে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটার কোনো সম্ভাবনা দেখছি না। খাতাটা পৃথিবীতে ফেরত পাঠানোর কোনো উপায় নেই এটা খুব আক্ষেপের বিষয়। এত মূল্যবান তথ্য রয়েছে এতে! এখানকার মূর্খরা তো মর্ম কিছুই বুঝবে না—আর এ দিকে আমাকেও ফিরে যেতে দেবে না।

ফিরে যাওয়ার খুব যে একটা প্রয়োজন বোধ করছি তাও নয়—কারণ এরা সত্যি আমায় খুবই যত্নে রেখেছে। বোধ হয় ভাবছে যে আমার কাছ থেকে অনেক কিছু আদায় করে নেবে।

এরা বাংলাটা জানল কী করে জানি না—তবে তাতে একটা সুবিধা হয়েছে যে ধমক টমক দিলে বোঝে। সে দিন একটা পিঁপড়েকে ডেকে বললাম, 'কই হে, তোমাদের বৈজ্ঞানিক-টৈজ্ঞানিকরা সব কোথায়? তাদের সঙ্গে একটু কথাটথা বলতে দাও। তোমরা যে ভয়ানক পিছিয়ে আছ।'

তাতে লোকটা বলল, 'ও সব বিজ্ঞানটিজ্ঞান দিয়ে আর কী হবে? যেমন আছেন থাকুন না। আমরা মাঝে মাঝে আপনার কাছে আসব। আপনার সহজ সরল কথাবার্তা শুনতে আমাদের ভারি ভালো লাগে।'

আহা! যত সব ন্যাকামো।

আমি রেগে গিয়ে আমার নস্যির বন্দুকটা নিয়ে লোকটার ঠিক নাকের ফুটোয় তাক করে মারলাম।

কিন্তু তাতে ওর কিছু হলো না।

হবে কী করে? এরা যে এখনও হাঁচতেই শেখেনি!

[অনেকে হয়তো জানতে চাইবে প্রোফেসর শঙ্কুর ডায়রিটা কোথায় এবং এমন আশ্চর্য জিনিসটাকে দেখবার কোনো উপায় আছে কি না। আমার নিজের ইচ্ছে ছিল যে, ডায়রিটা ছাপানোর পর ওর কাগজ ও কালিটা কোনো বৈজ্ঞানিককে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে তারপর ওটাকে জাদুঘরে দিয়ে দেবো। সেখানে থাকলে অবিশ্যি সকলের পক্ষেই দেখা সম্ভব। কিন্তু তা হবার জো নেই। না থাকার কারণটা আশ্চর্য। লেখাটা কপি করে প্রেসে দেবার পর সেই দিনই বাড়ি এসে শোবার ঘরের তাক থেকে ডায়রিটা নামাতে গিয়ে দেখি জায়গাটা ফাঁকা। তারপর একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখলাম। ডায়রির পাতার কিছু গুঁড়ো আর লাল মলাটটার ছোট্ট একটা অংশ তাকের উপর আছে। এবং তার উপর ক্ষিপ্রপদে ঘোরাফেরা করছে প্রায় শ-খানেক বুভুক্ষু ডেঁয়োপিঁপড়ে। এরা পুরো খাতাটাকে খেয়ে শেষ করেছে এবং ওই সামান্য বাকি অংশটুকু আমার চোখের সামনেই উদরসাৎ করে ফেলল। আমি কেবল হাঁ করে চেয়ে রইলাম।

যে জিনিসটাকে অক্ষয় অবিনশ্বর বলে মনে হয়েছিল, সেটা হঠাৎ পিঁপড়ের খাদ্যে পরিণত হলো কী করে সেটা আমি এখনও ভেবে ঠাহর করতে পারিনি। তোমরা এর মানে কিছু বুঝতে পারছ কি?]

সন্দেশ। আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ ১৩৬৮

প্রোফেসর শঙ্কু ও আশ্চর্য পুতুল

আজ আমার জীবনে একটা স্মরণীয় দিন! সুইডিস অ্যাকাডেমি অফ সায়ান্স আজ আমাকে ডক্টর উপাধি দান করে আমার গত পাঁচ বছরের পরিশ্রম সার্থক করল। এক ফলের বীজের সঙ্গে আর এক ফলের বীজ মিশিয়ে এমন আশ্চর্য সুন্দর, সুগন্ধ, সুস্বাদু ও পুষ্টিকর নতুন ফল যে তৈরি হতে পারে, এটা আমার এই রিসার্চের আগে কেউ জানত না। গতবছর সুইডেনের বৈজ্ঞানিক স্‌ভেন্ডসেন আমার গিরিডির ল্যাবরেটরিতে এসে আমার ফলের নমুনা দেখে এবং চেখে একেবারে থ। দেশে ফিরে গিয়ে কাগজে লেখালেখির ফলে আমার এই আবিষ্কারের কথা বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে! আমার আজকের এই সম্মানের জন্য স্‌ভেন্ডসেন অনেকখানি দায়ী। তাই এখন ডায়রি লিখতে বসে তাঁর প্রতি মন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠেছে।

সুইডেনে আগে আসিনি। এসে ভালোই লাগছে। সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেশ। এটা মে মাস— তাই চব্বিশ ঘণ্টাই সূর্য দেখছি। কিন্তু সে সূর্য কেমন ঘোলাটে, নিস্তেজ। সবসময়ই মনে হয় সন্ধ্যা হয়ে আছে। শীতকালে যখন রাত ফুরোতে চায় না তখন না জানি লোকের মনের অবস্থা কেমন হয়। শুনেছি ছ মাস রাত্রের পর প্রথম সূর্যের আলো দেখে এখানের লোক নাকি আনন্দে আত্মহারা হয়ে আত্মহত্যা করে। আমরা যারা বিষুবরেখার কাছাকাছি থাকি, তারা বোধ হয় ভালোই আছি। বেশি উত্তরে ঠান্ডা দেশে যারা থাকে তাদের হিংসে করার কোনো কারণ নেই।

এখানের কাজ সেরে নরওয়েতে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। এর অবিশ্যি একটা কারণ আছে! বছর চারেক আগে যখন ইংলন্ডে যাই তখন বিখ্যাত প্রাণীতত্ত্ববিদ প্রোফেসর আর্চিবল্ড অ্যাক্রয়েডের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ আলাপ হয়। সাসেক্সে তাঁর কটেজে একটা উইক এন্ডও কাটিয়ে এসেছিলাম। অ্যাক্রয়েডও তখন নরওয়ে যাব যাব করছেন, কারণ সেখানে নাকি 'লেমিং' বলে ইঁদুর জাতীয় এক অদ্ভুত জানোয়ার বাস করে— সেইটে তিনি স্টাডি করবেন। লেমিং এক আশ্চর্য প্রাণী। বছরের কোনো একটা সময় এরা কাতারে কাতারে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে সমুদ্রের দিকে যাত্রা করে। পথে শেয়াল, নেকড়ে, ঈগল পাখি ইত্যাদির আক্রমণ অগ্রাহ্য করে খেতের ফসল নিঃশেষ করে, সব শেষে সমুদ্রে পৌঁছে সেই সমুদ্রের জলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে!

দুঃখের বিষয় অ্যাক্রয়েডের স্টাডি বোধ হয় অসমাপ্ত থেকে গিয়েছিল, কারণ গিরিডি থাকতেই কাগজে পড়েছিলাম, নরওয়ে ভ্রমণের সময় তাঁর মৃত্যু হয়। অ্যাক্রয়েডের পক্ষে যেটা সম্ভব হয়নি, আমার দ্বারা সেটা হয় কি না দেখব বলেই নরওয়ে যাওয়ার কথা ভাবছিলাম।

রাত্রে ডিনারের পর হোটেলে ফেরার কিছু পরে আমার ঘরের দরজায় টোকা পড়ল, তখনও আমার মাথায় লেমিং-এর চিন্তাই ঘুরছিল। দরজা খুলে দেখি একটি মাঝবয়সি লম্বা ভদ্রলোক, মাথায় সোনালি চুল, চোখে সোনার চশমা, আর সেই চশমার পুরু কাচের পিছনে এক জোড়া তীক্ষ্ণ নীল চোখ। ভদ্রলোক ঠোঁট ফাঁক করে অল্প হেসে যখন তাঁর পরিচয় দিলেন তখন লক্ষ করলাম তাঁর একটা দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো। তাঁর কথা জানলাম তাঁর বাস নরওয়ের সুলিটেল্‌মা শহরে। নাম গ্রেগর লিন্ডকুইস্ট। লোকটি নাকি শিল্পী, বিখ্যাত লোকদের প্রতিকৃতি তৈরি করেন ঠিক পুতুলের মতো করে। অর্থাৎ গায়ের রং, চুল, নখ, পোশাকটোশাক সব আসল মানুষের মতোই, কেবল সাইজ ছ ইঞ্চির বেশি নয়।

একথা সেকথার পর একটু বিনয়ী, কিন্তু কিন্তু ভাব করে বললেন 'আপনি যদি আমার ওখানে দিনকতক আতিথ্য গ্রহণ করেন তা হলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হব, সেই অবসরে আপনার একটি পুতুল-প্রতিকৃতি গড়ে নিতে পারব।' লিন্ডকুইস্ট আরো বললেন যে তাঁর কালেকশনে নাকি কোনো বিখ্যাত ভারতীয়ের পুতুল-মূর্তি নেই, এবং আমি এই প্রস্তাবে রাজি হলে নাকি তিনি নিজেকে ধন্য মনে করবেন।

কথায় কথায় আমার লেমিং সম্পর্কে জানবার আগ্রহটাও প্রকাশ পেয়ে গেল। তাতে ভদ্রলোক বললেন, লেমিং-এর সন্ধানে বনবাদাড়ে ঘোরার আগে তিনি তাঁর বাড়িতেই নাকি একটি লেমিং সংগ্রহ করে আমাকে দেখাতে পারবেন। এর পরে আর আমার কিছু বলার রইল না।

আগামি বৃহস্পতিবার ভদ্রলোকের সঙ্গেই নরওয়ে যাত্রা করব স্থির করেছি।

১৭ই মে

দু'দিন হলো সুলিটেল্‌মা শহরে এসেছি। নরওয়ের উত্তরপ্রান্তে কিয়োলেন উপত্যকায় এ শহরটি ভারী মনোরম। আশেপাশে তামার খনি রয়েছে, আর শহরের পশ্চিমদিকে প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে সুলিটেল্‌মা পর্বতশৃঙ্গ। ৬০০০ ফিটের মতো হাইট, কাজেই আমাদের হিমালয়ের এক একটি শৃঙ্গের কাছে একে সামান্য টিলা বলে মনে হবে। কিন্তু নরওয়েতে এই শৃঙ্গ উচ্চতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

লিন্ডকুইস্ট আমাকে পরম যত্নে রেখেছেন। এঁর বাড়ির আশেপাশে আর কোনো বাড়িটাড়ি চোখে পড়ে না। এমনিই নরওয়ে দেশটায় লোকসংখ্যা কম, তার মধ্যেও লিন্ডকুইস্ট যেন একটি জনবিরল পরিবেশ বেছেই নিয়েছে। আমার এতে কোনো আপত্তি নেই। আমাদের গিরিডির বাড়িটাও নিরিবিলি জায়গা বেছেই তৈরি করেছিলাম আমি।

লেমিং এখনও দেখা হয়নি। দু'এক দিন সময় চেয়ে নিয়েছে লিন্ডকুইস্ট। এতেও আপত্তি নেই — কারণ আমি হাতে কিছুটা সময় নিয়েই দেশ ছেড়েছি। আপাতত বিশ্রামের প্রয়োজন। ট্রাউট মাছ খাচ্ছি আর খুব ভালো cheese খাচ্ছি। সব মিলিয়ে বেশ আরামে আছি।

তবে লিন্ডকুইস্টের একটা বাতিক মাঝে মাঝে কেমন যেন অসোয়াস্তির সৃষ্টি করে। সে আমার দিকে প্রায়ই একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। কথা বলার সময় চাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু যখন দু'জনে চুপচাপ বসে থাকি, তখনও মাঝে মাঝে অনুভব করি যে সে স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে। আজ সকালে এর কারণটা জিজ্ঞেস না করে পারলাম না। লিন্ডকুইস্ট বিন্দুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে বলল, কোনো লোকের পোর্ট্রেট করার আগে কিছুদিন যদি ভালো করে তাকে দেখা যায়, তা হলে মূর্তি গড়ার সময় শিল্পীর কাজ সহজ হয়ে যায় এবং যার পোর্ট্রেট হচ্ছে তাকেও আর একটানা বেশিক্ষণ পাথরের মতো দাঁড়িয়ে বা বসে থাকতে হয় না।

আমার আরেকটা প্রশ্ন আরও চেপে রাখতে পারলাম না। বললাম, 'আপনার পুতুলগুলি কবে দেখাবেন? বড়ো কৌতূহল হচ্ছে কিন্তু।'

লিন্ডকুইস্ট বলল, 'পুতুলগুলোয় ধুলো পড়েছে। আমার চাকর হান্‌স সেগুলো পরিষ্কার করলে পর কাল সন্ধ্যা নাগাদ সেগুলো দেখাতে পারব বলে আশা করছি।'

'আর লেমিং?'

'আগে পুতুল—তারপর লেমিং। কেমন?'

অগত্যা রাজি হয়ে গেলাম।

১৮ মে রাত ১২টা

দু'ঘণ্টা হলো ঘরে ফিরেছি, কিন্তু এখনও পর্যন্ত উত্তেজনা কাটিয়ে উঠতে পারিনি। তাই আজকের ঘটনা পরিষ্কার করে লিখতে রীতিমতো অসুবিধে হচ্ছে।

আজ সন্ধ্যা সাতটায় (সন্ধ্যা বলছি ঘড়ির টাইম অনুযায়ী কারণ এখানে সত্যিকারের রাতদিনের কোনো তফাত বোঝা যায় না) লিন্ডকুইস্ট তার বৈঠকখানায় একটা গোপন দরজা খুলে একটা ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে আমাকে মাটির নীচে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে তার পুতুলগুলো দেখাল। আমি এ রকম আশ্চর্য জিনিস আর কখনও দেখিনি।

টেবিলের উপর রাখা কাচের আবরণে ঢাকা যে জিনিসগুলি দেখলাম সেগুলিকে পুতুল বলতে বেশ দ্বিধা বোধ করছি। আসল মানুষের সঙ্গে এদের তফাত কেবল এই যে এগুলো নিষ্প্রাণ। এবং এদের কোনোটাই ছ ইঞ্চির বেশি লম্বা নয়। মোটামুটি বলা যেতে পারে যে আসল মানুষের যা আয়তন, এগুলি তার দশভাগের এক ভাগ।

সব সুদ্ধ ছ'টি পুতুল রয়েছে। সবই নামকরা লোকের, যদিও এদের সকলের চেহারার সঙ্গে আমার আগে পরিচয় ছিল না। যাদের দেখে চিনলাম, তাদের মধ্যে রয়েছে — ফরাসি ভূপর্যটক আঁরি ক্লেমো, আর নিগ্রো চ্যাম্পিয়ন বক্সার বব স্লিম্যান।

আর ছ'নম্বর কাচের খাঁচায় যে পুতুলটি কালো চশমা পরে ডান হাত কোটের পকেটের ভিতর ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি হলেন পরলোকগত ব্রিটিশ প্রাণীতত্ত্ববিদ ও আমার বন্ধু আর্চিবল্ড অ্যাক্রয়েড—ছ বছর আগে লেমিং-এর সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে নরওয়েতেই যাঁর মৃত্যু হয়।

অ্যাক্রয়েডের পুতুল দেখেই বুঝতে পারলাম পোর্ট্রেট হিসেবে এগুলো কী আশ্চর্যরকম নিখুঁত। শুধু যে মোটামুটি তাঁর চেহারা মিলেছে তা নয়— এগুলো এমন পদার্থ দিয়ে তৈরি যাতে নাকি মাথায় চুল, গায়ের চামড়া, চোখের তারা, সবই একেবারে জীবন্ত বলে মনে হয়।

এই শেষ পুতুলটি দেখে তো নিশ্বাস বন্ধ হবার জোগাড়। অ্যাক্রয়েডের সামনে আমাকে এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকত দেখে লিন্ডকুইস্ট জিজ্ঞাসা করল, 'কী হলো? একে চেনো নাকি?'

বলালম, 'বিলক্ষণ। ইংলন্ডে আলাপ হয়েছিল— প্রায় বন্ধুত্বই। লেমিং-এর খবর ওঁর কাছেই পাই। নরওয়েতেই তো ওঁর মৃত্যু হয় বলে শুনেছিলাম।'

'তা হয়। তবে আমার ভাগ্যটা খুবই ভালো। মৃত্যুর কয়েকদিন আগেই আমার এখানে এসেছিলেন, আর তখনই এই পুতুলটি তৈরি করে ফেলি। যাদের পুতুল দেখছ তাদের সকলেই আমার বাড়িতে থেকে আমাকে সিটিং দিয়ে গেছে।'

গুপ্ত ঘরটা থেকে ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠার সময় লিন্ডকুইস্ট বলল, 'পরশু থেকে তোমার পোর্ট্রেটের কাজ শুরু করব।'

আমি ঘরে বসে বসে ডায়রি লিখছি, আর অ্যাক্রয়েডের সেই হাসি হাসি মুখটা আমার মনে পড়ছে। কোনো মানুষের পক্ষে যে এমন পুতুল তৈরি করা সম্ভব হতে পারে এটা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। লিন্ডকুইস্ট লোকটা কি শুধুই শিল্পী— না বৈজ্ঞানিকও বটে? কী উপাদান দিয়ে ও পুতুলগুলি গড়ে, যাতে চোখ, নখ, চামড়া, চুল এত আশ্চর্য রকম স্বাভাবিক বলে মনে হয়। আশা করি আমার মূর্তিটি ও আমার সামনেই গড়বে, যাতে মালমশলা নিজের চোখে দেখার সুযোগ হবে।

কাল সকালে বরং ওকে এ বিষয় দু-একটা প্রশ্ন করে দেখব, দেখি না কী বলে।

আপাতত লেমিং-এর প্রশ্নটা স্থগিত রেখে পুতুল নিয়েই পড়া যাক।

১৯শে মে

কাল রাত্রে একটি ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে একটা তীব্র উগ্র গন্ধ নাকে আসতে ঘুমটা ভেঙে গিয়েছিল। গন্ধটা অনেকক্ষণ ছিল।

কিছু পরিচিত এবং কিছু অপরিচিত জিনিস মেশানো একটা নতুন গন্ধ। চেনার মধ্যে কপার সালফেট ও ফেরাস অক্সাইড। এ ছাড়া কেমন যেন একটা মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ সেটা কেমিক্যালও হতে পারে বা অন্য কিছুও হতে পারে। মোটকথা এই বাড়িতে কিংবা বাড়ির আশেপাশে কোথাও কেমিক্যাল নিয়ে কারবার চলেছে। লিন্ডকুইস্ট যে বৈজ্ঞানিকও সে সন্দেহটা আরো দৃঢ় হলো।

সকালে বুড়ো চাকর হান্স এসে বলল, 'বাবু একটু বেরিয়েছেন; আপনাকে অপেক্ষা না করে ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিতে বলেছেন!'

খাওয়াদাওয়া সেরে বাড়ির ভিতরে এবং আশপাশটায় একটু পায়চারি করে দেখলাম। এখানে সেখানে ঝোপঝাড়ের পিছনে ফ্লাস্ক, টেস্টটিউবের টুকরো এবং একটা মরচেধরা বুনসেন বার্নার দেখে আমার মনে আর কোনো সন্দেহ রইল না। পুতুলগুলোর পিছনে একটা বৈজ্ঞানিক কারসাজি রয়েছে। আমার চোখে ধুলো দেওয়া অত সহজ নয়।

একটা খটকা কেবল মনে খোঁচা দিচ্ছে। যে বৈজ্ঞানিক, সে আর একজন বৈজ্ঞানিকের কাছে নিজেকে শিল্পী বলে পরিচয় দেবে কেন?

সাড়ে নটা নাগাদ যখন ঘরে ফিরছি তখনও লিন্ডকুইস্টের দেখা নেই। হান্স-কে জিজ্ঞেস করাতে সে তার ফেরার টাইম কিছু বলতে পারল না। একা ঘরে বসে থাকতে থাকতে মাথায় একটা বদ্‌বুদ্ধি এল। দিনের বেলা পুতুলগুলোকে আর একবার দেখে আসতে পারলে কেমন হয়?

গুপ্ত ঘরের দরজাটা খোলার একটা সংকেত আছে। দরজার হাতলটা কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরিয়ে তারপর সেটাকে একটা টান দিলেই সেটা খুলে যায়। গতকাল লিন্ডকুইস্ট হাতলটা নিয়ে কবার ডানদিকে কবার বামদিকে ঘুরিয়ে তারপর টানটা দিয়েছিল সেটা আমি মনে মনে মুখস্থ করে রেখেছিলাম। সাধারণ লোকের পক্ষে অবিশ্যি এ কাজটা সম্ভব হতো না।

হান্স-কে ডেকে বললাম, 'আমার একটা জরুরি টেলিগ্রাম পাঠানো দরকার। তুমি যদি কাজটা করে দিতে পার—আমার ঠান্ডা দেশে এসে একটু হাঁপ ধরেছে—এতটা পথ হাঁটতে ভরসা পাচ্ছি না।'

হান্স অবিশ্যি তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেল, এবং আমিও আমার বাড়ির চাকর প্রহ্লাদের নামে একটা আজগুবি টেলিগ্রাম লিখে হান্সকে টাকা দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম।

হান্স রওনা হবার পর আরো পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করে আমি বাড়ির গেটের বাইরে রাস্তার গিয়ে দাঁড়ালাম। এদিক ওদিক চাইলে বহুদূর অবধি দেখা যায়। লিন্ডকুইস্টের কোনো চিহ্ন দেখলাম না— বুঝলাম সে ফিরলেও মিনিট পনেরোর আগে নয়।

ভেতরে ফিরে এসে গুপ্ত দরজায় গিয়ে মুখস্থমাফিক হাতলটা এদিক ওদিক ঘোরানো শুরু করলাম। যথাসময়ে একটা খচ্ শব্দে দরজাটা খুলে গেল। পকেটে টর্চ ছিল। সেটা জ্বেলে ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলাম!

গুপ্ত ঘরে পৌঁছে একটা করে কাচের খাঁচাগুলোর উপর আলো ফেলে দেখতে শুরু করলাম। কালকের চেয়ে কোনো বিশেষ তফাত চোখে পড়ল না। এক নম্বরে সেই ইটালীয় গায়ক—নাম বোধ হয় মারিয়ো বাতিস্তা, দুই-এ মুষ্টিযোদ্ধা বব স্লিম্যান, তিন-এ ফরাসি পর্যটক আঁরি ক্লেমো, চার-এ জাপানি সাঁতারু হাকিমোতো, পাঁচে সেই জার্মান কবি, নাম মনে নেই, আর ছ'য়ে আমার বন্ধু অ্যাক্রয়েড।

আমি টর্চটা নিয়ে অ্যাক্রয়েডের খাঁচার দিকে এগিয়ে গেলাম। খাঁচাগুলি বেশ। এরকম জিনিস এর আগে দেখিনি কখনো। একরকম কাচের আবরণ থাকে—মন্দিরের চুড়োর মতো, যাতে অনেক সময় ভালো ঘড়ি কিংবা মূর্তি ঢাকা দেওয়া থাকে। এ কতকটা সেই রকম কিন্তু তফাত এই যে এতে আবার একটা দরজা আছে। এবং তাতে কবজা এবং চাবি লাগানোর বন্দোবস্ত আছে। অবিশ্যি ইচ্ছা করলে পুরো ঢাকনাটাই হাত দিয়ে তুলে ফেলা যায়।

আমি কাচের সঙ্গে প্রায় মুখ লাগিয়ে দিয়ে অ্যাক্রয়েডের পুতুলটা দেখতে লাগলাম। দেখতে দেখতে মনে হলো গতকালের ভঙ্গির সঙ্গে যেন সামান্য একটু তফাত। কালকে যেন ডান হাতটা পকেটের মধ্যে আর একটু বেশি ঢোকানো মনে হয়েছিল। তাই

কি?—না আমার চোখের ভুল? এমনও তো হতে পারে যে পুতুলগুলির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাড়ানোর ব্যবস্থা করা আছে। লিন্ডকুইস্ট হয়তো মাঝে মাঝে দরজা খুলে তাদের দাঁড়াবার ভঙ্গিটা একটু বদল করে দেয়। কিংবা হয়তো পুতুলগুলোকে ঝাড়পোঁছ করার সময় হাত পা একটু নড়ে যায়। একবার খুলে পরীক্ষা করে দেখলে কেমন হয়?

কিন্তু অ্যাক্রয়েডের পুতুলটায় হাত দিতে কেমন জানি সংকোচ বোধ হলো, তাই জাপানি সাঁতারুর পুতুলের ঢাকনাটা খুলে সেটা আস্তে হাতে তুলে নিলাম। নিয়েই বুঝলাম যে হাত পা নাড়ানোর কোনো উপায় লিন্ডকুইস্ট রাখেনি। পুতুলগুলো একেবারেই অসাড় এবং অনড়।

কাচের ঢাকনা চাপা দিয়ে ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে উঠে গুপ্ত দরজা বন্ধ করে নিজের ঘরে ফিরে এলাম।

লিন্ডকুইস্ট ফিরল সাড়ে বারোটায় সময়। দুপুরে খাবার টেবিলে তাকে বললাম, 'আজ একটু পড়াশুনো করবার ইচ্ছে হচ্ছে। তোমাদের এখানেও শুনেছি বেশ ভালো একটা পাবলিক লাইব্রেরি আছে। একবার যাওয়া যায় কি?'

লিন্ডকুইস্ট বলল, 'স্বচ্ছন্দে। আমি রাস্তা বাতলে দেবো। আজই যাও—কারণ কাল থেকে তো তোমায় সিটিং দিতে হবে।'

আমি বিশ্রাম না করেই বেরিয়ে পড়লাম। মনের মধ্যে কেমন জানি একটা অস্পষ্ট সন্দেহ উঁকি মারছিল, সেই কারণেই কিছু পুরোনো খবরের কাগজ ঘাঁটার দরকার হয়ে পড়েছিল।

সাড়ে তিন ঘণ্টা লাইব্রেরিতে বসে 'লন্ডন টাইম্‌স' কাগজের ফাইল ঘেঁটে মনে গভীর সন্দেহ, উত্তেজনা ও উদ্বেগ নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। দু বছর আগের ১১ই সেপ্টেম্বরের টাইম্‌স কাগজে আর্চিবল্ড অ্যাক্রয়েডের মৃত্যুসংবাদ পড়ে জানতে পারলাম যে অ্যাক্রয়েড কীভাবে কোথায় মারা গিয়েছিলেন তা জানা যায়নি। নরওয়ে ভ্রমণকালে তিনি নিখোঁজ হয়ে যান। তাঁকে শেষ দেখা গিয়েছিল ফিয়োর্ড পরিভ্রমণের উদ্দেশ্যে একটি নৌকোয় চাপতে। সেই নৌকোটির কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি—কাজেই ধরে নেওয়া হয়েছিল যে নৌকোডুবির ফলেই অ্যাক্রয়েডের মৃত্যু ঘটে।

বব স্লিম্যান, হাকিমোতো ও আঁরি ক্লেমোর মৃত্যুসংবাদও পড়লাম। এঁরা সকলেই ইউরোপে নিখোঁজ হয়েছেন, এবং সকলকেই অনেক অনুসন্ধানের পর মৃত বলেই ধরে নেওয়া হয়েছিল।

বাড়ি ফিরে এসে বাকিটা দিন যথাসাধ্য স্বাভাবিকভাবেই কাটিয়ে দিতে চেষ্টা করলাম। লেমিং সম্পর্কে কৌতূহলটা মন থেকে প্রায় মুছে গেছে।

রাত্রে খেতে বসে লিন্ডকুইস্ট বলল, 'শঙ্কু তুমি মদ খাও না? আমাদের দেশের একটা ভালো ওয়াইন একটু চেখে দেখবে নাকি? আমার অবশ্য এই বিশেষ মদটা রোচে না তবে লোকে খুব ভালো বলে। একটু দেখো না খেয়ে।'

পাছে লিন্ডকুইস্টের মনে আমার সম্পর্কে কোনো সন্দেহ জাগে তাই আপত্তি করলাম না।

লিন্ডকুইস্ট খানিকটা মদ গ্লাসে ঢেলে দিল। গেলাসটা ঠোঁটের কাছে আনতেই কেমন জানি একটা সন্দেহজনক গন্ধ পেলাম। তাও সামান্য খানিকটা চুমুক দিয়ে সেটাকে ন্যাপকিনে ফেলে দিয়ে বললাম, 'এ ব্যাপারে তোমার ও আমার রুচি একই রকম। তার চেয়ে বরং তুমি যেটা পান করছ সেটাই কিছুটা আমাকে দাও না'।

লিন্ডকুইস্ট মদের মধ্যে ঘুমের ওষুধ দিচ্ছিল, এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। তবে অভিসন্ধিটা আমার কাছে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে আসছে।

আজ রাতটা যে করে হোক জেগে থেকে ও কী করে সেটা দেখতে হবে।

২০শে মে

কাল রাত্রে না ঘুমোনোর ফলে যে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হলো সেটা আজ সকালেই লিখে ফেলেছি—

লিন্ডকুইস্টের এই কাঠের বাড়িতে দরজার চৌকাঠ বলে কিছু নেই। ফলে হয় কী পাশের ঘরে আলো জ্বালালে দরজা বন্ধ থাকলেও তার তলার ফাঁক দিয়ে সে আলো দেখা যায়। লিন্ডকুইস্টের বৈঠকখানায় কুকু ক্লক-এর কোকিল তখন সবে বারোটার ডাক ডেকেছে। আমি আমার সেই ঘুম-তাড়ানি ট্যাবলেটটা না খেয়েও তখন দিব্যি জেগে বসে আছি—কারণ মনে কেমন জানি দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে রাত্রে একটা কিছু ঘটবে। এমন সময় আমার বন্ধ দরজার তলা দিয়ে আলো দেখলাম। কে জানি বৈঠকখানায় আলো জ্বেলেছে।

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। তারপরেই একটা পরিচিত 'খুচ্' শব্দ শুনতে পেলাম।

এবার বৈঠকখানার বাতিটা নিবে গেল।

আমি মিনিটখানেক চুপ করে থেকে মোজা পায়ে আস্তে আস্তে আমার দরজার দিকে এগিয়ে সেটা ইঞ্চিখানেক ফাঁক করে চোখ লাগিয়ে ওদিকে দেখে নিলাম! তারপর দরজা খুলে এগিয়ে গেলাম। গুপ্ত দরজার দিকে গিয়ে দেখি দরজা খোলা।

বিপদের আশঙ্কা সত্ত্বেও তখন একটা অদম্য বৈজ্ঞানিক কৌতূহল আমাকে পেয়ে বসেছে। আমি দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করলাম। সাড়ে তিন পাক নামলে পরে পুতুলের ঘরে পৌঁছানো যায়। তিন পাকের শুরুতেই একটা অদ্ভুত শব্দ আমার কানে এল।

আমার কান—শুধু কান কেন আমার সব ইন্দ্রিয়ই—সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি সজাগ; তবুও এ শব্দটা এতই নতুন, এটা চিনতে আমার বেশ কিছুটা সময় লাগল। অবশেষে হঠাৎ চিনতে পেরে বিস্ময়ে এবং আতঙ্কে আমার রক্ত হিম হয়ে গেল।

এ হলো মানুষের চিৎকার! কিন্তু গলার স্বরটা সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক, অনেক গুণে তীক্ষ্ণ ও মিহি। চিৎকারের ভাষাটা জাপানি।

আমার বুঝতে বাকি রইল না যে ওই জাপানি পুতুল সাঁতারু হাকিমোতোই কোনো বিপন্ন অবস্থায় পড়ে এ ভাবে আর্তনাদ করছে।

আমি স্তম্ভিত হয়ে চিৎকারটা শুনছি, এমন সময় হঠাৎ সেটা থেমে গেল। তারপর টং করে কাচের শব্দ। এ শব্দেরও কারণ অনুমান করা কঠিন নয়। কাচের খাঁচার দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ এটা।

আমার কৌতূহল এখন সব ভয়কে ছাপিয়ে উঠেছে। আমি সিঁড়ির বাকি ধাপ কটা নেমে গিয়ে দেয়ালের পাশ দিয়ে গলাটা বাড়িয়ে দিলাম।

লিন্ডকুইস্ট একটা চাবি দিয়ে সেই ফরাসি পর্যটকের খাঁচাটা খুলেছে। তারপর হাত ঢুকিয়ে মুঠো করে পুতুলটাকে বাইরে বের করে এনে তার গায়ে বাঁ হাত দিয়ে কী যেন একটা ঠেকাতেই পুতুলটা হাত পা ছুড়তে আরম্ভ করল— এবং তারপর শুরু হলো ক্ষীণ মিহি সুরে আর্তনাদ। লিন্ডকুইস্টের ব্যবহারে কোনো বিচলিত হবার লক্ষণ দেখলাম না। সে আর্তনাদ অগ্রাহ্য করে একটা ছোট্ট ড্রপার দিয়ে পুতুলের হাঁ করা মুখে কী যেন পুরে দিচ্ছে।

আস্তে আস্তে পুতুলের হাত পা ছোড়া থেমে গেল। তারপর লিন্ডকুইস্ট আগের সেই প্রথম জিনিসটা পুতুলের গায়ে ঠেকাতেই সেটার হাত পা অসাড় হয়ে আগের অবস্থায় চলে এল। লিন্ডকুইস্ট সেটাকে খাঁচার মধ্যে পুরে দাঁড় করিয়ে দরজা বন্ধ করে চাবি দিয়ে দিল। আমি আমার জায়গায় বিহ্বল অথচ তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তার পিছনেই দশ হাতের মধ্যেই যে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি সেটা লিন্ডকুইস্টের খেয়ালই হলো না।

এরপরে অ্যাক্রয়েডের পালা।

উন্মাদ বৈজ্ঞানিকের হাতের মুঠোয় অ্যাক্রয়েডের শোচনীয় অবস্থা দেখে আমার ক্রোধ ও উত্তেজনা সংবরণ করা কঠিন হচ্ছিল। এমন সময় হঠাৎ দেখলাম অ্যাক্রয়েডের ছট্‌ফটানি থেমে গেল। এত দূর থেকেও মনে হলো তার মাথাটা যেন আমারই দিকে ঘোরানো তারপর পরিষ্কার মার্জিত ইংরেজি উচ্চারণে অতি কষ্টে মিহি চিৎকার এল—'শঙ্কু, তুমি কী করছ এখানে—পালাও পালাও!
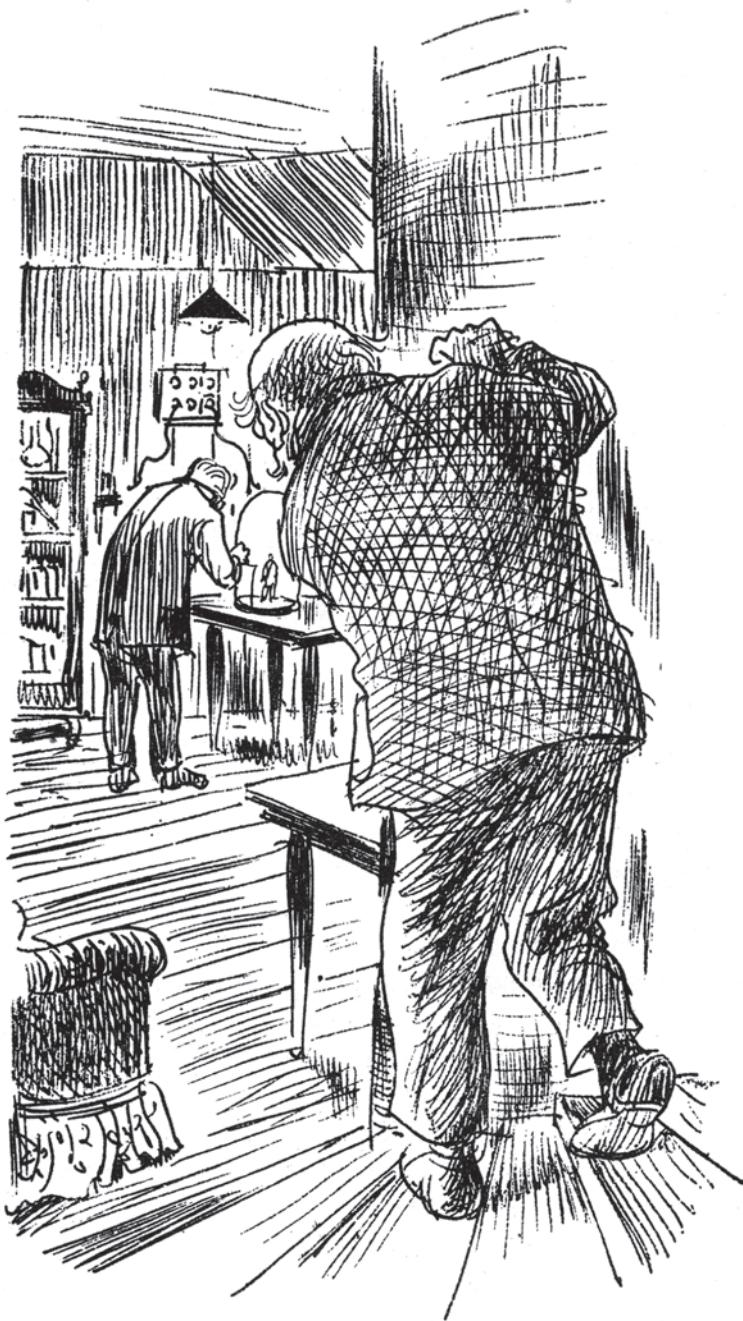
পুতুলের মুখে আমার নাম শোনামাত্র লিন্ডকুইস্ট বিদ্যুদ্বেগে সিঁড়ির দিকে দৃষ্টি ঘোরাতেই আমিও ঘুরে তিন চার সিঁড়ি একসঙ্গে উঠে বৈঠকখানা পেরিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে আমার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম।

কিন্তু আশ্চর্য—লিন্ডকুইস্ট আর আমার ঘরের দিকে এল না।

এখন সকাল ৯টা। ব্রেকফাস্টের জন্য আমার ডাক পড়েনি। এটাও বুঝতে পেরেছি যে—আর ডাক পড়বে না। আমার ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

২৩শে মে

কালকের ঘটনার পর চব্বিশ ঘণ্টা কেটে গেল। এখনও লিন্ডকুইস্টের দেখা নেই। আমার ঘরে কিছু ফল রাখা ছিল, আর আমার সঙ্গে কিছু বিস্কুট ছিল—এ ছাড়া কাল থেকে কিছুই খাওয়া হয়নি। খিদের সঙ্গে সঙ্গে শরীরে একটা অবসাদও এসে

পড়ছে। কাল রাত্রে সব বিদ্‌ঘুটে স্বপ্ন দেখেছি। তার মধ্যে একটাতে দেখলাম ইঁদুরের মতো দেখতে একটা অতিকায় জানোয়ার আমার জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকতে চেষ্টা করছে। তারপর একটা বিস্ফোরণের শব্দ আর একটা বিকট চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। আমি কিছুক্ষণ অবশ হয়ে পড়ে রইলাম। তখন থেকেই ঘরে একটা গন্ধ পাচ্ছি; এখন বুঝতে পারছি সেটা আসছে আমার ফায়ার প্লেসের ভিতর থেকে। চিমনি দিয়ে গন্ধটা ঘরে ঢুকছে।

শুধু গন্ধ নয়। গন্ধের সঙ্গে বাষ্পের মতো কী যেন ঢুকে ঘরটাকে ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। আমার মাথাটাও কেমন যেন ঝিম ঝিম করছে। লিখতেও বেশ অসুবিধে হচ্ছে। আর বোধ হয় কলম—

৭ই জুন

আমি সুস্থ আছি বলব না তবে বেঁচে যে আছি এটাই বা কী কম আশ্চর্যের কথা? স্ক্যান্ডিনেভিয়ান এয়ারওয়েজের ভারতগামী প্লেনে বসে ডায়রি লিখছি। ডিনারে ট্রাউট মাছ দিয়েছিল—খাইনি, লিন্ডকুইস্টের বাড়িতে খাওয়া কোনো কিছুই আর কোনোদিন খেতে পারব কী না জানি না। সুলিটেল্‌মার পুরো ঘটনাটা মন থেকে চিরকালের জন্য মুছে ফেলার কোনো বৈজ্ঞানিক উপায় আছে কি না সেটা গিরিডিতে গিয়ে ভেবে দেখতে হবে। যাই হোক আপাতত ঘটনাটা আমার এই ডায়রিতে লিখে রাখি কারণ এ ধরনের পৈশাচিক কাণ্ডকারখানার একটা বিবরণ দেওয়া থাকলে আর কিছু না হোক, ভবিষ্যতে একটা ওয়ার্নিং-এর কাজ করতে পারে।

আমার ২৩শে মে-র বিবরণে ধোঁয়া আর গন্ধের কথা বলেছিলাম। গন্ধটা কখন যে আমাকে অজ্ঞান করে দিয়েছিল সেটা আমি টেরই পাইনি। জ্ঞান যখন হলো তখন মনে হলো আমি একটা বিশাল ঘরের মধ্যে শুয়ে আছি। ঘরের ছাতটা এতই উঁচুতে যে আমি যেন ভালো করে দেখতেই পাচ্ছি না। প্রথমে মনে হলো আমি হয়তো কোনো গির্জার ভিতরে রয়েছি। কিন্তু তারপর ভালো করে দেখতে ছাতের কড়ি-বরগাগুলো চোখে পড়ল, আর সেগুলো যেন কেমন চেনা মনে হলো।

যে জিনিসটার উপর শুয়ে আছি সেটা পিঠের তলায় কেমন নরম নরম মনে হচ্ছিল। তবে সেটা বিছানা নয়, কারণ সেটা স্থির থাকছিল না।

তন্দ্রার ভাবটা কেটে গেলে আমার মাথাটা একটু ডান দিকে ঘোরাতেই একটা তীব্র আলোয় আমার চোখটা প্রায় ঝলসে গেল। সেই আলোটাও যেন অস্থির, মাঝে মাঝে আমার চোখে পড়ছে, মাঝে মাঝে সরে যাচ্ছে। একবার আলোটা সরে গিয়ে আমার চোখটা কিছুক্ষণ রেস্ট পাওয়াতে সব ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম!

আলোটা আসছিল দুটো বিরাট গোল কাচ থেকে রিফ্লেক্টেড হয়ে। কাচের পিছনে জ্বল জ্বল করছে দুটো মসৃণ নীল চক্র—তার মাঝখানে আবার অপেক্ষাকৃত ছোটো দুটি কালো চক্র। এই কালো বিন্দু সমেত নীল চক্র দুটিও স্থির নয়—এদিক ওদিক নড়ছে, আর মাঝে মাঝে আমার দিকে চাইছে। হ্যাঁ — চাইছেই বটে—কারণ ও দুটো আসলে চোখ। লিন্ডকুইস্টের চোখ। কাচ দুটো লিন্ডকুইস্টের সোনার চশমা। আমি শুয়ে আছি লিন্ডকুইস্টের দস্তানা পরা হাতের উপর। আর আমি আয়তনে হয়ে গেছি অন্য পুতুলগুলোরই মতো। অর্থাৎ, যা ছিলাম তার দশ ভাগের এক ভাগ। কিন্তু সাইজে ছোটো হয়ে গেলেও, আমার জ্ঞান, বুদ্ধি, অনুভূতি কমেনি। কেবল বাঁ হাতের কাঁধের কাছটায় একটা যন্ত্রণা। বুঝলাম সেখানে একটা ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছে।

লিন্ডকুইস্ট এবার আমার উপর ঝুঁকে পড়ল। তার গরম নিশ্বাস আমার শরীরের উপর অনুভব করলাম। এইবার তার ঠোঁটটা ফাঁক হতেই সোনার দাঁতটা ঝলমল করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মদের গন্ধ, আরো উত্তপ্ত হাওয়া, লিন্ডকুইস্টের কথা—

'আমার 'হবি'-টা কেমন বলো তো, শঙ্কু? বেশ নতুন ধরনের—নয় কি? লোকে ডাকটিকিট জমায়, দেশলাইয়ের লেবেল জমায়, পুরনো টাকা জমায়, অটোগ্রাফের খাতায় লোকের সই জমায় — আর আমি বাছাই করে দেশ বিদেশের বিখ্যাত লোকদের ধরে ধরে তাদের পুতুল করে কাচের ঢাকনা ঢেকে রেখে দিই। আমার এই অদ্ভুত শখ, এই আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির জন্য কি কেউ উপাধি দেবে? কেউ না! ... তুমি বলবে, একজন বৈজ্ঞানিক তো আমার সংগ্রহে রয়েছে, তা হলে আর তোমাকে রাখা কেন। আসলে কী জান। বৈজ্ঞানিক বলে তোমাকে রাখছি না; রাখছি ভারতীয় বলে। বিখ্যাত ভারতীয় আর চট করে ঘরের কাছে

কোথায় পাব বলো? নরওয়েতে আর কজনই বা আসবে? আর আমার এই আস্তানায় তো সকলে সব সময়ে আসতেই চায় না—যেমন তুমি এলে?'

লিন্ডকুইস্ট দম নেবার জন্য একটু থামল। তারপর জিব দিয়ে ঠোঁট চেটে বলল, 'আমার সবচেয়ে বড়ো গুণ কী জান? আমি খুন করি না। এরা আসলে জ্যান্ত রয়েছে। দিনের বেলায় ইলেকট্রিক শক্ দিয়ে এদের অসাড় করে রেখে দিই। রাত বারোটায় আবার শক্ দিয়ে জাগিয়ে ড্রপার দিয়ে খাইয়ে দিই। প্রয়োজন হলে তখন এদের সঙ্গে কথাবার্তাও বলি। তবু আফশোষ এই যে এরা এত নির্ভাবনায় থেকেও কেউই খুশি থাকতে পারছে না। জ্ঞান হলেই সব কটাই 'আমাকে বাঁচাও, আমাকে উদ্ধার করো' ইত্যাদি বলে চেঁচাতে থাকে! যেখানে খাওয়া পরার কোনো চিন্তা করতে হচ্ছে না, জীবনধারণের কোনো সমস্যার প্রশ্নই যেখানে উঠছে না, সেখানে পালাবার এত ইচ্ছের কারণটাই আমি বুঝতে পারছি না। তোমায় দেখে মনে হয় তুমি বেশ সহজেই পোষ মানবে—তাই নয় শঙ্কু?'

লিন্ডকুইস্ট তার কথা শেষ করে আমাকে তার হাত থেকে নামিয়ে টেবিলের উপর শোয়াল। তারপর আমার কোমরে এবং বুকের ওপর এক জোড়া স্ট্র্যাপ আটকে বন্দি করে ফেলল।

আমি আপত্তি বা গায়ের জোর দেখানোর কোনো চেষ্টাই করলাম না—কারণ আমি জানতাম যে তাতে কোনো ফলই হবে না। এখন যেটা দরকার সেটা হচ্ছে মাথাটাকে ঠান্ডা রাখা, এবং আমার এই খুদে অবস্থায় কেবল বুদ্ধি খাটিয়ে কীভাবে লিন্ডকুইস্টকে সায়েস্তা করা যায় সেইটে ভেবে স্থির করা।

লিন্ডকুইস্ট বলেছে যে খুদে মানুষকে অসাড় পুতুলে পরিণত করতে হলে ইলেকট্রিকের শক্ দিতে হয়। আমাকে কিন্তু ইলেকট্রিক শক্ দিয়ে লিন্ডকুইস্ট বিশেষ সুবিধে করতে পারবে না, কারণ আমার গেঞ্জির নীচে আমার সেই কার্বোথিনের পাতলা জামাটা রয়েছে। সেবার গিরিডিতে ঝড়ের মধ্যে আমার বাগানে গাছের চারাগুলো বাঁচাতে গিয়ে কাছাকাছি একটা তালগাছে বাজ পড়ায় আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। তারপরেই এই জামাটা আবিষ্কার করি এবং ২৪ ঘণ্টা পরে থাকি।

লিন্ডকুইস্ট আমাকে শোয়ানো অবস্থায় রেখে ঘরের অন্যদিকে চলে গিয়েছিল। এবারে দেখলাম ঘরের আলোটা হঠাৎ নিভে গেল। তারপর একটা কাঠের টেবিল টানার শব্দ পেলাম। তারপর কাচের ঠুংঠাং আওয়াজ! তারপর একটা সুইচ জ্বালানোর সঙ্গে সঙ্গেই আবার গায়ের উপর একটা তীব্র আলো এসে পড়ল। তারপর দেখলাম লিন্ডকুইস্টের চশমার ঝলসানি। লিন্ডকুইস্ট আমার দিকে এগিয়ে আসছে।

এবার তার দৈত্যের মতো হাতটা নেমে এল আমার দিকে, তাতে একটা ইলেকট্রিকের তার লক্ষ করলাম। লিন্ডকুইস্টের ঠোঁটের কোণে একটা বিশ্রী হাসি।

এবার তার ঠোঁটদুটো ফাঁক হয়ে আবার সোনার দাঁতটা দেখা গেল আর চাপা কর্কশ স্বরে কথা এল, 'এসো বাছাধন, আমার সাত নম্বরের পুতুল! এসো—'

ইলেকট্রিকের তার সমেত লিন্ডকুইস্টের ডান হাতটা আমার সমস্ত শরীরটাকে আচ্ছাদন করে ফেলল। আমার স্নায়ুর ভিতর একটা সামান্য শিহরনে বুঝতে পারলাম যে লিন্ডকুইস্ট তারটা আমার গায়ে ঠেকিয়েছে। প্রায় পাঁচ সেকেন্ড সে তারটাকে এইভাবে ঠেকিয়ে রেখে তারপর সেটাকে সরিয়ে নিল।

আমি মটকা মেরে মড়ার মতো পড়ে রইলাম।

ঘরের বাতি জ্বলে উঠল। লিন্ডকুইস্ট আমার স্ট্র্যাপগুলো আলগা করে দিয়ে আমাকে হাতে তুলে নিল। আমি হাতপাগুলোকে টান করে রইলাম—যেন পুতুল হয়ে গেছি।

লিন্ডকুইস্ট আমাকে একটা নতুন টেবিলের উপর নতুন কাচের খাঁচার মধ্যে রেখে খাঁচার দরজায় চাবি দিয়ে গেল। ঘরের বাতি নিভে গেল। তারপর ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ভারী পায়ে উঠে যাওয়ার শব্দ পেলাম। গুপ্ত দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ।

এবার আমি হাত পা আলগা করলাম।

ঘরে দুর্ভেদ্য অন্ধকার—কিছু দেখা যায় না। আমি হেঁটে একটু এগিয়ে যেতেই কাচের দেয়ালের সামনে পড়লাম। হাত দিয়ে ঠেলে দেখি সেটা রীতিমতো ভারী; এক চুলও নড়ানো সম্ভব নয়। কাচের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে ভাবতে আরম্ভ করলাম। নরউইজীয় বুনো শেয়ালের ডাক শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। কাচের ঢাকনা আর টেবিলের মাঝখানে সামান্য যে ফাঁক রয়েছে সেইখান দিয়েই এই শব্দ আসছে, এবং এই চুল পরিমাণ ফাঁক দিয়েই যে হাওয়া ঢুকছে সেটাই আমার নিশ্বাস প্রশ্বাসের পক্ষে যথেষ্ট।

ওপরে বৈঠকখানা থেকে কুকু ক্লকের শব্দ শুনলাম— কুক্কু! কুক্কু! কুক্কু!

তিনটে বাজল। রাত না দিন তা বোঝার কোনো উপায় নেই। আধো আধো ঘুমের আমেজ অনুভব করলাম। পা দুটোকে সামনে ছড়িয়ে দিয়ে গাটাকে এলিয়ে নিলাম। নিজের অবস্থার কথা ভাবতে হাসি পেল। আমি ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু—সুইডিস অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স কর্তৃক সম্মানিত বিশ্ববিখ্যাত বাঙালি বৈজ্ঞানিক—আজ একজন নরউইজীয় পাগলের হাতে পুতুল অবস্থায় বন্দি। গিরিডির কথা মনে পড়ছে— উশ্রী নদী, খাজুলি পাহাড়, আমার বাড়ি, আমার বেড়াল নিউটন, চাকর প্রহ্লাদ, আমার ল্যাবরেটরি। আমার বাগানের উত্তর দিকে সেই গোলঞ্চ গাছ, আমার কত অসমাপ্ত কাজ, কত গবেষণা, কত—

টুং টুং টুং!

ওটা কীসের শব্দ? একটা দীর্ঘশ্বাস বুকের ভিতর থেকে উঠে আসতে গিয়ে থেমে গেল। আমি পা দুটোকে টেনে নিয়ে সোজা করে বসলাম।

টুং টুং—টুং টুং টুং—টুং টুং!

আমি উঠে দাঁড়ালাম। আমার পাশের খাঁচা থেকে শব্দটা আসছে। অ্যাক্রয়েডের খাঁচা।

টুং টুং—টুং টুং টুং—টুং টুং!

এ কী! এ যে মর্স কোড—টেলিগ্রাফের টরেটক্কার ভাষা! আর এ ভাষা যে আমিও জানি!

আমিও কাচের গায়ে হাত ঠুকে জানলাম—'আবার বলো।'

আবার টুং টুং শব্দ হলো। আমি মনে মনে তার মানে করতে লাগলাম। অ্যাক্রয়েড বলল, 'আমারও কার্বোথিনের পোশাক। আমি পুতুল সেজে আছি। তুমি যেদিন এলে—দেখে আনন্দ হলো, ভয় হলো, প্রকাশ করিনি।'

আমিও টুং টুং করলাম—'দ্বিতীয় দিন? যখন একা ছিলাম?'

'একা এসেছিলে? দেখিনি। বোধ হয় ঘুমিয়েছিলাম। দাঁড়িয়ে ঘুমোনো অভ্যাস করছি। সেদিন রাত্রে আর থাকতে পারলাম না — চেঁচাতে বাধ্য হলাম।'

'কদিন আছ এখানে?'

'দু বছর। আমার মৃত্যুর সময় থেকেই। অনেক দেখেছি দু বছরে অনেক জেনেছি, অনেক ভেবেছি। এবার বোধ হয় পালাবার সুযোগ এসেছে।'

'মানুষ হয়ে? না, পুতুল ?'

'মানুষ! ওষুধ আছে। কাল রাত্রে খাবার সময় প্রস্তুত থেকো। আজ ক্লান্ত। হাত অবশ। ঘুমোব। গুড নাইট। '

আমি ধীরে ধীরে কাচে টোকা মেরে গুড নাইট জানিয়ে দিলাম। অ্যাক্রয়েড বেঁচে আছে—আমারই মতো। কার্বোথিনের ফরমুলা আমিই ওকে দিয়েছিলাম। কিন্তু পালানোর কী উপায় ও আবিষ্কার করেছে? জানি না। আবার মানুষ হয়ে গিরিডিতে ফিরতে পারব? অক্ষত দেহে? জানি না। কপালে কী আছে কিছুই জানি না।

ভাবতে ভাবতে আমারও কখন ঘুম এসে গিয়েছিল। ঘুম ভাঙার পরেও বাকি সময়টা অন্ধকারেই কাচে ঠেস দিয়ে বসে কাটিয়েছি। কুকু ক্লকটা অনেকবার বেজেছে। প্রথমে সময়ের খেয়াল রেখেছিলাম, তারপর আর রাখিনি। অবশেষে এক সময় রাত বারোটা যে বাজল সেটা গুপ্ত দরজা খোলার শব্দ থেকেই বুঝলাম। শব্দ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি সোজা হয়ে পুতুলের ভঙ্গি নিয়ে দাঁড়ালাম।

লিন্ডকুইস্ট ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। একটা গুনগুন শব্দ শুনে বুঝলাম সে গান গাইছে। তারপর খুট শব্দ করে ঘরের বাতিটা জ্বলে উঠল। আমি মাথা না ঘুরিয়ে আড় চোখে যতদূর দেখা যায় তাই দেখার চেষ্টা করলাম।

লিন্ডকুইস্ট কিন্তু আমাদের টেবিলের দিক এল না। সে ঘরের পিছনের দিকে আরেকটা দরজা খুলে পাশের ঘরে চলে গেল এবং সেখানেও একটা বাতি জ্বলে উঠল। আমি আবার আরেকটু সাহস করে অ্যাক্রয়েডের দিকে চাইলাম।

অ্যাক্রয়েড আমায় দেখে একটু হাসল। তারপর ডান পকেটে ঢোকানো হাতটা আস্তে আস্তে বার করল। তারপর হাতটা আমার দিকে তুলে ধরল। দেখি তার হাতে একটা ছোট্ট আধ ইঞ্চি লম্বা ইঞ্জেকশন দেওয়ার সিরিঞ্জ।

অ্যাক্রয়েডের এর পরের কাজ আরও বিস্ময়কর। সে সিরিঞ্জটা পকেটে পুরে তার খাঁচার দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে চাবির গর্তের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একটু নাড়াচাড়া করতে দরজাটা খুলে গেল। অ্যাক্রয়েড দরজা খুলে বেরিয়ে এল। আমার তো দম বন্ধ হবার জোগাড। লিন্ডকুইস্ট যদি ফিরে আসে? অ্যাক্রয়েড যেন সে বিষয়ে কোনো চিন্তা না করেই টেবিলের পাশ দিয়ে হেঁটে খাঁচার পিছন দিকটায় এসে এদিক সেদিক দেখে টেবিল থেকে শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। লোকটা আত্মহত্যা করছে নাকি? না তা নয়। একটা ইলেকট্রিকের তার টেবিলের পিছন দিয়ে গিয়ে মাটিতে ঠেকেছে—অ্যাক্রয়েড টেবিলের থেকে অব্যর্থ লক্ষ্য করেই ঝাঁপটা দিয়েছে এবং তারটা ধরে সে মেঝের দিকে নামছে। অ্যাক্রয়েড যে বেশ সুস্থ সবল লোক ছিল সেটা আমি জানতাম— কিন্তু এই দুরূহ জিমনাস্টিকের কাজটাও যে তার আয়ত্তে থাকতে পারে সেটা আমার জানা ছিল না।

তার বেয়ে মাটিতে নেমে অ্যাক্রয়েড খোলা দরজা দিয়ে একবার উঁকি মেরে অন্য ঘরটায় চলে গেল। ঘরটা থেকে যে একটা অদ্ভুত আওয়াজ আসছে সেটা আমি এতক্ষণ খেয়াল করিনি—এবার শুনতে পেলাম। এটা তো মানুষের গলার শব্দ নয়। তবে এটা কী? আমার পক্ষে এ শব্দ চেনা অসম্ভব।

শব্দটা বন্ধ হবার পর লিন্ডকুইস্টের পায়ের আওয়াজ পেলাম। সে বাতি নিভিয়ে আমাদের ঘরটায় ফিরে এল। দরজাটার সামনেই এক নম্বর খাঁচা। লিন্ডকুইস্ট চাবি বার করে খাঁচার দরজা খুলে ইতালীয় গায়ক বাতিস্তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমি কাঠের মতো দাঁড়িয়ে আড়চোখে একবার লিন্ডকুইস্টের দিকে, একবার পাশের ঘরের দরজাটার দিকে চাইতে লাগলাম।

যথারীতি বাতিস্তার চিৎকার হলো। অ্যাক্রয়েড পাশের ঘরে কী করছে না করছে ভেবে ঠাহর করতে চেষ্টা করছি এমন সময় হঠাৎ পাশের ঘরের দরজাটা খুলে গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তার ছফুট লম্বা দেহ নিয়ে ঝড়ের মতো প্রবেশ করে আমার বন্ধু অ্যাক্রয়েড লম্ফ দিয়ে এগিয়ে এসে লিন্ডকুইস্টের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি খাঁচার মধ্যে বন্দি, তার উপর দৈর্ঘ্যে মাত্র ছ 'ইঞ্চি—অ্যাক্রয়েডকে যে সাহায্য করব তার কোনো উপায় নেই।

কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বুঝলাম যে অ্যাক্রয়েডের সাহায্যের কোনো প্রয়োজন নেই। লিন্ডকুইস্টের সাধের এক নম্বরের পুতুল হাতে থাকাতে প্রথমত সেইটিকে পাশে সরিয়ে রাখতে রাখতেই অ্যাক্রয়েড তাকে জাপটে ধরে ফেলল।

লিন্ডকুইস্ট কিছু করতে পারার আগেই দেখি অ্যাক্রয়েড একটা সিরিঞ্জ নিয়ে নরউইজীয়ের বাঁ হাতের কোটের আস্তিনের উপর দিয়েছি প্রচণ্ড খোঁচা।

তারপর? তারপরের দৃশ্য আরও ভয়াবহ, আরও অবিস্মরণীয়। কয়েক মুহূর্ত আগেই অ্যাক্রয়েডকে দেখেছিলাম তারই সমান একটি জোয়ান লোককে জাপটে ধরতে—আর এখন দেখলাম অ্যাক্রয়েডের বাঁ হাতের মুঠোয় লিন্ডকুইস্টের ছ ইঞ্চি লম্বা একটি পুতুলের সংস্করণ।

অ্যাক্রয়েড অবজ্ঞাভরে পুতুলটিকে টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে তার গায়ে বৈদ্যুতিক তারটা ঠেকিয়ে সেটাকে অসাড় করে দিল।

তারপর আমার খাঁচার দিকে এসে কাচের ঢাকনা তুলে ফেলে তার পকেট থেকে সেই ছোট্ট আধ ইঞ্চি সিরিঞ্জটা বার করে আমায় দিয়ে বলল, 'এত ছোটো জিনিসটা তুমিই ভালো করে হ্যান্ডল করতে পারবে। এটা নিয়ে ফেলো।'

আমি আর দ্বিরুক্তি না করে ইঞ্জেকশনটা নিয়ে নিজের আয়তনে ফিরে এলাম। কিন্তু এই ওষুধ অ্যাক্রয়েড পেল কী করে?

প্রশ্ন করতে অ্যাক্রয়েড আমার কাঁধে হাত দিয়ে আমাকে পাশের ঘরে নিয়ে গেল। সুইচ টিপতেই ঘরে আলো জ্বলে উঠল।

ঘরের মাঝখানে প্রায় ছাত অবধি উঁচু একটা বিরাট কাচের খাঁচা। পাশের ঘরের পুতুলের খাঁচার মতোই দেখতে কিন্তু ভিতরে বিখ্যাত মানুষের বদলে রয়েছে একটি অতিকায় ইঁদুর জাতীয় জানোয়ার।

আমি পরম বিস্ময়ে অসাড় জন্তুটির দিক থেকে অ্যাক্রয়েডের দিকে চাইতেই সে বলল—'বোধ হয় অনুমান করতে পারছ জানোয়ারটা কী? এটা লেমিং-এর একটা অতিকায় সংস্করণ; আসল লেমিং-এর চেয়ে দশগুণে ছোটো। কিছুদিন থেকেই লিন্ডকুইস্ট এই নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করছে—বড়ো জিনিসের ছোটো সংস্করণের মতো ছোটো জিনিসের বড়ো সংস্করণ জমিয়ে রাখার শখ হয়েছিল বোধ হয়। সফল যে হয়েছে সেটা কালকেই জানতে পেরেছিলাম হান্‌স-এর সঙ্গে লিন্ডকুইস্টের কথাবার্তা থেকে। এবং ওই ওষুধই যে আমাদের আসল চেহারায় ফিরিয়ে আনতে পারবে, এটা তখনই আন্দাজ করেছিলাম।'

আমি অন্যান্য পুতুলগুলো দেখিয়ে বললাম — 'এদের কী হবে?'

অ্যাক্রয়েড মাথা নেড়ে বলল, 'এদের তো আর কার্বোথিনের জামা ছিল না, তাই এরা মানুষ অবস্থায় আর বাঁচতে পারবে না। এদের মৃত বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। চলো, যাওয়া যাক।'

আমরা ঘোরানো সিঁড়ির দিকে রওনা দিলাম। অ্যাক্রয়েডকে গম্ভীর দেখে কেমন জানি সন্দেহ লাগল। জিজ্ঞেস করলাম—'তুমি দেশে ফিরে যাবে?'

অ্যাক্রয়েড দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আমার স্মৃতিসভা হয়ে গেছে তা জান ? আমার স্ত্রী বিধবার পোশাক পরেছে। আমার নামে আমার টাকা থেকে একটা স্কলারশিপ পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে। এই অবস্থায় দেশে ফিরে যাওয়া একটু বেখাপ্পা হবে না কি?'

'তা হলে তুমি কী করবে?'

'একটা কাজ অসমাপ্ত রয়ে গেছে। লেমিংদের সঙ্গে এখনও ভালো পরিচয় হয়নি। আর কয়েকদিন পরেই ওদের সমুদ্রযাত্রা শুরু হবে। আমিও সেই দলে ভিড়ে পড়ব ভাবছি। একটা সামান্য প্রাণী যদি নির্ভয়ে সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে তো আমি পারব না কেন?'

১২ই জুন

গিরিডিতে ফেরার চার ঘণ্টা পর এ ডায়রি লিখছি। একটা কথা লেখা দরকার—কারণ সেটা এর আগের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। ফিরে আসার পর থেকেই লক্ষ করছিলাম আমার চাকর প্রহ্লাদ আমার দিকে বারবার কেমন যেন সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছে। এখন তার কারণটা বুঝতে পেরেছি। আমার যে জুতোটা গিরিডিতে রেখে গিয়েছিলাম সেটা পরতে গিয়ে দেখি পায়ে ছোটো হচ্ছে। তারপর কালো কোটটা পরতে গিয়ে দেখি আস্তিনটা সামান্য ছোটো। তখন আমার হাইটটা মাপতেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো।

লিন্ডকুইস্টের ওষুধ আমাকে ঠিক আগের আয়তনে ফিরিয়ে না এনে আমাকে আগের চেয়ে দু' ইঞ্চি লম্বা করে দিয়েছে।

সন্দেশ। ফাল্গুন ১৩৭১

কর্ভাস

১৫ই আগস্ট

পাখি সম্পর্কে কৌতূহলটা আমার অনেক দিনের। ছেলেবেলায় আমাদের বাড়িতে একটা পোষা ময়না ছিল, সেটাকে আমি একশোর উপর বাংলা শব্দ পরিষ্কারভাবে উচ্চারণ করতে শিখিয়েছিলাম। আমার ধারণা ছিল, পাখি কথা বললেও কথার মানে বোঝে না। একবার এই ময়নাটাই এমন এক কাণ্ড করে বসল যে, আমার সে ধারণা প্রায় পালটে গেল। দুপুরবেলা সবেমাত্র আমি ইস্কুল থেকে ফিরছি, মা রেকাবিতে মোহনভোগ এনে দিয়েছেন, এমন সময় ময়নাটা হঠাৎ 'ভূমিকম্প, ভূমিকম্প' বলে চেঁচিয়ে উঠল। আমরা কোনো কম্পন টের পাইনি, কিন্তু পরের দিন কাগজে বেরোল সিজ্‌মোগ্রাফ যন্ত্রে সত্যিই নাকি একটা মৃদু কম্পন ধরা পড়েছে।

সেই থেকে পাখিদের বুদ্ধির দৌড় সম্পর্কে মনে একটা অনুসন্ধিৎসা রয়ে গেছে, কিন্তু অন্যান্য পাঁচ রকম বৈজ্ঞানিক গবেষণার মধ্যে ওটা নিয়ে আর চর্চা করা হয়নি। আর একটা কারণ অবিশ্যি আমার বেড়াল নিউটন। নিউটন পাখি পছন্দ করে না, আর নিউটনকে অখুশি করে আমার কিছু করতে মন চায় না। সম্প্রতি, বয়সের জন্যই বোধ হয়, নিউটন দেখছি পাখি সম্বন্ধে অনেকটা উদাসীন হয়ে পড়েছে। সেই কারণেই আমার ল্যাবরেটরিতে আবার কাক, চড়ুই, শালিক ঢুকতে আরম্ভ করেছে। আমি সকালে তাদের খেতে দিই। সেই খাদ্যের প্রত্যাশায় তারা সূর্য ওঠার আগে থেকেই আমার জানালার বাইরে জটলা করে।

প্রত্যেক প্রাণীরই কিছু কিছু নির্দিষ্ট সহজাত ক্ষমতা থাকে। আমার ধারণা, অন্য প্রাণীর তুলনায় পাখির ক্ষমতা আরও বেশি, আরও বিস্ময়কর। একটা বাবুইয়ের বাসা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখলে স্তম্ভিত হতে হয়। একজন মানুষকে কিছু খড়কুটো নিয়ে যদি ও রকম একটা বাসা তৈরি করতে বলা হয়, আমার বিশ্বাস সে কাজটা সে আদৌ করতে পারবে না, কিংবা যদি বা পারে তো মাসখানেকের অক্লান্ত পরিশ্রম লেগে যাবে।

অস্ট্রেলিয়াতে ম্যালি-ফাউল বলে এক রকম পাখি আছে, যারা মাটিতে বাসা করে। বালি, মাটি আর উদ্ভিজ্জ দিয়ে তৈরি একটা ঢিপি, আর তার ভিতরে ঢোকার জন্য একটা গর্ত। ডিম পাড়ে বাসার ভিতরে, কিন্তু সে ডিমে তা দেয় না। অথচ উত্তাপ না হলে তো ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোবে না। উপায় কী? উপায় হলো এই যে ম্যালি-ফাউল কোনো এক আশ্চর্য অজ্ঞাত কৌশলে বাসার ভিতরের তাপমাত্রা আটাত্তর ডিগ্রি ফারেনহাইটের এক ডিগ্রিও এদিক ওদিক হতে দেয় না, তা বাইরের আবহাওয়া ঠান্ডা বা গরম যাই হোক না কেন।

আরও রহস্য। গ্রিব নামক পাখি তাদের নিজেদের পালক ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায় এবং শাবকদের খাওয়ায়, কেন তা কেউ জানে না। আবার এই একই গ্রিব পাখি জলে ভাসমান অবস্থায় কোনও শত্রুর আগমনের ইঙ্গিত পেলে, নিজের দেহ ও পালক থেকে কোনো এক অজ্ঞাত উপায়ে বায়ু বার করে দিয়ে শরীরের স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি বাড়িয়ে গলা অবধি জলে ডুবে ভাসতে থাকে।

এ ছাড়া যাযাবর পাখির দিকনির্ণয় ক্ষমতা, ঈগল-বাজের শিকার ক্ষমতা, শকুনের ঘ্রাণশক্তি অসংখ্য পাখির আশ্চর্য সংগীতপ্রতিভা—এ সব তো আছেই। এই কারণেই কিছু দিন থেকে পাখির পিছনে কিছুটা চিন্তা ও সময় দিতে ইচ্ছা করছে। তার সহজাত বুদ্ধির বাইরে তাকে কত দূর পর্যন্ত নতুন জিনিস শেখানো যায়? মানুষের জ্ঞান, মানুষের বুদ্ধি তার মধ্যে সঞ্চার করা যায় কি? এমন যন্ত্র কি তৈরি করা সম্ভব, যার সাহায্যে এ কাজটা হতে পারে?

২০শে সেপ্টেম্বর

আমার পাখিপড়ানো যন্ত্র নিয়ে কাজ চলেছে। আমি সহজ পথে বিশ্বাসী। আমার যন্ত্রও তাই হবে জলের মতো সহজ। দুটি অংশে হবে এই যন্ত্র। একটি হবে খাঁচার মতো। পাখি থাকবে সেই খাঁচার মধ্যে। খাঁচার সঙ্গে বৈদ্যুতিক যোগ থাকবে দ্বিতীয় অংশের। এই অংশটি থেকে জ্ঞান ও বুদ্ধি চালিত হবে পাখির মস্তিষ্কে।

এই এক মাস আমার ল্যাবরেটরির জানালা দিয়ে খাদ্যের লোভে যে সব পাখি এসে ঢুকেছে, সেগুলোকে আমি খুব মনোযোগ দিয়ে স্টাডি করেছি। কাক, চড়ুই, শালিক ছাড়া পায়রা, ঘুঘু, টিয়া, বুলবুলি ইত্যাদিও মাঝে মাঝে আসে। সব পাখির মধ্যে একটি বিশেষ পাখি বিশেষভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সেঠা একটা কাক। দাঁড়কাক নয়, সাধারণ কাক। কাকটা আমার চেনা হয়ে গেছে। ডান চোখের নীচে একটা সাদা ফুটকি আছে, সেটা থেকে তো চেনা যায়ই, তা ছাড়া হাবভাবও অন্য কাকের চেয়ে বেশ একটু অন্য রকম। ঠোঁটে পেনসিল নিয়ে টেবিলের উপর আঁচড় কাটতে আর কোনো পাখিকে দেখিনি। কালকে তো একটা ব্যাপারে রীতিমতো হকচকিয়ে গেছি। আমি আমার যন্ত্র তৈরির কাজ করছি, এমন সময় একটা খচ-খচ শব্দ পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, কাকটা একটা আধখোলা দেশলাইয়ের বাক্স থেকে ঠোঁট দিয়ে একটা কাঠি বার করে তার মাথাটা বাক্সের পাশটায় ঘষছে। আমি বাধ্য হয়ে হুস হুস শব্দ করে কাকটাকে নিরস্ত করলাম। কাকটা তখন উড়ে গিয়ে জানালায় বসে গলা দিয়ে দ্রুত কয়েকটা শব্দ করল, যেটার সঙ্গে কাকের স্বাভাবিক কা কা শব্দের কোনো সাদৃশ্য নেই। হঠাৎ শুনে মনে হবে, যেন কাকটা বুঝি হাসছে।

যে রকম চালাক পাখি, আমার পরীক্ষার জন্য একে ব্যবহার করতে পারলেই সবচেয়ে ভালো হবে। দেখা যাক কত দূর কী হয়।

২৭শে সেপ্টেম্বর

আমার 'অরনিথন' যন্ত্র আজ তৈরি শেষ হলো। কাকটা সকালেই আমার ঘরে ঢুকে পাউরুটি খেয়ে এ জানালা ও জানালা লাফিয়ে বেড়াচ্ছিল, যন্ত্রটা টেবিলের উপর রেখে যেই তার দরজা খুলে দিলাম, অমনি কাক দিব্যি লাফাতে লাফাতে এসে তার ভিতরে ঢুকে পড়ল। এ থেকে এটাই অনুমান করা যায় যে, কাকটার শেখার আগ্রহ প্রবল। প্রথমে কিছুটা ভাষা জ্ঞান হওয়া দরকার, না হলে আমার কথা বুঝতে পারবে না; তাই সহজ বাংলা দিয়ে শুরু করেছি। আমাকে বোতাম টেপা ছাড়া আর কোনো কাজই করতে হচ্ছে না। শেখাবার বিষয় সমস্তই আগে থেকে রেকর্ড করা। বিভিন্ন চ্যানেলে বিভিন্ন বিষয়, প্রত্যেকটার আলাদা নম্বর দেওয়া। একটা আশ্চর্য জিনিস লক্ষ করলাম—বোতাম টিপলেই কাকটার চোখ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে আসে, আর সঙ্গে সঙ্গে তার নড়াচড়াও বন্ধ হয়ে যায়। কাকের মতো ছটফটে পাখির পক্ষে এটা যে কত অস্বাভাবিক, সে তো বুঝতেই পারছি।

নভেম্বর মাসে চিলির রাজধানী সানতিয়াগো শহরে সারা বিশ্বে পক্ষিবিজ্ঞানীদের কনফারেনস্ আছে। মিনেসোটাতে আমার পক্ষিবিজ্ঞানী বন্ধু রিউফাস গ্রেনফেলকে চিঠি লিখে দিয়েছি। যদি আমার বায়স বন্ধুটি সত্যি করে মানুষের বুদ্ধি কিছুটা আয়ত্ত করতে পারে, তা হলে ওকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে সম্মেলনে ডিমন্‌স্ট্রেশন সহ একটা বক্তৃতা চলতে পারে।

৪ঠা অক্টোবর

কর্ভাস হলো কাক জাতীয় পাখির ল্যাটিন নাম। আমার ছাত্রটিকে আমি ওই নামেই ডাকছি। নাম ধরে ডাকলে প্রথম দিকে আমার দিকে ফিরে ফিরে চাইত, এখন দেখছি গলা দিয়ে শব্দ করে উত্তর দেয়। এই প্রথম একটা কাককে 'কা' না বলে 'কি' বলতে শুনছি। তবে কণ্ঠস্বরের বিশেষ পরিবর্তন আমি আশা করছি না। অর্থাৎ কর্ভাসকে দিয়ে কথা বলানো চলবে না। তার বুদ্ধির পরিচয় তার কাজেই প্রকাশ পাবে বলে আমার বিশ্বাস।

কর্ভাস এখন ইংরাজি শিখছে। বাইরে গিয়ে ডিমন্‌স্ট্রেশন দিতে গেলে এই ভাষাটা প্রয়োজন হবে। ওর ট্রেনিং-এর সময় হলো সকাল আটটা থেকে ন'টা। দিনের বেলা বাকি সময়টা ও আমার ঘরের আশপাশেই ঘোরাফেরা করে। সন্ধ্যা হলে এখনও রোজই চলে যায় আমার বাগানের উত্তর-পশ্চিম কোণের আম গাছটায়।

নিউটন দেখছি কর্ভাসকে দিব্যি মেনে নিয়েছে। আজকে যে ঘটনাটা ঘটল, তার পরের সম্পর্কটা বন্ধুত্বে পরিণত হলেও আশ্চর্য হব না। ব্যাপারটা ঘটল দুপুরে। নিউটন আমার আরাম কেদারাটার পাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে, কর্ভাস কোথায় যেন উধাও, আমি খাতায় নোট লিখছি, এমন সময় হঠাৎ ডানার ঝটপটানি শুনে জানালার দিকে চেয়ে দেখি কর্ভাস ঘরে ঢুকেছে, তার ঠোঁটে একটি সদ্য কাটা মাছের টুকরো। সে সেটাকে এনে থপ করে নিউটনের সামনে ফেলে দিয়ে আবার জানালায় ফিরে গিয়ে বসে বসেই ঘাড় বেঁকিয়ে এ দিক ও দিক দেখতে লাগল।

গ্রেনফেল আমার চিঠির উত্তর দিয়েছে। লিখছে, সে পক্ষিবিজ্ঞানীদের সম্মেলনে আমাকে নেমন্তন্ন পাঠানোর বন্দোবস্ত করছে। আমি অবশ্যই যেন কাক সমেত যথাসময়ে সানতিয়াগোতে গিয়ে হাজির হই।

২০শে অক্টোবর

দু-সপ্তাহে অভাবনীয় প্রোগ্রেস। কর্ভাস ঠোঁটে পেনসিল নিয়ে ইংরিজি কথা আর সংখ্যা লিখছে। কাগজটাকে টেবিলের উপর ফেলে দিতে হয়, কর্ভাস তার উপর দাঁড়িয়ে লেখে। ওর নিজের নাম ইংরাজিতে লিখল— C-O-R-V-U-S। সহজ যোগ বিয়োগ করতে পারছে, ইংল্যান্ডের রাজধানী কী জিজ্ঞেস করলে লিখতে পারছে, আমার পদবি লিখতে পারছে। তিন দিন আগে মাস, বার, তারিখ শিখিয়ে দিয়েছিলাম, আজকে কী বার, জিজ্ঞেস করাতে পরিষ্কার অক্ষরে লিখল—F-R-I-D-A-Y।

কর্ভাসের খাওয়ার ব্যাপারেও বুদ্ধির পরিচয় পেয়েছি। আজ একটা পাত্রে রুটি-টোস্টের টুকরো আর আরেকটাতে খানিকটা পেয়ারার জেলি ওর সামনে রেখেছিলাম। ও রুটির টুকরোগুলো মুখে পোরার আগে প্রতি বারই ঠোঁট দিয়ে খানিকটা জেলি মাখিয়ে নিচ্ছিল।

২২শে অক্টোবর

কর্ভাস যে এখন সাধারণ কাকের থেকে নিজেকে আলাদা রাখতে চায়, তার স্পষ্ট প্রমাণ আজকে পেলাম। আজ দুপুরে হঠাৎ খুব বৃষ্টি হলো, সঙ্গে বিদ্যুৎ ও বজ্রপাত। তিনটে নাগাদ একটা কানফাটানো বাজ পড়ার শব্দ শুনে জানালার কাছে গিয়ে দেখি, আমার বাগানের বাইরের শিমুল গাছটা থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। বিকেলে বৃষ্টি থামার পর প্রচণ্ড কাকের কোলাহল। এ তল্লাটে যত কাক আছে, সব ওই মরা গাছটায় জড়ো হয়ে হল্লা করছে। আমার চাকর প্রহ্লাদকে ব্যাপারটা দেখতে পাঠালাম। সে ফিরে এসে বলল, 'বাবু, একটা কাক মরে পড়ে আছে গাছটার নীচে, তাই এত চেল্লাচেল্লি।' বুঝলাম বাজ পড়ার ফলেই কাকটার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য—কর্ভাস আমার ঘর থেকে বেরোবার কোনো রকম আগ্রহ দেখাল না। সে একমনে পেনসিল মুখে দিয়ে প্রাইম নাম্বার্‌স লিখে চলেছে— 2,3,4,5,7,11,13......

৭ই নভেম্বর

কর্ভাসকে এখন সদর্পে বৈজ্ঞানিক মহলে উপস্থিত করা চলে। পাখিকে শিখিয়ে পড়িয়ে খুঁটিনাটি ফরমাশ খাটানোর নানা রকম উদাহরণ পাওয়া যায়, কিন্তু কর্ভাসের মতো এমন শিক্ষিত পাখির নজির পৃথিবীর ইতিহাসে আর আছে বলে আমার জানা নেই। অরনিথন যন্ত্রের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। অঙ্ক, জ্যামিতি, ইতিহাস, ভূগোল, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ইত্যাদি সব বিষয়েই যে সব প্রশ্নের উত্তর সংখ্যার সাহায্যে বা অল্প কয়েকটি শব্দের সাহায্যে দেওয়া যায়, কর্ভাস তা শিখে নিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ওর মধ্যে যে জিনিসটা প্রায় আপনার থেকে জেগে উঠেছে, সেটাকে বলা চলে মানবসুলভ বুদ্ধি বা হিউম্যান ইনটেলিজেন্স— যেটার সঙ্গে পাখির কোনো সম্পর্ক নেই। উদাহরণস্বরূপ একটা ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। সানতিয়াগো যাব বলে আজ সকালে আমার সুটকেস গোছাচ্ছিলুম। গোছানো শেষ হলে পর বাক্সের ঢাকনা বন্ধ করে পাশে ফিরে দেখি, কর্ভাস সুটকেসের চাবিটা ঠোঁটে নিয়ে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে।

কাল গ্রেনফেলের আর একটা চিঠি পেয়েছি। ও সানতিয়াগো পৌঁছে গেছে। পক্ষিবিজ্ঞানী সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ আমার আসার পথ চেয়ে আছে। এর আগে এই সব সম্মেলনে কেবল পাখি নিয়ে বক্তৃতাই হয়েছে, জ্যান্ত পাখির সাহায্যে উদাহরণ সমেত কোনো বক্তৃতা কখনই হয়নি। গত দু'মাসের গবেষণার ফলে পাখির মস্তিষ্কের বিষয়ে আমি যে দুর্লভ জ্ঞান সঞ্চয় করেছি, সে সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ লিখছি। সেটাই হবে সম্মেলনে আমার পেপার। প্রতিবাদীর মুখ বন্ধ করার জন্য সঙ্গে থাকবে কর্ভাস।

১০ই নভেম্বর

দক্ষিণ আমেরিকা যাবার পথে প্লেনে বসে এই ডায়রি লিখছি। একটিমাত্র ঘটনাই লেখার আছে। বাড়ি থেকে যখন রওনা হব, তখন কর্ভাস হঠাৎ দেখি তার খাঁচা থেকে বার হওয়ার জন্য ভারী ছটফটানি আরম্ভ করেছে। কী ব্যাপার বুঝতে না পেরে খাঁচার দরজা খুলে দিতেই সে সটান উড়ে গিয়ে আমার রাইটিং টেবিলে বসে ঠোঁট দিয়ে উপরের দেরাজাটায় ভীষণ ব্যস্তভাবে টোকা মারতে আরম্ভ করল। দেরাজ খুলে দেখি, আমার পাসপোর্ট-টা তার মধ্যে রয়ে গেছে।

কর্ভাসের জন্য একটা নতুন ধরনের খাঁচা বানিয়ে নিয়েছি। যে আবহাওয়া কর্ভাসের পক্ষে সবচেয়ে আরামদায়ক, খাঁচার ভিতর কৃত্রিম উপায়ে সেই আবহাওয়া বজায় রাখার ব্যবস্থা করেছি। খাবার জন্য কাকের পক্ষে পুষ্টিকর ভিটামিন দিয়ে হোমিওপ্যাথিক বড়ির মতো মুখরোচক বড়ি তৈরি করে নিয়েছি।

প্লেনের যাত্রীদের মধ্যে কেউই বোধ হয় এর আগে কখনও পোষা কাক দেখেনি। কর্ভাস তাই সকলেরই কৌতূহল উদ্রেক করছে। তবে আমি আমার কাকের বিশেষত্ব সম্পর্কে কাউকে কিছু বলিনি। ব্যাপারটা গোপন রাখতে চাই অনুমান করেই বোধ হয় কর্ভাসও সাধারণ কাকের মতোই ব্যবহার করছে।

১৪ই নভেম্বর

হোটেল একসেলসিয়র, সানতিয়াগো। রাত এগারোটা। দু'দিন খুব ব্যস্ত ছিলাম, তাই ডায়রি লেখার সময় পাইনি। আগে আমার বক্তৃতার কথাটা বলে নিই, তারপর এই কিছুক্ষণ আগের চাঞ্চল্যকর ঘটনায় আসা যাবে। এক কথায় বলা যায়, কর্ভাসসহ আমার বক্তৃতাটা হয়েছে—অ্যানাদার ফেদার ইন মাই ক্যাপ। লেখাটা পড়তে লেগেছিল আধ ঘণ্টা, তারপর কর্ভাসকে নিয়ে ডিমনস্ট্রেশন চলল এক ঘণ্টার উপর। আমি মঞ্চে উঠেই কর্ভাসকে খাঁচা থেকে বার করে টেবিলের উপর ছেড়ে দিয়েছিলাম। প্রকাণ্ড লম্বা মেহগনির টেবিল, তার পিছনে লাইন করে সম্মেলনের কর্তৃপক্ষরা বসেছেন, আমি এক পাশে দাঁড়িয়ে মাইক্রোফোনে আমার প্রবন্ধ পড়ছি। পড়া যতক্ষণ চলল, ততক্ষণ কর্ভাস এক পা-ও নড়েনি। তার এক পাশে ঘাড় কাত করার ভঙ্গি ও মাঝে মাঝে মাথা উপরনীচ করা থেকে মনে হচ্ছিল, সে গভীর মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনছে এবং কথা বুঝতেও পারছে। বক্তৃতা শেষ হবার পর চারিদিক থেকে করধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে একটা কাঠঠোকরার মতো শব্দ শুনে টেবিলের দিকে চেয়ে দেখি, কর্ভাস তার ঠোঁট দিয়ে হাততালির সঙ্গে তাল মিলিয়ে টেবিলের উপর ঠুকে চলেছে।

ডিমনস্ট্রেশনের সময় অবিশ্যি কর্ভাসের কোনো বিরাম ছিল না। গত দু' মাসে সে যা কিছু শিখেছে সবই সম্মেলনের

অভ্যাগতদের সামনে উপস্থিত করে তাঁদের তাক লাগিয়ে দিয়েছে। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছে যে পাখির মস্তিষ্কে মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধি যে এভাবে প্রবেশ করতে পারে, তা কেউ কল্পনাই করতে পারেনি। এখানকার কাগজ 'কোরিয়েরে দেল সানতিয়াগো'-র সান্ধ্য সংস্করণ এর মধ্যেই কর্ভাসের খবর বেরিয়ে গেছে। শুধু বেরিয়েছে নয়, প্রথম পাতায় প্রধান খবর বেরিয়েছে, আর তার সঙ্গে বেরিয়েছে পেনসিল মুখে কর্ভাসের একটা ছবি।

মিটিং-এর পর গ্রেনফেল ও সম্মেলনের চেয়ারম্যান সিনিয়র কোভারুবিয়াসের সঙ্গে সানতিয়াগো শহর দেখতে বেরিয়েছিলাম। জনবহুল মনোরম আধুনিক শহর, পুব দিকে আন্ডিজ পর্বতশ্রেণি চিলি ও আরজেনটিনার মধ্যে প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে আছে। ঘণ্টাখানেক ঘোরার পর কোভারুবিয়াস বললেন, 'সম্মেলনের প্রোগ্রামে দেখে থাকবে, অতিথিদের জন্য আমরা নানা রকম আমোদপ্রমোদের আয়োজন করেছি। তার মধ্যে আজ বিকেলের ব্যাপারটায় আমি ব্যক্তিগতভাবে তোমাকে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করছি। একটি চিলিয়ান জাদুকর আজ তামাশা দেখাবেন তোমাদের খাতিরে। ইনি আর্গাস নামে পরিচিত। এঁরা বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, ইনি ম্যাজিকে নানা রকম পাখি ব্যবহার করেন।'

ব্যাপারটা শুনে কৌতূহল হয়েছিল, তাই আমি আর গ্রেনফেল আজ বিকেলে এখানকার প্লাজা থিয়েটারে আর্গাসের ম্যাজিক দেখতে গিয়েছিলাম। লোকটা নানা রকম পাখি ব্যবহার করে সেটা ঠিকই। হাঁস, কাকাতুয়া, পায়রা, মোরগ, তিন হাত লম্বা সারস, এক ঝাঁক হামিং বার্ড—এ সবই কাজে লাগায় আর্গাস এবং বোঝাই যায় যে, সবকটি পাখিকেই সে বেশ দক্ষতার সঙ্গে কাজ শিখিয়ে নিয়েছে। বলাবহুল্য এই কাজের কোনোটাই আমার কর্ভাসের কৃতিত্বের ধারেকাছেও আসে না। সত্যি বলতে কী, পাখির চেয়ে আমার অনেক বেশি ইনটারেস্টিং মনে হলো জাদুকর ব্যক্তিটিকে। টিয়াপাখির মতো নাক, মাঝখানে সিঁথি করা, টান করে পিছনে আঁচড়ানো নতুন গ্রামোফোন রেকর্ডের মতো চকচকে চুল, চোখে মাইনাস পাওয়ারের চশমা, তার কাচ এত পুরু যে, মণি দুটোকে তীক্ষ্ণ বিন্দুর মতো দেখায়। লম্বায় লোকটা ছ'ফুটের উপর। চকচকে কালো কোটের আস্তিনের ভিতর থেকে দুটো শীর্ণ ফ্যাকাশে হাত বেরিয়ে আছে, সেই হাতের বিভিন্ন ভঙ্গিমাই দর্শকদের সম্মোহিত করে রাখে। জাদু খুব উঁচু দরের না হলেও, জাদুকরের চেহারা ও হাবভাব দেখেই প্রায় পয়সা উঠে আসে। আমি শো দেখে হল থেকে বেরোবার সময় গ্রেনফেলকে পরিহাসচ্ছলে বললাম, 'আমাদের যেমন আর্গাসের ম্যাজিক দেখানো হলো, আর্গাসকে তেমনই কর্ভাসের খেলা দেখাতে পারলে মন্দ হতো না।'

রাত ন'টায় ডিনার ও তারপরে অতি উপাদেয় চিলিয়ান কফি খেয়ে গ্রেনফেলের সঙ্গে হোটেলের বাগানে কিছুক্ষণ কাটিয়ে সবেমাত্র ঘরে এসে বাতি নিবিয়ে বিছানায় শুয়েছি, এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। আমি একটু অবাক হয়ে অন্ধকারেই রিসিভারটা তুলে কানে দিলাম।

'সিনিয়ার শঙ্কু?'

'হ্যাঁ—'

'আমি রিসেপ্‌শন থেকে বলছি। আপনাকে অসময়ে বিরক্ত করার জন্যে ক্ষমা চাইছি। একটি ভদ্রলোক বিশেষ করে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।'

আমি বাধ্য হয়েই বললাম যে আমি ক্লান্ত, সুতরাং ভদ্রলোক যদি কাল সকালে আমাকে টেলিফোন করে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে পারেন, তা হলে ভালো. হয়। নিশ্চয়ই কোনো রিপোর্টার। এর মধ্যেই চারজন সাংবাদিককে ইন্টারভিউ দিতে হয়েছে এবং তারা যে সব প্রশ্ন করেছে, তাতে আমার মতো ঠান্ডা মেজাজের মানুষকেও রীতিমতো অসহিষ্ণু হয়ে পড়তে হয়। একজন সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন, ভারতবর্ষে যেমন গোরুকে পুজো করা হয়, তেমনই কাককেও হয় কি না।

রিসেপ্‌শন লোকটির সঙ্গে কথা বলে বলল, 'সিনিয়র শঙ্কু, ভদ্রলোক বলছেন তিনি পাঁচ মিনিটের বেশি সময় নেবেন না। সকালে ওঁর একটা অন্য এন্‌গেজমেন্ট রয়েছে।

বললাম, 'যিনি এসেছেন তিনি কি সংবাদপত্রের লোক?'

'আজ্ঞে, না। ইনি হলেন বিখ্যাত চিলিয়ান জাদুকর আর্গাস।'

নামটা শুনে বাধ্য হয়েই ভদ্রলোককে উপরে আসতে বলতে হলো। বিছানার পাশের টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে দিলাম। তিন মিনিট পরে কলিং বেল বেজে উঠল।

দরজা খুলে যাঁকে সামনে দেখলাম, তাঁকে স্টেজে ছ'ফুট বলে মনে হয়েছিল, এখন বুঝলাম তিনি সাড়ে ছ'ফুটেরও বেশি লম্বা। সত্যি বলতে কী, এত লম্বা মানুষ এর আগে আমি কখনও দেখিনি। বিলিতি কায়দায় সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে নমস্কার জানাবার সময়ও তিনি আমার চেয়ে প্রায় ছ-ইঞ্চি লম্বা রয়ে গেলেন। ভদ্রলোককে ঘরে আসতে বললাম। স্টেজের পোশাক ছেড়ে জাদুকর এখন সাধারণ সুট পরে এসেছেন, তবে এ সুটের রংও কালো। ঘরে ঢোকার পর লক্ষ করলাম, কোটের পকেটে 'কোরিয়েরে দেল সানতিয়াগো'-র সান্ধ্য সংস্করণ। আর্গাস চেয়ারে বসার পর তাঁর ম্যাজিকের তারিফ করে বললাম, 'যত দূর মনে পড়ছে, গ্রিক উপকথায় আর্গাস নামক একজন কীর্তিমান পুরুষের কথা পড়েছি, যার সর্বাঙ্গে ছিল সহস্র চোখ। একজন জাদুকরের পক্ষে নামটা বেশ মানানসই।

আর্গাস মৃদু হেসে বললেন 'সেই কীর্তিমান পুরুষটির সঙ্গে পাখির একটা সম্পর্ক রয়েছে, মনে পড়ছে নিশ্চয়ই।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। গ্রিক দেবী হেরা আর্গাসের চোখগুলি তুলে ময়ূরের পুচ্ছে বসিয়ে দিয়েছিলেন। সেই থেকেই ময়ূরের লেজে চাকা চাকা দাগ। কিন্তু আমার কৌতূহল হচ্ছে আপনার চোখ সম্পর্কে। কত পাওয়ার আপনার চশমার?'

'মাইনাস কুড়ি। তবে তাতে কিছু এসে যায় না। আমার পাখিগুলোর কোনোটারই চশমার প্রয়োজন হয় না।'

নিজের রসিকতায় নিজেই অট্টহাস্য করে উঠলেন আর্গাস। কিন্তু সে হাসি ফুরোবার আগেই ভদ্রলোক হঠাৎ মুখ-হাঁ অবস্থাতেই থেকে গেলেন। তাঁর চোখ চলে গেছে আমার ঘরের তাকে রাখা প্লাস্টিকের খাঁচটার দিকে। কর্ভাস ঘুমিয়ে পড়েছিল; এখন দেখছি জাদুকরের অট্টহাসিতেই বোধ হয় তার ঘুমটা ভেঙে গেছে। সে দিব্যি ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে আছে আগন্তুকটির দিকে ।

আর্গাস মুখ-হাঁ অবস্থাতেই চেয়ার ছেড়ে উঠে খাঁচাটার দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর মিনিটখানেক ধরে কর্ভাসের দিকে চেয়ে বললেন, 'আজ সন্ধ্যার কাগজে এর বিষয় পড়ে অবধি আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি। আপনার বক্তৃতা শোনার সৌভাগ্য আমার হয়নি। আমি পক্ষিবিজ্ঞানী নই, কিন্তু আমিও পাখিদের শিক্ষা দিয়ে থাকি।'

ভদ্রলোক চিন্তিতভাবে ফিরে এসে চেয়ারে বসলেন। তারপর বললেন, 'বেশ বুঝতে পারছি আপনি ক্লান্ত, কিন্তু তাও অনুরোধ করছি—যদি আপনার এই পাখিটিকে একবার খাঁচা থেকে বার করতে পারেন ...একবার যদি ওর বুদ্ধির একটু নমুনা...'

আমি বললাম, 'শুধু আমিই ক্লান্ত নই, আমার পাখিও ক্লান্ত। আমার খাঁচার দরজা খুলে দিচ্ছি। বাকিটা নির্ভর করবে আমার পাখির মেজাজের উপর। আমি ওকে জোর করে ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করাতে চাই না'।

'বেশ তো— তাই হোক...'

খাঁচার দরজা খুলে দিলাম। কর্ভাস বেরিয়ে এসে ডানার তিন ঝাপটায় আমার খাটের পাশে টেবিলটায় এসে ঠোঁটের এক অব্যর্থ ঠোকরে ল্যাম্পটা নিবিয়ে দিল।

ঘর এখন অন্ধকার। জানালা দিয়ে রাস্তার উলটো দিকে হোটেল মেট্রোপোলের জ্বলা-নেবা সবুজ নিয়নের ফিকে আলো ঘরে প্রবেশ করছে। আমি চুপ। কর্ভাস ডানা ঝটপটিয়ে ফিরে গিয়ে খাঁচায় ঢুকে ঠোঁট দিয়ে টেনে দরজা বন্ধ করে দিল।

আর্গাসের মুখের উপর সবুজ আলো নিয়নের তালে তালে জ্বলছে, নিবছে। তার সোনার চশমার পুরু কাচের ভিতর সাপের মতো চোখ সবুজ আলোয় আরও বেশি সাপের মতো মনে হচ্ছে। বেশ বুঝতে পারছি সে অবাক, হতভম্ব। বেশ বুঝতে পারছি, কর্ভাস ঘরের বাতি নিবিয়ে তার মনের যে ভাবটা প্রকাশ করল, সেটা আর্গাসের বুঝতে বাকি নেই। কর্ভাস এখন বিশ্রাম চাইছে। সে চায় না ঘরে আলো জ্বলে। সে অন্ধকার চায়, অন্ধকারে ঘুমোতে চায়।

আর আর্গাস? তার সরু গোঁফের নীচে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে একটা ফিসফিসে শব্দ উচ্চারিত হলো— 'ম্যানিফিকো!'—অর্থাৎ চমকপ্রদ, অসামান্য। সে তার হাতদুটো যেন তালির ভঙ্গিতে থুতনির সামনে এনে জড়ো করেছে। লক্ষ করলাম, তার নখগুলো

অস্বাভাবিক রকম লম্বা ও চকচকে। বুঝলাম, সে নখে নেলপালিশ মেখেছে। রুপোলি পালিশ। তার ফলে মঞ্চের স্পট লাইটে আঙুলের খেলা জমে ভালো। সেই রুপোলি নখে এখন বার বার বাইরের সবুজ নিয়নের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে।

'আই ওয়ান্ট দ্যাট ক্রো!'

ফিসফিসে শুকনো গলায় ইংরেজিতে আর্গাসের কথা এল। এতক্ষণ সে স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলছিল আমার সঙ্গে। কথাগুলো লিখতে গিয়ে বুঝতে পারছি, তাতে একটা নগ্ন নির্লজ্জ লোভের ইঙ্গিত এসে পড়ছে, কিন্তু আসলে আর্গাসের কণ্ঠস্বরে ছিল অনুনয়।

'আই ওয়ান্ট দ্যাট ক্রো!'—আবার বলল আর্গাস।

আমি চুপ করে তার দিকে চেয়ে রইলাম। এখন কিছু বলার দরকার নেই। আরও কী বলতে চায় লোকটা, দেখা যাক।

আর্গাস এতক্ষণ জানালার দিকে চেয়ে ছিল। এবার সে আমার দিকে দৃষ্টি ফেরাল। ভারী অদ্ভুত লাগছিল এই অন্ধকার আর সবুজ আলোর খেলা। এও যেন একটা ভেলকি। লোকটা এই আছে, এই নেই।

আর্গাসের লম্বা আঙুলগুলো নড়েচড়ে উঠল। সেগুলো এখন তার নিজের দিকে ইঙ্গিত করছে।

'আমাকে দেখো প্রোফেসর। আমি আর্গাস। আমি বিশ্বের সেরা জাদুকর। দুই আমেরিকার প্রতিটি শহরের প্রতিটি জাদুপ্রিয় লোক আমাকে চেনে। ছেলে, বুড়ো, মেয়ে, পুরুষ সবাই চেনে। আগামী মাসে আমি পৃথিবী ভ্রমণে বেরোচ্ছি। রোম, ম্যাড্রিড, প্যারিস, লন্ডন, অ্যাথেন্স, স্টকহোলম, টোকিও, হংকং...। আমার ক্ষমতা এবার স্বীকৃত হবে সারা বিশ্বে। কিন্তু আমার চমকপ্রদ

ম্যাজিক আরও সহস্র গুণে বেশি চমকপ্রদ হবে— কীসে জান? ইফ আই গেট দ্যাট ক্রো—দ্যাট ইনডিয়ান ক্রো! ওই পাখি আমার চাই প্রোফেসর— ওই পাখি আমার চাই...আমার চাই...আমার চাই...'

আর্গাস তার ফিসফিসে কথার সঙ্গে সঙ্গে তার হাতটা আমার চোখের সামনে নাড়ছে, আঙুলগুলোকে সাপের ফণার মতো দোলাচ্ছে, নখগুলো সবুজ আলোয় চকচক করছে। আমি মনে মনে হাসলাম। আমার জায়গায় অন্য যে কোনো লোক হলে আর্গাসের কার্যসিদ্ধি হতো। অর্থাৎ সে লোক হিপ্‌নোটাইজড হতো, সেই সুযোগে খাঁচার পাখিও আর্গাসের হস্তগত হতো। আমাকে হিপ্‌নোটাইজ করা যে সহজ নয় সেটা এবার আমার কথা থেকেই বোধ হয় জাদুকর বুঝতে পারল।

'মিস্টার আর্গাস, আপনি বৃথা বাক্য ব্যয় করছেন। আর আমাকে সম্মোহিত করার চেষ্টাও বৃথা। আপনার অনুরোধ রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কর্ভাস শুধু আমার ছাত্রই নয়, সে আমার সন্তানের মতো, সে আমার বন্ধু, আমার অক্লান্ত পরিশ্রম ও গবেষণার—'

'প্রোফেসর!'—আর্গাসের কণ্ঠস্বর আগের চেয়ে অনেক তীব্র। কিন্তু পরক্ষণই সে আবার গলা নামিয়ে বলে চলল, 'প্রোফেসর, তুমি কি জান যে আমি ক্রোড়পতি? শহরের পূর্ব প্রান্তে আমার একটা পঞ্চাশ কামরাবিশিষ্ট প্রাসাদ রয়েছে, সেটা কি তুমি জান? আমার বাড়িতে ছাব্বিশজন চাকর, আমার চারটে ক্যাডিলাক গাড়ি—এ সব কি তুমি জান? খরচের তোয়াক্কা আমি করি না, প্রোফেসর। ওই পাখির জন্য তোমাকে আমি আজই, এক্ষুনি দশ হাজার এস্‌কুডো দিতে রাজি আছি।'

দশ হাজার এস্‌কুডো মানে প্রায় পনেরো হাজার টাকা। আর্গাস জানে যে, সে যেমন খরচের তোয়াক্কা করে না, আমি তেমনই টাকা জিনিসটারই তোয়াক্কা করি না। সে কথাটা তাকে বললাম। আর্গাস এবার একটা শেষ চেষ্টা করল।

'তুমি তো ভারতীয়। তুমি কি অলৌকিক যোগাযোগে বিশ্বাস কর না? ভেবে দেখো— আর্গাস— কর্ভাস! ওই কাকের নামকরণ হয়েছে আমারই জন্য, সেটা কি তুমি বুঝতে পারছ না, প্রোফেসর?'

আমি আর ধৈর্য রাখতে পারলাম না। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে বললাম, 'মিস্টার আর্গাস— তোমার গাড়ি বাড়ি খ্যাতি অর্থ নিয়ে তুমি থাকো, কর্ভাস আমার কাছেই থাকবে। ওর শিক্ষা এখনও শেষ হয়নি। ওকে নিয়ে আমার এখনও অনেক আজ বাকি। আমি আজ ক্লান্ত। তুমি পাঁচ মিনিট সময় চেয়েছিলে, আমি বিশ মিনিট দিয়েছি, আর দিতে পারছি না। আমি এখন ঘুমোব। আমার পাখিও ঘুমোবে। সুতরাং গুড নাইট।'

আমার কথাগুলো শুনে আর্গাসের মুখে হতাশার ছাপ দেখে একটা সামান্য অনুকম্পার ভাব মনে প্রবেশ করলেও সেটাকে একেবারেই আমল দিলাম না। আর্গাস আবার বিলিতি কায়দায় মাথা নুইয়ে স্প্যানিশ ভাষায় 'গুড নাইট' জানিয়ে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

দরজা বন্ধ করে খাঁচার কাছে গিয়ে দেখি কর্ভাস এখনও জেগে আছে। আমি যেতেই সে ঠোঁট ফাঁক করে একটা শব্দ উচ্চারণ করল 'কে' এবং শব্দটাতে যে একটা জিজ্ঞাসা রয়েছে, সেটা তার বলার সুরেই স্পষ্ট।

বললাম, 'এক পাগলা জাদুকর। টাকার গরমটা বড্ড বেশি। তোমাকে চাইতে এসেছিল, আমি না করে দিয়েছি। সুতরাং তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারো।'

১৬ই নভেম্বর

ভেবেছিলাম কালকের ঘটনা কালকেই লিখে রাখব, কিন্তু বিভীষিকার ঘোর কাটাতে সারা রাত লেগে গেল।

কাল সকালটা যেভাবে শুরু হয়েছিল, তাতে বিপদের কোনো পূর্বাভাস ছিল না। সকালে সম্মেলনের বৈঠক ছিল, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে জাপানি পক্ষিবিজ্ঞানী তোমাসাকা মোরিমোতোর ঘোর ক্লান্তিকর ভাষণ। সঙ্গে কর্ভাসকে নিয়ে গিয়েছিলাম। প্রায় এক ঘণ্টা বক্তৃতার পর হঠাৎ খেই হারিয়ে ফেলে মোরিমোতো আমতা আমতা করছিল, এমন সময় কর্ভাস হঠাৎ আমার চেয়ারের হাতলে সশব্দে ঠোঁটতালি আরম্ভ করে দিল। হলের লোক তাতে হো হো করে হেসে ওঠাতে আমি ভারী অপ্রস্তুতে পড়ে গিয়েছিলাম।

দুপুরে আমাদের হোটেলেই সম্মেলনের কয়েকজন ডেলিগেটের সঙ্গে লাঞ্চ ছিল। সেখানে যাবার আগে আমি আমার একাত্তর নম্বর ঘরে এসে কর্ভাসকে খাঁচায় রেখে খাবার দিয়ে বললাম, 'তুমি থাকো। আমি খেয়ে আসছি।' বাধ্য কর্ভাস কোনো আপত্তি করল না।

লাঞ্চ শেষ করে যখন ওপরে এসেছি, তখন আড়াইটে। দরজায় চাবি লাগাতেই বুঝলাম, সেটার প্রয়োজন হবে না, কারণ দরজা খোলা। মুহূর্তের মধ্যে একটা চরম বিপদের আশঙ্কা আমার রক্ত জল করে দিল। ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকে দেখি— যা ভেবেছিলাম, তাই। খাঁচা সমেত কর্ভাস উধাও।

আবার ঝড়ের মতো ঘরের বাইরে এলাম। উত্তরদিকে দুটো ঘর পরেই বাঁ দিকে রুমবয়দের ঘর। ঊর্ধ্বশ্বাসে সে ঘরে গিয়ে দেখি, দুটো রুমবয়ই পাশাপাশি পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে। তাদের চোখের চাহনি দেখেই বুঝতে পারলাম, তাদের দুজনকেই হিপ্‌নোটাইজ করা হয়েছে।

চলে গেলাম একশো সাত নম্বর ঘরে গ্রেনফেলের কাছে। তাকে সমস্ত ব্যাপারটা বলে দুজন সটান গিয়ে হাজির হলাম একতলার রিসেপ্‌শনে। রিসেপ্‌শন ক্লার্ক বলল, 'আমাদের কাছ থেকে কেউ আপনার ঘরের চাবি চাইতে আসেনি। ডুপ্লিকেট চাবি রুমবয়দের কাছে থাকে, তারা যদি দিয়ে থাকে।'

রুমবয়দের অবিশ্যি দেওয়ার দরকার হয়নি। আর্গাস তাদের জাদুবলে অকেজো করে দিয়ে নিজেই চাবি নিয়ে তার কাজ হাসিল করেছে।

শেষটায় হোটেলের দ্বাররক্ষকের কাছে গিয়ে আসল খবর পাওয়া গেল। সে বলল, আধ ঘণ্টা আগে একটা সিল্‌ভার ক্যাডিলাক গাড়িতে আর্গাস এসেছিলেন। তার দশ মিনিট পরে হাতে একটা সেলোফোনের ব্যাগ নিয়ে তিনি হোটেল থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে চলে যান।

রুপোলি রঙের ক্যাডিলাক। কিন্তু এখান থেকে কোথায় গেছে আর্গাস? তার বাড়িতে কি? না অন্য কোথাও?

অবশেষে কোভারুবিয়াসের শরণাপন্ন হতে হলো। ভদ্রলোক বললেন, 'আর্গাসের বাড়ি কোথায় সেটা এক্ষুনি জেনে দিতে পারি, কিন্তু তাতে কী লাভ হবে? সে কি আর বাড়িতে গেছে? সে তোমার কর্ভাসকে নিয়ে নিশ্চয়ই অন্য কোথাও গা ঢাকা দিয়েছে। তবে সে যদি শহরের বাইরে বেরোতে যায়, তা হলে একটাই রাস্তা আছে। তোমাদের আমি ভালো গাড়ি, ভালো ড্রাইভার আর সঙ্গে পুলিশ দিতে পারি। সময় কিন্তু খুব কম। আধ ঘণ্টার মধ্যে বেরিয়ে পড়ো। হাইওয়ে ধরে চলে যাবে। যদি কপালে থাকে তো তার সন্ধান পাবে।'

সোয়া তিনটের মধ্যে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। রওনা হবার আগে হোটেল থেকে ফোন করে জেনে নিয়েছিলাম যে, আর্গাস (আসল নাম দোমিনগো বার্তেলেমে সারমিয়েন্‌তো) তার বাড়িতে ফেরেনি। আমাদের সঙ্গে দুজন সশস্ত্র পুলিশ, আমরা পুলিশেরই গাড়িতেই চলেছি। দু'জন পুলিশের একজন— ছোকরা বয়স, নাম কারেরাস— দেখলাম আর্গাস সম্বন্ধে বেশ খবরটবর রাখে। বলল, সানতিয়াগো এবং আশেপাশে আর্গাসের নাকি একাধিক আস্তানা আছে। এককালে জিপসিদের সঙ্গে অনেকটা সময় কাটিয়েছে। উনিশ বছর বয়স থেকে ম্যাজিক দেখাতে আরম্ভ করেছে। পাখি নিয়ে ম্যাজিক শুরু করেছে বছরচারেক আগে, আর সেই থেকেই ওর জনপ্রিয়তা বাড়তে শুরু করেছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ও কি সত্যিই ক্রোড়পতি?'

কারেরাস বলল, 'তাই তো মনে হয়। তবে লোকটা ভয়ানক কঞ্জুস, কাউকে বিশ্বাস করে না। তাই ওর বন্ধু বলতে এখন আর বিশেষ কেউ নেই।'

শহর থেকে বেরিয়ে হাইওয়েতে পড়ে একটা আর মুশকিল হলো। হাইওয়ে দু'ভাগে ভাগ হয়ে একটা চলে গেছে উত্তরে লস্ আনডিজের দিকে, আর একটা চলে গেছে পশ্চিমে ভালপারাইজো বন্দর পর্যন্ত। দুটো হাইওয়ের মুখের কাছে একটা পেট্রোলের

দোকান। দোকানের লোকটাকে জিজ্ঞেস করাতেই সে বলল, 'ক্যাডিলাক? সিনিয়র আর্গাসের ক্যাডিলাক? সে তো গেছে ভালপারাইজোর রাস্তায়।'

আমাদের কালো মারসেডিস তিরবেগে রওনা দিল ভালপারাইজোর উদ্দেশে। কর্ভাসের প্রাণহানি হবে না সেটা জানি, কারণ তার প্রতি আর্গাসের লোভটা খাঁটি। কিন্তু কাল রাত্রে কর্ভাসের হাবভাব দেখেই বুঝেছিলাম যে, সে জাদুকর লোকটিকে মোটেই পছন্দ করছে না। সুতরাং আর্গাসের খপ্পরে পড়ে তার যে মনের অবস্থা কী হবে, সেটা ভাবতেই খারাপ লাগছে।

পথে আরও দুটো পেট্রোল স্টেশন পড়ল, এবং দুটোরই মালিকের সঙ্গে কথা বলে আমরা নিশ্চিন্ত হলাম যে আর্গাসের সিলভার ক্যাডিলাক এই রাস্তা দিয়েই গেছে।

আমি আশাবাদী লোক। নানান সময় নানান সংকট থেকে অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে এসেছি। আজ পর্যন্ত আমার কোনো অভিযানই ব্যর্থ হয়নি। কিন্তু আমার পাশে বসে গ্রেনফেল ঘন ঘন মাথা নাড়ছে আর বলছে, 'ভুলে যেও না, শঙ্কু—তুমি একজন অত্যন্ত ধূর্ত লোকের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছ। তোমার কর্ভাসকে সে যখন একবার হাতে পেয়েছে, তখন সে পাখি তুমি সহজে ফিরে পাবে না এটা জেনে রেখো।'

কারেরাস বলল, 'সিনিয়র আর্গাসের হাতে কিন্তু অস্ত্র থাকার সম্ভাবনা। এককালে তার অনেক ম্যাজিকে তাকে আসল রিভলভার ব্যবহার করতে দেখেছি।'

হাইওয়ে ক্রমে ঢালু নামছে। সানতিয়াগোর ষোলোশো ফুট থেকে এখন আমরা হাজারে নেমে এসেছি। পিছনে দূরে পর্বতশ্রেণি ক্রমে ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে আসছে। চল্লিশ মাইল পথ এসেছি, আরও চল্লিশ মাইল গেলে ভালপারাইজো। গ্রেনফেলের ব্যাজার মুখ আমার আশার প্রাচীরে বার বার আঘাত করে তাকে টলিয়ে দিচ্ছে। হাইওয়েতে কিছু না পেলে শহরে গিয়ে পড়তে হবে। তখন আর্গাস-এর অনুসন্ধান আরও সহস্র গুণ বেশি কঠিন হয়ে পড়বে।

রাস্তা সামনে খানিকটা চড়াই উঠে গেছে। পিছনে কী আছে দেখা যাচ্ছে না। গাড়ি এগিয়ে চলেছে দুর্বার গতিতে। চড়াই পেরোল। সামনে রাস্তা ঢালু নেমে গেছে বহু দূর। রাস্তার পাশে এখানে ওখানে দু'-একটা গাছ। বহু দূরে একটা গ্রাম। মাঠে মোষের দল। জনমানবের কোনো চিহ্ন নেই। কিন্তু সামনে ওটা কী? এখনও বেশ দূর। সিকি মাইল তো হবেই।

এখন চারশো গজের বেশি নয়। একটা গাড়ি। রোদে ঝলমল করছে। রাস্তার এক পাশে বেঁকে দাঁড়িয়ে আছে। তার পিছনে একটা গাছের গুঁড়ি।

এবার কাছে এসে পড়েছে গাড়িটা।

ক্যাডিলাক গাড়ি। সিলভার ক্যাডিলাক।

আমাদের মারসেডিস তার পাশে এসে দাঁড়াল। গাড়িটা কেন থেমে আছে, তার কারণটা এবার বুঝলাম। রাস্তার এক পাশে ছিটকে গিয়ে সেটা একটা গাছের গুঁড়িতে মেরেছে ধাক্কা। গাড়ির সামনের অংশ গেছে থেঁতলে।

কারেরাস বলল, 'সিনিয়র আর্গাসের গাড়ি। এ ছাড়া আরেকটা সিলভার ক্যাডিলাক আছে সানতিয়াগোতে। ব্যাঙ্কার সিনিয়র গাল্‌দামেসের গাড়ি। কিন্তু এটার নম্বর আমার চেনা।'

গাড়ি তো রয়েছে, কিন্তু আর্গাস কোথায়?

আর আমার কর্ভাস বা কোথায়?

ড্রাইভারের পাশের সিটে ওটা কী?

জানালা দিয়ে মুখ ঢুকিয়ে দেখলাম, সেটা কর্ভাসের খাঁচা। দরজার চাবি আমারই তৈরি, আর সেটা রয়েছে আমারই পকেটে। আজ দুপুরে দরজায় চাবি দিইনি, শুধু ছিটকিনিটাই লাগানো। কর্ভাস খাঁচা থেকে নিজেই বেরিয়েছে সন্দেহ নেই; কিন্তু তার পরে?

হঠাৎ একটা চিৎকার কানে এল। দূর থেকে। মানুষের গলা।

কারেরাস ও অন্য পুলিশটি বন্দুক উঁচিয়ে তৈরি। আমাদের ড্রাইভার দেখলাম ভিতু লোক। সে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে মেরিমাতার নাম জপ করতে শুরু করেছে। গ্রেনফেল ফিসফিস করে বলল, 'ম্যাজিশিয়ান জাতটা আমাকে বড্ড আনকাম্‌ফার্‌টেব্‌ল করে তোলে।' আমি বললাম, 'তুমি বরং আমাদের গাড়ির ভিতরে গিয়ে বোসো।'

চিৎকারটা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। রাস্তার বাঁ দিক থেকে। কিছু দূরে কতকগুলো ঝোপড়া। দু'-একটা বড়ো বড়ো গাছও রয়েছে। সেই দিক থেকেই আসছে চিৎকারটা। কাল রাত্রে ফিসফিসে গলা শুনেছি, তাই চিনতে দেরি হলো। এ গলা আর্গাসের। অকথ্য অশ্রাব্য স্প্যানিশে সে গাল দিয়ে চলেছে। কার উদ্দেশে? ডেভিল বা শয়তানের স্প্যানিশ প্রতিশব্দটা বারকয়েক কানে এল, আর তার সঙ্গে কর্ভাসের নামটা।

'কোথায় গেল সে শয়তান পাখি? কর্ভাস! কর্ভাস! মূর্খ পাখি ! শয়তান পাখি! নরকবাস আছে তোর কপালে। নরকবাস !'—

আর্গাসের কথা আচমকা থেমে গেল— কারণ সে আমাদের দেখতে পেয়েছে। আমরাও দেখতে পাচ্ছি তাকে। তার দু'হাতে দুটো রিভলভার। একশো হাত দূরে একটা ঝোপড়ার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে।

কারেরাস হুঙ্কার দিয়ে উঠল, 'সিনিয়র আর্গাস, তোমার অস্ত্র নামাও! নইলে—'

একটা কর্ণপটহবিদারক শব্দে আমাদের মারসেডিসের দরজায় একটা রিভলভারের গুলি এসে লাগল। তারপর আরও তিনটে গুলির শব্দ। এ দিকে ও দিকে আমাদের মাথার উপর দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল সেগুলি। কারেসাস দৃপ্ত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, 'সিনিয়র আর্গাস, আমাদের কাছে বন্দুক রয়েছে। আমরা পুলিশ। আপনি যদি রিভলভার না ফেলে দেন, তবে আমরা আপনাকে জখম করতে বাধ্য হব।'

'জখম?' আর্গাস শুকনো গলায় আর্তনাদ করে উঠল। 'তোমরা পুলিশ? আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না!'

আর্গাস এখন পঁচিশ হাতের মধ্যে। এইবার বুঝলাম তার দশাটা। তার চশমাটি খোওয়া যাওয়াতে সে প্রায় অন্ধের সামিল হয়ে পড়ে যত্রতত্র গুলি চালিয়েছে।

আর্গাস হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে হোঁচট খেতে খেতে এগিয়ে এল। কারেরাস ও অন্য পুলিশটি তার দিকে এগিয়ে গেল। আমি জানি, এ সংকটে আর্গাসের কোনো ভেলকিই কাজ করবে না। তার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। কারেরাস এগিয়ে গিয়ে মাটি থেকে রিভলভার দুটো তুলে নিল। আর্গাস তখন বলছে, 'সে পাখি উধাও হয়ে গেল! দ্যাট ইনডিয়ান ক্রো! শয়তান পাখি ...কিন্তু কী অসামান্য তার বুদ্ধি!'

গ্রেনফেল কিছুক্ষণ থেকে ফিসফিস করে কী যেন বলতে চেষ্টা করছিল, এবারে তার কথাটা বুঝতে পারলাম।

'শঙ্কু—দ্যাট বার্ড ইজ হিয়ার।'

কী রকম? কোথায় কর্ভাস? আমি তো দেখছি না তাকে!

গ্রেনফেল রাস্তার উলটোদিকে নেড়া অ্যাকেসিয়া গাছটার মাথার দিকে আঙুল দেখাল।

উপরে চেয়ে দেখলাম—সত্যিই তো— আমার বন্ধু, আমার শিষ্য, আমার প্রিয় কর্ভাস গাছটার সবচেয়ে উঁচু ডালে বসে নিশ্চিতভাবে আমাদের দিকে ঘাড় নিচু করে দেখছে।

তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকতেই সে অক্লেশে গোঁত খাওয়া ঘুড়ির মতো গাছের মাথা থেকে নেমে এসে বসল আমাদের মারসেডিসের ছাদের উপর। তারপর অতি সন্তর্পণে—যেন জিনিসটার মূল্য সে ভালোভাবেই জানে—তার ঠোঁট থেকে তার সামনেই নামিয়ে রাখল আর্গাসের মাইনাস বিশ পাওয়ারের সোনার চশমাটা।

আনন্দমেলা। পূজাবার্ষিকী ১৩৭৯

ডক্টর শেরিং-এর স্মরণশক্তি

২রা জানুয়ারি

আজ সকালটা বড়ো সুন্দর। চারিদিকে ঝলমলে রোদ, নীল আকাশে সাদা সাদা হৃষ্টপুষ্ট মেঘ, দেখে মনে হয় যেন ভুল করে শরৎ এসে পড়েছে। সদ্য-পাড়া মুরগির ডিম হাতে নিলে যেমন মনটা একটা নির্মল অবাক আনন্দে ভরে যায়, এই আকাশের দিকে চাইলেও ঠিক তেমনই হয়।

আনন্দের অবিশ্যি আরেকটা কারণ ছিল। আজ অনেক দিন পরে বিশ্রাম। আমার যন্ত্রটা আজই সকালে তৈরি হয়ে গেছে। বাগান থেকে ল্যাবরেটরিতে ফিরে এসে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে যন্ত্রটার দিকে চেয়ে থেকে একটা গভীর প্রশান্তি অনুভব করছে। জিনিসটা বাইরে থেকে দেখতে তেমন কিছুই নয়; মনে হবে যেন হাল ফ্যাশানের একটা টুপি বা হেলমেট। এই হেলমেটের খোলের ভিতর রয়েছে বাহাত্তর হাজার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তারের জটিল স্নায়বিক বিস্তার। সাড়ে তিন বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল এই যন্ত্র। এটা কী কাজ করে বোঝানোর জন্য একটা সহজ উদাহরণ দিই।

এই কিছুক্ষণ আগেই আমি চেয়ারে বসে থাকতে থাকেত আমার চাকর প্রহ্লাদ এসেছিল কফি নিয়ে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম,‘গত মাসের ৭ই সকালে বাজার থেকে কী মাছ এনেছিলে?’ প্রহ্লাদ মাথাটাথা চুলকে বলল, ‘এজ্ঞে সে তো স্মরণ নাই বাবু!’ আমি তখন তাকে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে হেলমেটটা মাথায় পরিয়ে দিয়ে একটা বোতাম টিপতেই প্রহ্লাদের শরীরটা মুহূর্তের জন্য শিউরে উঠে একেবারে স্থির হয়ে গেল। সেই সঙ্গে তার চোখ দুটো একটা নিষ্পলক দৃষ্টিহীন চেহারা নিল। এবার আমি তাকে আবার প্রশ্নটা করলাম।

‘প্রহ্লাদ, গত মাসের সাত তারিখ সকালে বাজার থেকে কী মাছ এনেছিল?’

প্রশ্নটা করতেই প্রহ্লাদের চাহনির কোনো পরিবর্তন হলো না; কেবল তার ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে জিভটা নড়ে উঠে শুধু একটি মাত্র কথা উচ্চারিত হলো—‘ট্যাংরা’।

এইভাবে শুধু প্রহ্লাদ কেন, যে কোনো লোকেরই যে কোনো হারানো স্মৃতিকে এ যন্ত্র ফিরিয়ে আনতে পারে। একজন সাধারণ লোকের মাথায় নাকি প্রায় ১০০,০০০,০০০,০০০,০০০—অর্থাৎ এক কোটি কোটি— স্মৃতি জমা থাকে, তার কোনোটা স্পষ্ট কোনোটা আবছা। তার মধ্যে দৃশ্য, ঘটনা, নাম, চেহারা, স্বাদ, গন্ধ, গান, গল্প, অজস্র খুঁটিনাটি তথ্য—সব কিছুই থাকে। সাধারণ লোকের দু'বছর বয়সের আগের স্মৃতি খুব অল্প বয়সেই মন থেকে মুছে যায়। আমার নিজের স্মরণশক্তি অবিশ্যি সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক গুণ বেশি। আমার এগারো মাস বয়সের ঘটনাও কিছু মনে আছে। অবিশ্যি কয়েকটা খুব ছেলেবেলার স্মৃতি আমার মনেও ঝাপসা হয়ে এসেছিল। যেমন এক বছর তিন মাস বয়সে একবার এখানকার সে যুগের ম্যাজিস্ট্রেট ব্ল্যাকওয়েল সাহেবকে ছড়ি হাতে কুকুর নিয়ে উশ্রীর ধারে বেড়াতে দেখেছিলাম। কুকুরটার রং ছিল সাদা, কিন্তু জাতটা মনে ছিল না। আজ যন্ত্রটা মাথায় দিয়ে দৃশ্যটা মনে করতেই তৎক্ষণাৎ কুকুরের চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে জানিয়ে দিল সেটা ছিল বুল টেরিয়ার।

যন্ত্রটার নাম দিয়েছি রিমেমব্রেন। অর্থাৎ ব্রেন বা মস্তিষ্ককে যে যন্ত্র রিমেমবার বা স্মরণ করতে সাহায্য করে। কালই এটার সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়েছি ইংল্যান্ডের নেচার পত্রিকায়। দেখা যাক কী হয়।

২৩শে ফেব্রুয়ারি

আমার লেখাটা নেচারে বেরিয়েছে, আর বেরোনোর পর থেকেই অজস্র চিঠি পাচ্ছি। ইউরোপ আমেরিকা রাশিয়া জাপান সব জায়গা থেকেই যন্ত্রটা দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ৭ই মে ব্রাসেল্‌স শহরে একটা বিজ্ঞানী সম্মেলন আছে সেখানে যন্ত্রটা ডিমন্‌স্ট্রেট করার জন্য অনুরোধ এসেছে। এমন একটা যন্ত্র যে হতে পারে সেটা বৈজ্ঞানিক মহলে অনেকেই বিশ্বাস করতে চাইছে না, যদিও আমার ক্ষমতার কথা এরা অনেকেই জানে। আসলে হয়েছে কী, স্মৃতির গূঢ় রহস্যটা এখনও বিজ্ঞানের ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে। আমি নিজেও শুধু এইটুকুই বুঝতে পেরেছি যে কোনো একটা তথ্য মাথার মধ্যে ঢুকলেই সেটা সেখানে স্মৃতি হিসাবে নিজের জন্য খানিকটা জায়গা করে নেয়। আমার বিশ্বাস, এক একটি স্মৃতি হলো এক একটি পরমাণুসদৃশ রাসায়নিক পদার্থ এবং প্রত্যেক স্মৃতিরই একটি করে আলাদা রাসায়নিক চেহারা ও ফরমুলা আছে। যত দিন যায়, স্মৃতি তত ঝাপসা হয়ে আসে, কারণ কোনো পদার্থই চিরকাল এক অবস্থায় থাকতে পারে না। আমার যন্ত্র মস্তিষ্কের মধ্যে বৈদ্যুতিক শক্তি চালনা করে স্মৃতি নামক পদার্থটিকে তাজা করে তুলে পুরোনো কথা মনে করিয়ে দেয়।

অনেকে প্রশ্ন করবে, স্মৃতির রহস্য সম্পূর্ণ ভেদ না করেও আমি কী করে এমন যন্ত্র তৈরি করলাম। উত্তরে বলব যে, আজকের দিনে আমরা বৈদ্যুতিক শক্তি সম্বন্ধে যতটা জানি, আজ থেকে একশো বছর আগে তার সিকি ভাগও জানা ছিল না, অথচ এই অসম্পূর্ণ জ্ঞান সত্ত্বেও ঊনবিংশ শতাব্দীতে আশ্চর্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রের আবিষ্কার হয়েছিল। ঠিক তেমনি ভাবেই তৈরি হয়েছে আমার রিমেমব্রেন যন্ত্র।

নেচারে লেখাটা বেরোবার ফলে একটা চিঠি পেয়েছি, যেটা আমার ভারী মজার লাগল। আমেরিকার ক্রোড়পতি শিল্পপতি হিরাম হোরেনস্টাইন জানিয়েছেন যে তিনি আত্মজীবনী লিখতে বসে দেখছেন যে তাঁর সাতাশ বছর বয়সের আগের ঘটনাগুলো পরিষ্কার মনে পড়ছে না। আমার যন্ত্র ব্যবহার করে এই সময়কার ঘটনাগুলো মনে করতে পারলে তিনি আমাকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেবেন। শৌখিন মার্কিন মিলিয়নেয়ারদের শখ মেটানোর জন্য আমি এ যন্ত্র তৈরি করিনি—এই কথাটাই তাঁকে আমি একটু নরম ভাষায় লিখে জানিয়ে দিয়েছি।

৪ঠা মার্চ

আজ খবরের কাগজে সুইটজারল্যান্ডের একটা বিশ্রী অ্যাক্সিডেন্টের কথা পড়ে মনটা ভার হবার আধ ঘণ্টার মধ্যেই সে বিষয়ে একটা দীর্ঘ টেলিগ্রাম এসে হাজির। একেই বোধ হয় বলে টেলিপ্যাথি। খবরটা হচ্ছে এই— একটা গাড়িতে দু'জন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক— সুইটজারল্যান্ডের অটো লুবিন ও অস্ট্রিয়ার ডক্টর হিয়েরোনিমাস শেরিং—অস্ট্রিয়ার লান্ডেক শহর থেকে সুইটজারল্যান্ডের ওয়ালেনস্টাট শহরে আসছিলেন। এই দুই বৈজ্ঞানিক কিছু দিন থেকে কোনও একটা গোপনীয় বিষয় নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালাচ্ছিলেন। গাড়িতে সামনে ছিল ড্রাইভার, পিছনে লুবিন আর শেরিং। পাহাড়ের পথ দিয়ে যেতে যেতে গাড়ি খাদে পড়ে। নিকটবর্তী গ্রামের এক মেষপালক চূর্ণবিচূর্ণ গাড়িটিকে দেখতে পায় রাস্তা থেকে হাজার ফুট নীচে। গাড়ির কাছাকাছি ছিল লুবিনের হাড়গোড় ভাঙা মৃতদেহ। আশ্চর্যভাবে বেঁচে গিয়েছিলেন ডক্টর শেরিং। রাস্তা থেকে মাত্র ত্রিশ ফুট নীচে একটি ঝোপে আটকে যায় তাঁর দেহ। দুর্ঘটনার খবর ওয়ালেনস্টাটে পৌঁছানো মাত্র সুইস বায়োকেমিস্ট নরবার্ট বুশ সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন। লুবিন ও শেরিং বুশের কাছেই যাচ্ছিলেন কিছু দিনের বিশ্রামের জন্য। বুশ তাঁর সুপ্রশস্ত মার্সেডিস গাড়িতে শেরিংকে অজ্ঞান অবস্থায় তাঁর বাড়িতে নিয়ে আসেন। এইটুকু খবর কাগজে বেরিয়েছে। বাকিটা জেনেছি বুশের টেলিগ্রামে। এখানে বলে রাখি যে বুশকে আমি চিনি আজ দশ বছর থেকে; ফ্লোরেন্সে এক বিজ্ঞানী সম্মেলনে আমাদের পরিচয় হয়েছিল। বুশ লিখেছে— যদিও শেরিং-এর দেহে প্রায় কোনো জখমের চিহ্ন নেই, তার মাথায় চোট লাগার ফলে তার মন থেকে স্মৃতি জিনিসটাই নাকি বেমালুম লোপ পেয়ে গেছে। আরও একটা খবর এই যে, গাড়ির ড্রাইভার নাকি উধাও এবং সেই সঙ্গে গবেষণার সমস্ত কাগজপত্র। শেরিং-এর স্মৃতি ফিরিয়ে আনার ব্যাপোরে ডাক্তার, মনস্তাত্ত্বিক, হিপ্‌নটিস্ট ইত্যাদির চেষ্টা নাকি

সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। বুশ আমাকে পত্রপাঠ আমার যন্ত্রসমেত ওয়ালেনস্টাট চলে যেতে বলেছে। খরচপত্র সেই দেবে। টেলিগ্রামের শেষে সে বলছে—'ড. শেরিং একজন অসাধারণ গুণী ব্যক্তি। তাঁকে পুনর্জীবন দান করতে পারলে বিজ্ঞানীমহল তোমার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। কী স্থির কর সত্বর জানাও।'

আমার যন্ত্রের দৌড় কত দূর সেটা দেখার এবং দেখাবার এমন সুযোগ আর আসবে না। ওয়ালেনস্টাট যাবার তোড়জোড় আজ থেকেই করতে হবে। আমার যন্ত্র ষোলো আনা পোর্টেবল। এর ওজন মাত্র আট কিলো। প্লেনে অতিরিক্ত ভাড়া দেবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

৮ই মার্চ

আজ সকালে জুরিখে পৌঁছে সেখান থেকে বুশের মোটরে করে মনোরম পাহাড়ি পথ দিয়ে ৬০ কিলোমিটার দূরে ছোট্ট ওয়ালেনস্টাট শহরে এসে পৌঁছোলাম পৌনে নটায়। একটু পরেই প্রাতরাশের ডাক পড়বে। আমি আমার ঘরে বসে এই ফাঁকে ডায়রি লিখে রাখছি। গাছপালা ফুলেফলে ভরা ছবির মতো সুন্দর পরিবেশের মধ্যে চোদ্দো একর জমির উপরে বায়োকেমিস্ট নরবার্ট বুশের বাড়ি। কাঠের সিঁড়ি, কাঠের মেঝে, কাঠের দেয়াল। আমি দোতলায় পশ্চিমের একটা ঘরে রয়েছি, ঘরের জানালা খুললেই পাহাড়ে ঘেরা ওয়ালেন লেক দেখা যায়। আমার যন্ত্রটা একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে খাটের পাশেই একটা টেবিলের উপর রাখা রয়েছে। আতিথেয়তার বিন্দুমাত্র ত্রুটি হবে বলে মনে হয় না। এইমাত্র বুশের তিন বছরের ছেলে উইলি আমাকে এক প্যাকেট চকোলেট দিয়ে গেল। ছেলেটি ভারী মিষ্টি ও মিশুকে— আপন মনে ঘুরে ঘুরে সুর করে ছড়া কেটে বেড়ায়। গাড়ি থেকে নেমে সকলকে অভিবাদন করার কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে আমার দিকে এগিয়ে এসে একটা কালো চুরুটের কেস সামনে ধরে বলল, 'সিগার খাবে?' আমি ধূমপান করি না, কিন্তু উইলিকে নিরাশ করতে ইচ্ছে করল না, তাই ধন্যবাদ দিয়ে একটা চুরুট বার করে নিলাম। খেলে অবিশ্যি এ রকম চুরুটই খেতে হয় ; অতি উৎকৃষ্ট ডাচ সিগার।

এ বাড়িতে সবসুদ্ধ রয়েছে ছ'জন লোক — বুশ, তার স্ত্রী ক্লারা, শ্রীমান উইলি, বুশের বন্ধু স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক অমায়িক স্বল্পভাষী হান্স্ উলরিখ, ড. শেরিং ও তাঁর পরিচারিকা— নাম বোধহয় মারিয়া। এ ছাড়া দু'জন পুলিশের লোক বাড়িটাকে অষ্টপ্রহর পাহারা দিচ্ছে।

শেরিং রয়েছে পুব দিকের একটা ঘরে। আমাদের দু'জনের ঘরের মধ্যে রয়েছে ল্যান্ডিং ও একতলায় যাবার সিঁড়ি। আমি অবিশ্যি এসেই শেরিংকে একবার চাক্ষুষ দেখে এসেছি। মাঝারি হাইটের মানুষ, বয়স পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ, মাথার সোনালি চুলের পিছন দিকে টাক পড়ে গেছে। মুখটা চৌকো ও গোলের মাঝামাঝি। তাকে যখন দেখলাম, তখন সে জানালার ধারের একটা চেয়ারে বসে হাতে একটা কাঠের পুতুল নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখছে। আমি ঘরে ঢুকতে সে আমার দিকে ঘাড় ফেরাল, কিন্তু চেয়ার ছেড়ে উঠল না। বুঝলাম, ঘরে লোক ঢুকলে উঠে দাঁড়ানো সাধারণ সাহেবি কেতাটাও সে ভুলে গেছে। চোখের চাহনি দেখে কী রকম খটকা লাগল। জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি চশমা পর?'

শেরিং-এর বাঁ হাতটা আপনা থেকেই চোখের কাছে উঠে এসে আবার নেমে গেল। বুশ বলল,'চশমাটা ভেঙে গেছে। আর একটা বানাতে দেওয়া হয়েছে।'

শেরিংকে দেখে এসে আমরা বৈঠকখানায় গিয়ে বসলাম। এ কথা সে কথার পর বুশ সলজ্জভাবে বলল, 'সত্যি বলতে কী, আমি যে তোমার যন্ত্রটা সম্বন্ধে খুব উৎসাহিত বোধ করছিলাম, তা নয়। কতকটা আমার স্ত্রীর অনুরোধেই তোমাকে আমি টেলিগ্রামটা করি।'

'তোমার স্ত্রীও কি বৈজ্ঞানিক?' আমি ক্লারার দিকে দৃষ্টি রেখে প্রশ্নটা করলাম। ক্লারাই হেসে উত্তর দিল—

'একেবারেই না। আমি আমার স্বামীর সেক্রেটারির কাজ করি। আমি চাইছিলাম তুমি আস, কারণ ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমার গভীর শ্রদ্ধা। তোমার দেশের বিষয়ে অনেক বই পড়েছি আমি, অনেক কিছু জানি।'

বুশের যদি আমার যন্ত্র সম্বন্ধে কোনো সংশয় থেকে থাকে তো সেটা আজকের মধ্যেই কেটে যাবে বলে আমার বিশ্বাস। আজ বিকেলে শেরিং-এর স্মৃতির বন্ধ দরজা খোলার চেষ্টা হবে।

এবার ড্রাইভারের কথাটা না জিজ্ঞেস করে পারলাম না। বুশ বলল, 'পুলিশ তদন্ত করছে। দুটি জায়গার একটিতে ড্রাইভার লুকিয়ে থাকতে পারে। একটা হলো দুর্ঘটনার জায়গার সাড়ে চার কিলোমিটার পশ্চিমে— নাম রেমুস, আর একটা হলো সাড়ে তিন কিলোমিটার পুবে— নাম শ্লাইন্‌স। দুটো জায়গাতেই অনুসন্ধান চলছে; তা ছাড়া পাহাড়ের গায়ে বনবাদাড়েও খোঁজা হচ্ছে।'

'দুর্ঘটনার জায়গাটা এখান থেকে কত দূরে?'

'পঁচাশি কিলোমিটার। সে ড্রাইভারকে কোথাও না কোথাও আশ্রয় নিতেই হবে, কারণ ও দিকে রাত্রে বরফ পড়ে। ভয় হয়, তার যদি কোনো শাকরেদ থেকে থাকে এবং ড্রাইভার যদি কাগজপত্রগুলো তাকে চালান করে দিয়ে থাকে।'

৮ই মার্চ, রাত সাড়ে দশটা

ফায়ারপ্লেসে গনগনে আগুন জ্বলছে। বাইরে প্রচণ্ড ঠান্ডা বাতাস বইছে। জানালা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও বাতাসের শনশন শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

বুশ আজ আমার বৈজ্ঞানিক প্রতিভার পরিচয় পেয়ে স্তম্ভিত। এখন বলা শক্ত, কে আমার বড়ো ভক্ত—সে, না তার স্ত্রী।

আজ সন্ধ্যা ছ'টায় আমরা আমার যন্ত্র নিয়ে শেরিং-এর ঘরে উপস্থিত হলাম। সে তখনও সেই চেয়ারে গুম হয়ে বসে আছে। আমরা ঘরে ঢুকতে আমাদের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চাইল। বুশ তাকে অভিবাদন জানিয়ে হালকা রসিকতার সুরে বলল, 'আজ আমরা তোমাকে একটা টুপি পরাব, কেমন? তোমার কোনো কষ্ট হবে না। তুমি ওই চেয়ারে যেমনভাবে বসে আছ, সেইভাবেই বসে থাকবে।'

'টুপি? কী রকম টুপি?' শেরিং তার গম্ভীর অথচ সুরেলা গলায় একটু যেন অসোয়াস্তির সঙ্গেই প্রশ্নটা করল।

'এই যে, দেখো না।'

আমি ব্যাগ থেকে যন্ত্রটা বার করলাম। বুশ সেটা আমার হাত থেকে নিয়ে শেরিং-এর হাতে দিল। শেরিং সেটাকে সকালের খেলনাটার মতো করেই নেড়েচেড়ে দেখে আমাকে ফেরত দিয়ে দিল।

'এতে ব্যথা লাগবে না তো? সে দিনের ইঞ্জেকশনে কিন্তু ব্যথা লেগেছিল।'

ব্যথা লাগবে না কথা দেওয়াতে সে যেন খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে শরীরটাকে পিছন দিকে হেলিয়ে দিয়ে হাত দুটোকে চেয়ারের পাশে নামিয়ে দিল। তার ঘাড়ে একটা জায়গায় ক্ষতের উপরে প্লাস্টার ছাড়া শরীরের অনাবৃত অংশে আর কোথাও কোনো ক্ষতচিহ্ন দেখলাম না।

শেরিংকে হেলমেট পরাতে কোনো অসুবিধা হলো না। তারপর লাল বোতামটা টিপতেই হেলমেট-সংলগ্ন ব্যাটারিটা চালু হয়ে গেল। শেরিং একটা কাঁপুনি দিয়ে শরীরটাকে কাঠের মতো শক্ত ও অনড় করে ফায়ারপ্লেসের আগুনের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

ঘরের ভিতরে এখন অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা। এক শেরিং ছাড়া প্রত্যেকেরই দ্রুত নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ পাচ্ছি। ক্লারা দরজার মুখটাতে দাঁড়িয়ে আছে। নার্স খাটের পিছনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে অবাক দৃষ্টিতে শেরিং-এর দিকে চেয়ে আছে। বুশ ও উলরিখ শেরিং-এর চেয়ারের দু'পাশে উৎকণ্ঠায় ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে। আমি বুশকে মৃদু স্বরে বললাম, 'তুমি প্রশ্ন করতে চাও? না আমি করব? তুমি করলেও কাজ হবে কিন্তু।'

'তুমিই শুরু করো।'

আমি ঘরের কোণ থেকে একটা ছোটো টুল নিয়ে শেরিং-এর মুখোমুখি বসলাম। তারপর প্রশ্ন করলাম—

'তোমার নাম কী?'

শেরিং-এর ঠোঁট নড়ল। চাপা অথচ পরিষ্কার গলায় উত্তর এল।

'হিয়েরোনিমাস হাইনরিখ শেরিং।'

'এই প্রথম!'—রুদ্ধ স্বরে বলে উঠল বুশ—'এই প্রথম নিজের নাম বলেছে!'

আমি দ্বিতীয় প্রশ্ন করলাম।

'তোমার পেশা কী?'

'পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক।'

'তোমার জন্ম কোথায়?'

'অস্ট্রিয়া।'

'কোন শহরে?'

'ইন্‌সব্রুক।'

আমি বুশের দিকে একটা জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিলাম। বুশ মাথা নাড়িয়ে বুঝিয়ে দিল—মিলছে। আমি আবার শেরিং-এর দিকে ফিরলাম।

'তোমার বাবার নাম কী?'

'কার্ল ডিট্রিখ শেরিং।'

'তোমার আর ভাইবোন আছে?'

'ছোটো বোন আছে একটি। বড়ো ভাই মারা গেছে।'

'কবে মারা গেছে?'

'প্রথম মহাযুদ্ধে। পয়লা অক্টোবর, উনিশশো সতেরো।'

আমি প্রশ্নের ফাঁকে ফাঁকে বিস্ময়মুগ্ধ বুশের দিকে চেয়ে তার মৃদু মৃদু মাথা নাড়া থেকে বুঝে নিচ্ছি, শেরিং-এর উত্তরগুলো সব মিলে যাচ্ছে।

'তুমি লান্ডেক গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'কী করতে?'

'প্রোফেসর লুবিনের সঙ্গে কাজ ছিল।'

'কী কাজ?'

'গবেষণা।'

'কী বিষয়?'

'বি-এক্স থ্রি সেভন সেভন।'

বুশ ফিসফিস করে জানিয়ে দিল, এটা হচ্ছে গবেষণাটির সাংকেতিক নাম। আমি প্রশ্নে চলে গেলাম।

'সেই গবেষণার কাজ কি শেষ হয়েছিল?'

'হ্যাঁ।'

'সফল হয়েছিল?'

'হ্যাঁ।'

গবেষণার বিষয়টা কী ছিল?'

'আমরা একটা নতুন ধরনের আণবিক মারণাস্ত্র তৈরি করার ফরমুলা বার করেছিলাম।'

'কাজ শেষ করে তোমরা ওয়ালেনস্টাট আসছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার সঙ্গে গবেষণার কাগজপত্র ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'ফরমুলাও ছিল?'

'হ্যাঁ।

'পথে একটা দুর্ঘটনা ঘটে?'

'হ্যাঁ।

'কী হয়েছিল?'

বুশ আমার কাঁধে হাত রাখল। আমি জানি কেন। কিছুক্ষণ থেকেই লক্ষ করছি, শেরিং-এর মধ্যে একটা চাপা উশখুশে ভাব। একবার জিভ দিয়ে ঠোঁটটা চাটল। একবার যেন চোখের পাতা পড়ো পড়ো হলো। কপালের শিরাগুলোও যেন ফুলে উঠেছে।

'আমি...আমি...'

শেরিং-এর কথা বন্ধ হয়ে গেল। তার দ্রুত নিশ্বাস পড়ছে। আমার বিশ্বাস, গোপনীয় গবেষণার বিষয়টা প্রকাশ করে ফেলে ওর মধ্যে একটা উদ্বেগের ভাব জেগে উঠেছে।

আমি সবুজ বোতাম টিপে ব্যাটারি বন্ধ করে দিলাম। এই অবস্থায় আর প্রশ্ন করা উচিত হবে না। বাকিটা কাল হবে।

হেলমেট খুলে নিতেই শেরিং-এর মাথা পিছনে হেলে পড়ল। সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ বন্ধ করে পরমুহূর্তেই আবার চোখ খুলে এদিক ওদিক চেয়ে বলল, 'চুরুট...একটা চুরুট...'

আমি শেরিং-এর কপরালের ঘাম মুছিয়ে দিলাম। বুশ যেন অপ্রস্তুত। গলা খাকরিয়ে বলল, 'চুরুট তো নেই। এ-বাড়িতে কেউ চুরুট খায় না। সিগারেট খাবে?'

উলরিখ তার পকেট থেকে সিগারেট বার করে এগিয়ে দিয়েছে। শেরিং সিগারেট নিল না।

আমি বললাম, 'তোমার কাছে কি তোমার নিজের কোনো চুরুটের বাক্স ছিল?'

‘হ্যাঁ, ছিল!’ বলল শেরিং। সে যেন ক্লান্ত, অস্থির।

‘কালো রঙের কেস কি?’

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ।

‘তা হলে সেটা উইলির কাছে আছে। ক্লারা, একবার খোঁজ করে দেখবে কি?’

ক্লারা তৎক্ষণাৎ তার ছেলের খোঁজে বেরিয়ে গেল।

নার্স শেরিং-এর হাত ধরে তুলে, তাকে খাটে শুইয়ে দিল। বুশ খাটের দিকে এগিয়ে গিয়ে হেসে বলল, ‘এবার তোমার মনে পড়েছে তো?’

উত্তরে শেরিং যেন অবাক হয়ে বুশের দিকে চাইল। তারপর ধীর কণ্ঠে বলল, ‘কী মনে পড়েছে?’

শেরিং-এর পালটা প্রশ্ন আমার মোটেই ভালো লাগল না। বুশও যেন হতভম্ব। সে নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে সহজভাবেই বলল,‘তুমি কিন্তু আমাদের প্রশ্নের জবাব ঠিকই দিয়েছ।’

‘কী প্রশ্ন? কী প্রশ্ন করেছ আমাকে?’

এবার আমি গত কয়েক মিনিট ধরে যে প্রশ্নোত্তর চলেছে, তার একটা বিবরণ শেরিংকে দিলাম। শেরিং কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর তার ডান হাতটা আলতো করে নিজের মাথার উপর রেখে আমার দিকে ফিরে বলল, ‘আমার মাথায় কী পরিয়েছিলে?’

‘কেন বলো তো?’

‘যন্ত্রণা হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন অজস্র পিন ফুটছে।’

‘তোমার মাথায় এমনিতেই চোট লেগেছিল। পাহাড়ের গা দিয়ে গড়িয়ে পড়ার সময় তুমি মাথায় চোট পাও, তার ফলে তোমার পূর্বস্মৃতি লোপ পায়।’

শেরিং বোকার মতো আমার দিকে চেয়ে বলল, ‘কী সব বলছ তুমি। পাহাড় দিয়ে গড়িয়ে পড়ব কেন?’

আমরা তিনজন পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম।

ক্লারা ফিরে এসেছে। তার হাতে আমার দেখা চুরুটের কেস। সে সেটা শেরিং-এর হাতে দিয়ে বিনীতভাবে বলল, ‘আমার ছেলে কখন যেন এটা নিয়ে নিজের ঘরে রেখে দিয়েছিল। তুমি কিছু মনে কোরো না।’

বুশ আবার গলা খাকরিয়ে বলল, ‘তুমি যে চুরুট খাও সে কথাটা মনে পড়েছে নিশ্চয়ই?’

চুরুটের কেস হাতে নিয়ে শেরিং-এর চোখ বুজে এল। তাকে সত্যিই ক্লান্ত মনে হচ্ছে।
আমরা বুঝতে পারছিলাম, আমাদের এবার এঘর থেকে চলে যেতে হবে।

রিমমব্রেন যন্ত্র ব্যাগে পুরে নিয়ে আমরা চারজন এসে বৈঠকখানায় বসলাম। খুশি ও খটকা মেশানো অদ্ভুত একটা অবস্থা আমার মনের। হেলমেটপরা অবস্থায় হারানো স্মৃতি ফিরে এলে হেলমেট খোলার পর সে স্মৃতি আবার হারিয়ে যাবে কেন? শেরিং-এর মাথায় কি তা হলে খুব বেশিরকম কোনো গণ্ডগোল হয়েছে?

এদের তিনজনকে কিন্তু ততটা হতাশ মনে হচ্ছে না।

উলরিখ তো যন্ত্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বলল, ‘এটা যে একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যেখানে স্মৃতির ভাণ্ডার একেবারে খালি হয়ে গিয়েছিল, সেখানে পর পর এতগুলো প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দেওয়া কি সহজ কথা?’

বুশ বলল, 'আসলে মনের দরজা এমনভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল যে সেটা খুলেও খুলছে না। এখন একমাত্র কাজ হচ্ছে কালকের জন্য অপেক্ষা করা। কাল আবার ওকে টুপি পরাতে হবে। আমাদের দিক থেকে কাজটা হবে শুধু প্রশ্নের উত্তর আদায় করা। অ্যাক্সিডেন্টের আগে গাড়িতে কী ঘটেছিল সেটা জানা দরকার। বাকি কাজ করবে পুলিশে।'

আটটা নাগাদ বুশ একবার পুলিশে টেলিফোন করে খবর দিল। ড্রাইভার হাইন্‌ৎস নয়মানের কোনো পাত্তা এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তা হলে কি বি-এক্স থ্রি সেভন সেভনের ফরমুলা সমেত নয়মানের তুষারসমাধি হলো।

৯ই মার্চ

কাল রাত্রে দুটো পর্যন্ত ঘুম আসছে না দেখে শেষটায় আমারই তৈরি সম্‌নোলিনের বড়ি খেয়ে একটানা সাড়ে তিন ঘণ্টা গাঢ় ঘুম হলো। আজ সকালে উঠেই আমার যন্ত্রটা একটু নেড়েচেড়ে তাতে কোনো গণ্ডগোল হয়েছে কি না দেখব ভেবেছিলাম, কিন্তু সে কাজটা করার আগেই দরজায় টোকা পড়ল। খুলে দেখি শেরিং-এর নার্স। ভদ্রমহিলা রীতিমতো উত্তেজিত।

'ড. শেরিং তোমাকে ডাকছেন। বিশেষ দরকার।'

'কেমন আছেন তিনি?'

'খুব ভালো। রাত্রে ভালো ঘুমিয়েছিলেন। মাথার যন্ত্রণাটাও নেই। একেবারে অন্য মানুষ।'

আমি আলখাল্লা পরা অবস্থাতেই শেরিং-এর ঘরে গিয়ে হাজির হলাম। সে আমাকে দেখে একগাল হেসে ইংরিজিতে 'গুড মর্নিং' বলল। জিজ্ঞেস করলাম, 'কেমন আছ?'

'সম্পূর্ণ সুস্থ। আমার সমস্ত স্মৃতি ফিরে এসেছে। আশ্চর্য যন্ত্র তোমার। শুধু একটা কথা। কাল তোমার প্রশ্নের উত্তরে আমি আমাদের গবেষণা সম্পর্কে যা বলেছি, সেটা তোমাদের গোপন রাখতে হবে।'

'সে আর তোমাকে বলতে হবে না। আমাদের দায়িত্বজ্ঞান সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।'

'আরেকটা কথা। লুবিনের কী হলো জানার আগেই আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। আমি জানতে চাই সে কোথায়। সেও কি জখম হয়ে পড়ে আছে?'

'না। লুবিন মারা গেছে।'

'মারা গেছে!'

শেরিং-এর চোখ কপালে উঠে গেল। আমি বললাম, 'তুমি যে বেঁচেছ, সেটাও নেহাতই কপাল জোরে।'

'আর কাগজপত্র?' শেরিং ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করল।

'কিছুই পাওয়া যায়নি। প্রধান দুশ্চিন্তার কারণ হচ্ছে কাগজপত্রের সঙ্গে ড্রাইভারও উধাও। এ ব্যাপারে তুমি কোনো আলোকপাত করতে পার কি?'

শেরিং ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বলল, 'তা পারি বই কী।'

আমি চেয়ারটা তার খাটের কাছে এগিয়ে নিয়ে বসলাম। এ বাড়ির লোকজনের বোধ হয় এখনও ঘুম ভাঙেনি। তা হোক; সুযোগ যখন এসেছে, তখন কথা চালিয়ে যাওয়াই উচিত। বললাম, 'বলো তো দেখি, আসল ঘটনাটা কী।'

শেরিং বলল, 'আমরা লান্ডেক শহর থেকে রওনা হয়ে ফিন্‌স্টেরমুন্‌ৎসে সীমানা পেরিয়ে সুইটজারল্যান্ডে প্রবেশ করে কয়েক কিলোমিটার যেতেই এসে পড়ল শ্লাইন্‌স নামে একটা ছোট্ট শহর। সেখানে গাড়ি মিনিট পনেরোর জন্য থামে। আমরা একটা দোকানে বসে বিয়ার খেয়ে আবার রওনা দেবার দশ মিনিটের মধ্যেই গাড়িতে কী যেন গণ্ডগোল হওয়ায় ড্রাইভার নয়মান

গাড়ি থামায়। তারপর নেমে গিয়ে সে বনেট খুলে কী যেন দেখে লুবিনকে ডাক দেয়। লুবিন নেমে নয়মানের দিকে এগিয়ে যেতেই নয়মান তাকে একটা রেঞ্জ দিয়ে মাথায় বাড়ি মেরে অজ্ঞান করে। স্বভাবতই আমিও তখন নামি। কিন্তু নয়মান শক্তিশালী লোক। ধস্তাধস্তিতে আমি হেরে যাই, সে আমারও মাথায় রেঞ্জের বাড়ি মেরে আমায় অজ্ঞান করে। তারপর আর কিছুই মনে নেই।'

আমি বললাম, 'পরের অংশ তো সহজেই অনুমান করা যায়। নয়মান তোমাদের দুজনকে গাড়িতে তুলে গাড়ি ঠেলে খাদে ফেলে দিয়ে গবেষণার কাগজপত্র নিয়ে পালায়।'

টেলিফোন বাজার একটা আওয়াজ কিছুক্ষণ আগেই শুনেছিলাম, এখন শুনলাম কাঠের মেঝের উপর দ্রুত পা ফেলার শব্দ। বুশ দৌড়ে ঘরে ঢুকল। তার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে।

'অ্যাক্সিডেন্টের জায়গায় খাদের মধ্যে কিছু কাগজ পাওয়া গেছে। লেখা প্রায় মুছে গেছে, কিন্তু সেটা কী কাগজ, তা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না।'

‘তা হলে ফরমুলা হারায়নি?’ শেরিং চেঁচিয়ে উঠল।

শেরিং-এর মুখে এ প্রশ্ন শুনে বুশ রীতিমতো ভ্যাবাচ্যাকা। আমি তাকে সকালের ব্যাপারটা বলে দিলাম। বুশ বলল, ‘তার মানে বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না।’

‘তা হলে ফরমুলা হারায়নি?’ শেরিং চেঁচিয়ে উঠল।

শেরিং-এর মুখে এ প্রশ্ন শুনে বুশ রীতিমতো ভ্যাবাচ্যাকা। আমি তাকে সকালের ব্যাপারটা বলে দিলাম। বুশ বলল, ‘তার মানে বুঝতে পারছ তো?—নয়মান হয়তো ফরমুলা নেয়নি। শুধু টাকাকড়ি বা অন্য কিছু দামি জিনিস নিয়ে পালিয়েছে।’

‘সেটা কী করে বলছ তোমরা’, শেরিং ব্যাকুল ভাবে বলে উঠল—‘গবেষণা সংক্রান্ত কাগজ ছাড়া অন্য অদরকারি কাগজও তো ছিল আমাদের সঙ্গে। খাদে যে কাগজ পাওয়া গেছে, তার সঙ্গে তো গবেষণার কোনো সম্পর্ক নাও থাকতে পারে।’

শেরিং ঠিকই বলেছে। কতগুলো লেখা ধুয়ে যাওয়া কাগজ থেকে এটা মোটেই প্রমাণ হয় না যে নয়মান ফরমুলা নেয়নি। যাই হোক, আমি আর বুশ স্থির করলাম যে, উলরিখকে শেরিং-এর সঙ্গে রেখে আমরা দু’জন ব্রেকফাস্ট সেরেই চলে যাব অ্যাক্সিডেন্টের জায়গায়। আরও কিছু কাগজ পাওয়া যেতে পারে, এবং তার মধ্যে ফরমুলাটাও থাকতে পারে, এমন একটা ক্ষীণ আশা জেগেছে আমাদের মনে। রেমুস আর শ্লাইন্সের মধ্যবর্তী অ্যাক্সিডেন্টের জায়গাটা এখান থেকে পঁচাশি কিলোমিটার। খুব বেশি জরুরি কাজ হচ্ছে কাগজ খোঁজা। লেখা ধুয়ে মুছে গেলে ক্ষতি নেই। সে লেখা পাঠোদ্ধার করার মতো রাসায়নিক কায়দা আমার জানা আছে।

এখন সকাল সাড়ে আটটা। আমরা আর মিনিট দশেকের মধ্যেই বেরিয়ে পড়ব। কেন জানি না কিছুক্ষণ থেকে আমার মনটা মাঝে মাঝে খচ খচ করে উঠছে। কোথায় যেন ব্যাপারটার মধ্যে একটা অসঙ্গতি রয়েছে। কিন্তু সেটা যে কী, সেটা বুঝতে পারছি না।

কেবল একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত। আমার যন্ত্রে কোনো গণ্ডগোল নেই।

১০ই মার্চ, রাত ১২টা

একটা বিভীষিকাময় দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এলাম। ঘোর এখনও পুরোপুরি কাটেনি, কাটবে সেই গিরিডিতে আমার স্বাভাবিক পরিবেশে ফিরে গিয়ে। এমন ছবির মতো সুন্দর দেশে এমন একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে যাবে তা ভাবতে পারিনি।

গতকাল সকালে আমাদের প্ল্যান অনুযায়ী আমি, বুশ আর সুইস পুলিশের হান্স্ বার্গার যখন দুর্ঘটনার জায়গায় রওনা হলাম, তখন আমার ঘড়িতে পৌনে ন’টা। রাস্তার এখানে সেখানে বরফ জমে আছে, চারিদিকে পাহাড়ের গায়ে আর চুড়োয় বরফ। গাড়ির কাচ তোলা থাকলেও গাছপালার অস্থির ভাব দেখে বুঝতে পারছিলাম বেশ জোরে হাওয়া বইছে। বুশই গাড়ি চালাচ্ছে, তার পাশে আমি, পিছনের সিটে বার্গার।

গন্তব্যস্থলে পৌঁছোতে লাগল এক ঘণ্টা দশ মিনিট। রেমুসে একবার মিনিট তিনেকের জন্য থেমেছিলাম। সেখনে পুলিশের লোক ছিল, তার সঙ্গে কথা বলে জানলাম নয়মানের কোনো খবর এখনও পাওয়া যায়নি। অনুসন্ধান পুরোদমেই চলেছে, এমনকী নয়মানকে ধরিয়ে দেবার জন্য পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।

অ্যাক্সিডেন্টের জায়গার প্রাকৃতিক দৃশ্য আশ্চর্য সুন্দর। রাস্তার পাশ দিয়ে খাদ নেমে গেছে সাড়ে তিন হাজার ফুট। নীচের দিকে চাইলে একটা সরু নদী দেখতে পাওয়া যায়। মনে মনে বললাম, কাগজপত্র যদি ওই নদীর জলে ভেসে গিয়ে থাকে, তা হলে আর উদ্ধারের কোনো আশা নেই। রাস্তাটা এখানে এত চওড়া যে জোর করে ঠেলে না ফেললে, বা ড্রাইভারের হঠাৎ মাথা বিগড়ে না গেলে, গাড়ি খাদে পড়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। পাহাড়ের গায়ে পুলিশের লোক দেখতে পেলাম, রাস্তার ওপরেও কিছু জিপ ও গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। বুঝলাম, খানাতল্লাশির কাজে কোনো ত্রুটি হচ্ছে না। আমরাও দুজনে পাহাড়ের গা দিয়ে নীচের দিকে নামতে শুরু করলাম।

পায়েহাঁটা পথ রয়েছে, ঢালও তেমন সাংঘাতিক কিছু নয়। দূর থেকে সুরেলা ঘণ্টার শব্দ পাচ্ছি; বোধ হয় গোরু চরছে। সুইস গোরুর গলায় বড়ো বড়ো ঘণ্টা বাঁধা থাকে। তার শব্দ সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশকে আরও মনোরম করে তোলে।

গাড়ি যেখানে পড়েছিল, আর লুবিনের মৃতদেহ যেখানে পাওয়া গিয়েছিল, এই দুটো জায়গা আগে দেখা দরকার। এ দিকে ও দিকে বরফের শুভ্র কার্পেট বিছানো রয়েছে, মাঝে মাঝে ঝাউ, বিচ আর অ্যাশ গাছের ডাল থেকে ঝুপ ঝুপ করে বরফ মাটিতে খসে পড়ছে।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট খুঁজেও এক টুকরো কাগজও পেলাম না। কিন্তু গাড়ির জায়গা থেকে আরও প্রায় পাঁচশো ফুট নেমে গিয়ে যে জিনিসটা আবিষ্কার করলাম, সেটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত।

আবিষ্কারটা আমারই। সবাই মাটিতে খুঁজছে কাগজের টুকরো; আমার দৃষ্টি কিন্তু গাছে ডালপাতা ফোকর ইত্যাদিও বাদ দিচ্ছে না। একটা ঘন পাতাওয়ালা ওক গাছের নীচে এসে দৃষ্টি উপরে তুলতেই পাতার ফাঁক দিয়ে একটা ছোট্ট সাদা জিনিস চোখে পড়ল যেটা কাগজও নয় বরফও নয়। আমার দৃষ্টি যে কোনো পুলিশের দৃষ্টির চেয়ে অন্তত দশ গুণ বেশি তীক্ষ্ণ। দেখেই বুঝলাম ওটা একটা কাপড়ের অংশ। বার্গারকে ইশারা করে কাছে ডেকে গাছের দিকে আঙুল দেখালাম। সে সেটা দেখামাত্র আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ডাল বেয়ে উপরে উঠে গেল। মিনিটখানেকের মধ্যে তার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সে চেঁচিয়ে উঠেছে তার মাতৃভাষা জার্মানে—

'ডা ইস্ট আইনে লাইখে!'

অর্থাৎ— এ যে দেখছি একটা মৃতদেহ!

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই মৃতদেহ নীচে নেমে এল। বরফের দেশ বলেই মৃত্যুর এত দিন পরেও দেহ প্রায় অবিকৃত রয়েছে। বুঝতে অসুবিধা হল না যে এ হলো ড্রাইভার হাইন্‌ৎস নয়মানের মৃতদেহ। তার কোটের পকেটে রয়েছে তার গাড়ির লাইসেন্স ও তার ব্যক্তিগত আইডেন্টিটি কার্ড। নয়মানেরও হাড়গোড় ভেঙেছে, হাতেমুখে ক্ষতচিহ্ন রয়েছে। সেও যে গাড়ি থেকে ছিটকে বেরিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে এসে এই ওক গাছের ডালপালার ভিতরে এত দিন মরে পড়েছিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

তা হলে কি নয়মান লুবিন ও শেরিংকে অজ্ঞান করে গাড়িতে তুলে গাড়ি ঠেলে খাদে ফেলার সময় নিজেই পা হড়কে পড়ে গিয়েছিল? নাকি অন্য কোনো অচেনা লোক এসে তার এই দশা করেছে? যাই হোক না কেন, নয়মানকে খোঁজার জন্য পুলিশকে আর মেহনত করতে হবে না।

এটাও বলে রাখি যে নয়মানের জামার পকেটে গবেষণা সংক্রান্ত কোনো কাগজ পাওয়া যায়নি। সে কাগজ যদি খাদের মধ্যে পাওয়া যায় তো ভালো, না হলে বি-এক্স তিনশো সাতাত্তরের মামলা এখানেই শেষ...

* * *

আমরা এগারোটার সময় ওয়ালেনস্টার্ট রওনা দিলাম। আমাদের দুজনেরই দেহমন অবসন্ন। সেটা কিছুটা পাহাড়ে ওঠা নামার পরিশ্রমের জন্য, কিছুটা দুর্ঘটনার কথা মনে করে। সেই সঙ্গে কাল রাত্রের মতো আজও কী কারণে যেন আমার মনের ভিতরটা খচ খচ করছে। কী একটা জিনিস, বা জিনিসের অভাব লক্ষ করে মুহূর্তের জন্য আমার মনে একটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, যেটা আমার স্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। সঙ্গে রিমেমব্রেন যন্ত্রটা আছে— ওটা হাতছাড়া করতে মন চায় না— একবার মনে হল যন্ত্রটা পরে বুশকে দিয়ে প্রশ্ন করিয়ে দেখি কী হয়, কিন্তু তারপরেই খেয়াল হলো, কী ধরনের প্রশ্ন করলে স্মৃতিটা ফিরে আসবে, সেটাও আমার জানা নেই। অগত্যা চিন্তাটা মন থেকে মুছে ফেলে দিতে হলো।

বাড়ি পৌঁছানোর কিছু আগে থেকেই মেঘ করেছিল, গাড়ি গেটের সামনে থামার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঝির ঝির করে বৃষ্টি শুরু হলো।

শেরিং নয়মানের মৃতদেহ আবিষ্কারের কথা শুনে আমাদেরই মতো হতভম্ব হয়ে গেল। বলল, 'দুটি লোকের মৃত্যু, আর তার সঙ্গে সাত বছরের পরিশ্রম পণ্ড।' তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,'এক হিসেবে ভালোই হয়েছে।'

আমরা একটু অবাক হয়েই শেরিং-এর দিকে চাইলাম। তার দৃষ্টিতে একটা উদাস ভাব দেখা দিয়েছে। সে বলল, 'মারণাস্ত্র

নিয়ে গবেষণা করার ইচ্ছে আমার ছিল না। লুবিনই প্রথমে করে প্রস্তাবটা। আমি গোড়ায় আপত্তি করলেও, পরে নিজের অজান্তেই যেন জড়িয়ে পড়ি, কারণ লুবিন ছিল কলেজজীবন থেকে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

শেরিং একটু থেমে আমার দিকে ফিরে মৃদু হেসে বলল, 'এই যন্ত্রের প্রেরণা কোত্থেকে এসেছিল জান? তুমি ভারতীয়, তাই তোমাকেই বিশেষ করে বলছি। লুবিন সংস্কৃত জানত। বার্লিনের একটি সংগ্রহশালায় রাখা একটি আশ্চর্য সংস্কৃত পুঁথি লুবিন পড়েছিল কিছুকাল আগে। এই পুঁথির নাম সমরাঙ্গনসূত্রম। এতে যে কত রকম যুদ্ধাস্ত্রের বর্ণনা আছে, তার হিসেব নেই। সেই পুঁথি পড়েই লুবিনের মাথায় এই অস্ত্রের পরিকল্পনা আসে। ... যাক গে, যা হয়েছে তাতে হয়তো আখেরে মঙ্গলই হবে।'

আমি সমরাঙ্গনসূত্রের নাম শুনেছি, কিন্তু সেটা পড়ার সৌভাগ্য হয়নি। অবিশ্যি ভারতীয়রা যে মারণাস্ত্র নিয়ে এককালে বিশেষভাবে চিন্তা করেছে, সেটা তো মহাভারত পড়লেই বোঝা যায়।

শেরিংকে আর এখানে ধরে রাখার কোনো মানে হয় না। আমরা যখন বেরিয়েছিলাম, সেই সময় সে নাকি আল্টডর্ফ শহরে তার এক বন্ধুকে ফোন করে বলেছে তাকে যেন এসে নিয়ে যায়। আল্টডফ্ এখান থেকে পশ্চিমে পঁচাত্তর কিলোমিটার দূরে। শেরিং-এর বন্ধু বলেছে বিকেলের দিকে আসবে।

সারা দুপুর আমরা চারজন পুরুষ ও একজন মহিলা বৈঠকখানায় বসে গল্পগুজব করলাম। সাড়ে তিনটের সময় একটা হাল ফ্যাশানের লাল মোটরগাড়ি এসে আমাদের বাড়ির সামনে দাঁড়াল। তার থেকে নামলেন একটি বছর চল্লিশেকের স্বাস্থ্যবান পুরুষ, লম্বায় ছ' ফুটের ওপর, পরনে চামড়ার জার্কিন ও কর্ডের প্যান্ট। রোদেপোড়া চেহারা দেখে আন্দাজ করেছিলাম, পরে শুনলাম সত্যিই এঁর পাহাড়ে ওঠার খুব শখ, সুইটজারল্যান্ডের উচ্চতম তুষারশৃঙ্গ মন্টে রোজায় চড়েছেল বারপাঁচেক— যদিও পেশা হলো ওকালতি। বলা বাহুল্য ইনিই শেরিং-এর বন্ধু, নাম পিটার ফ্রিক্। শেরিং আমাদের সকলের কাছে বিদায় নিয়ে আর একবার আমার যন্ত্রটার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে আল্টডর্ফের দিকে রওনা দিয়ে দিল।

সে যাবার মিনিট দশেক পরে—সবেমাত্র ক্লারা সকলের জন্য লেমন টি ও কেক এনে টেবিলে রেখেছে— এমন সময় হঠাৎ ভেলকির মতো আমার মনের সেই অসোয়াস্তির কারণটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠল, আর হওয়ামাত্র আমি সবাইকে চমকে দিয়ে তড়াক করে সোফা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বুশের দিকে ফিরে বললাম,'এক্ষুনি চলো। আল্টডর্ফ যেতে হবে।'

'তার মানে?' উলরিখ আর বুশ একসঙ্গে বলে উঠল।

'মানে পরে হবে। আর এক মুহূর্ত সময় নেই!'

আমার এই বয়সে এই তৎপরতা দেখেই বোধহয় বুশ ও উলরিখ তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ল।

সিঁড়ি দিয়ে একসঙ্গে তিনটে করে ধাপ উঠতে উঠতে বুশকে বললাম,'তোমার সঙ্গে অস্ত্র আছে? আমারটা আনিনি।'

'একটা লুগার অটোম্যাটিক আছে।'

'ওটা নিয়ে নাও। আর পুলিশের লোকটি থাকলে তাকেও বলে দাও সঙ্গে আসতে। আর আল্টডর্ফেও জানিয়ে দাও—সে দিকেও যেন পুলিশ তৈরি থাকে।'

আমরা যন্ত্রটাকে ঘর থেকে নিয়ে আমরা চারজন পুরুষ বুশের গাড়িতে উঠে ঝড়ের বেগে ছুটলাম আল্টডর্ফের উদ্দেশে। বুশ মোটর চালনায় সিদ্ধহস্ত— স্টিয়ারিং ধরে এক মিনিটের মধ্যে একশো কুড়ি কিলোমিটার স্পিড তুলে দিল। এ দেশে যারা গাড়ির সামনের সিটে বসে, তাদের প্লেনযাত্রীর মতো কোমরে বেল্ট বেঁধে নিতে হয়। এ গাড়িটা তো এমনভাবে তৈরি যে বেল্ট না বাঁধলে গাড়ি চলেই না। শুধু তাই না— গাড়িতে যদি আচমকা ব্রেক কষা হয়,তা হলে তৎক্ষণাৎ ড্যাশবোর্ডের দুটো খুপরি থেকে দুটো নরম তুলোর মতো জিনিস লাফিয়ে বেরিয়ে এসে চালক ও যাত্রীকে হুমড়ি খেয়ে নাকমুখ থ্যাঁতলানোর হাত থেকে বাঁচিয়ে দেয়।

আমাদের অবিশ্যি আচমকা ব্রেক কষার প্রয়োজন হয়নি। ত্রিশ কিলোমিটারের ফলক পেরোবার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আমরা শেরিং-এর লাল গাড়ি দেখতে পেলাম। তার চলার মেজাজে চালকের নিরুদ্বেগ ভাবটা স্পষ্ট। আমি বললাম, 'ওটাকে পেরিয়ে গিয়ে থামো।'

বুশ হর্ন দিতে দিতে লাল গাড়িটাকে পাশ কাটিয়ে খানিক দূর গিয়ে হাত দেখিয়ে গাড়িটাকে রাস্তার মাঝখানে ট্যারচা ভাবে দাঁড় করিয়ে দিল। ফলে শেরিং-এর গাড়ি বাধ্য হয়েই থেমে গেল।

আমরা চারজন গাড়ি থেকে নামলাম। শেরিং আর তার বন্ধুও নেমে অবাক মুখ করে আমাদের দিকে এগিয়ে এল।

'কী ব্যাপার?' শেরিং প্রশ্ন করল।

পথে আসার সময় আমাদের চারজনের মধ্যে কোনো কথা হয়নি। হয়তো আমার গম্ভীরভাব দেখেই অন্য তিনজন সাহস করে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারেনি। কাজেই আমরা কেন যে এই অভিয়ানে বেরিয়েছি, সেটা একমাত্র আমিই জানি, আর তাই কথাও বলতে হবে আমাকেই।

আমি এগিয়ে গেলাম। শেরিং যতই স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করুক না কেন, তার ঠোঁটের ফ্যাকাশে শুকনো ভাবটা সে গোপন করতে পারছে না। তার তিন হাত পিছনে দাঁড়িয়ে আছে তার বন্ধু পিটার ফ্রিক্।

'একটা চুরুট খেতে ইচ্ছে করল,' আমি শান্তভাবে বললাম, 'কাল তোমার ডাচ চুরুট পান করে আমার নেশা হয়ে গেছে। আছে তো চুরুটের কেসটা?'

আমার এই সহজভাবে বলা সামান্য কয়েকটা কথায় যেন ডিনামাইটে অগ্নি সংযোগ হলো। শেরিং-এর বন্ধুর হাতে মুহূর্তের মধ্যে চলে এল একটা রিভলভার, আর সেই মুহূর্তেই সেটা গর্জিয়ে উঠল। আমি অনুভব করলাম আমার ডান কনুই ঘেঁষে গুলিটা গিয়ে লাগল বুশের মার্সেডিস গাড়ির ছাতের একটা কোণে। কিন্তু সে রিভলভার আর এখন পিটার ফ্রিকের হাতে নেই, কারণ দ্বিতীয় আর একটা আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রিকের রিভলভারটা ছিটকে গিয়ে রাস্তায় পড়েছে, আর ফ্রিক্ তার বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের কবজিটা চেপে মুখ বিকৃত করে হাঁটু গেড়ে রাস্তায় বসে পড়েছে।

আর শেরিং? সে একটা অমানুষিক চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে ঊর্ধ্বশ্বাসে উলটোমুখে দৌড় লাগাতেই বুশ ও উলরিখ তিরবেগে ছুটে গিয়ে বাঘের মতো লাফিয়ে তাকে বগলদাবা করে ফেলল। আর আমি— জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু—আমার অদ্বিতীয় আবিষ্কার রিমেমব্রেন যন্ত্রটি শেরিং-এর মাথায় পরিয়ে বোতাম টিপে ব্যাটারি চালু করে দিলাম।

শেরিং দুজনের হাতে বন্দি হয়ে সেইভাবেই দাঁড়িয়ে রইল, তার নিষ্পলক দৃষ্টি দেখে মনে হয়, সে দূরে তুষারাবৃত পাহাড়ের দিকে চেয়ে ধ্যান করছে।

এবার আমার খেলা।

আমি প্রশ্ন করলাম শেরিং-কে উদ্দেশ্য করে।

'ডক্টর লুবিন কীভাবে মরলেন?'

'দম আটকে।'

'তুমি মেরেছিলে তাকে?'

'হ্যাঁ।'

'কীভাবে?'

'টুঁটি টিপে।'

'তখন গাড়ি চলছিল?'

'হ্যাঁ।'

'ড্রাইভার নয়মান কীভাবে মরল?'

'নয়মানের সামনে আয়না ছিল। আয়নায় সে লুবিনের হত্যাদৃশ্য দেখে। সেই সময় তার স্টিয়ারিং ঘুরে যায়। গাড়ি খাদে পড়ে।'

'তার সঙ্গে তুমিও পড়?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি কি ভেবেছিলে লুবিন ও নয়মানকে খুন করে তাদের খাদে ফেলে দেবে?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর ফরমুলা নিয়ে পালাবে?'

'হ্যাঁ।'

'কী করতে তুমি ওটা দিয়ে?'

'বিক্রি করতাম।'

'কাকে?'

'যে বেশি দাম দেবে তাকে।'

'ফরমুলার কাগজ কি তোমার কাছে আছে?'

'না।'

'তবে কী আছে?'

'টেপ।'

'তাতে ফরমুলা রেকর্ড করা আছে?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় আছে সে টেপ?'

'চুরুটের কেসে।'

'ওটা কি আসলে একটা টেপ রেকর্ডার?'

'হ্যাঁ।'

আমি শেরিং-এর মাথা থেকে হেলমেট খুলে নিলাম। পুলিশের লোকটি ভিজে রাস্তার উপর জুতোর শব্দ তুলে শেরিং-এর দিকে এগিয়ে গেল।

* * *

এখন মনে হচ্ছে কী আশ্চর্য এই মস্তিষ্ক জিনিসটা, আর কী অদ্ভুত এই স্মৃতির খেলা। কাল শেরিং চুরুট চাইল, ক্লারা তাকে কেসটা এনে দিল, কিন্তু সে চুরুট খেল না। তখনই ব্যাপারটা পুরোপুরি আঁচ করা উচিত ছিল, কিন্তু করিনি। আজ সকালেও তার ঘরে চুরুটের কোনো গন্ধ বা কোনো চিহ্ন দেখিনি। চুরুটের কেসটা নিয়মিত খাটের পাশের টেবিলে থাকা উচিত ছিল, কিন্তু তা ছিল না। আজ দুপুরে এতক্ষণ বসে গল্প করলাম, কিন্তু তাও শেরিং চুরুট খেল না।

গান মেটালের তৈরি কেসটা এখন আমার ঘরে আমার টেবিলের উপর রাখা রয়েছে। এর ঢাকনাটা খুললে বেরোয় চুরুট, আর নীচের দিকে একটা প্রায়-অদৃশ্য বোতাম টিপলে তলাটা খুলে গিয়ে বেরোয় মাইক্রোফোন সমেত একটা খুদে টেপ রেকর্ডার। টেপটা চালিয়ে দেখেছি, তাতে বি-এক্স তিনশো সাতাত্তরের সব তথ্যই রেকর্ড করা আছে শেরিং-এর নিজের গলায়। এরই উপর যদি অন্য কিছু রেকর্ড করা যায়, তা হলে শেরিং-এর এই অপদার্থ ফরমুলাটা চিরকালের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

উইলির গলা না? সে আবার সুর করে ছড়া কাটছে।

মাইক্রোফোনটা বার করে রেকর্ডারটা চালিয়ে দিলাম।

আনন্দমেলা। পূজাবার্ষিকী ১৩৮১

মহাকাশের দূত

২২শে অক্টোবর

ব্রেন্টউড, ১৫ই অক্টোবর

প্রিয় শঙ্কু,

মনে হচ্ছে আমার বারো বছরের পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফল পেতে চলেছি। খবরটা এখনও প্রচার করার সময় আসেনি, শুধু তোমাকেই জানাচ্ছি।

কাল রাত একটা সাঁইত্রিশে এপসাইলন ইন্ডি নক্ষত্রপুঞ্জের কোনো একটা অংশ থেকে আমার সংকেতের উত্তর পেয়েছি। মৌলিক সংখ্যার সংকেতের উত্তর মৌলিক সংখ্যাতেই এসেছে; সুতরাং এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে ছায়াপথের ওই অংশে কোনো একটি গ্রহ বা উপগ্রহে এমন প্রাণী আছে যারা আমাদের গণিতের ভাষা বোঝে এবং যারা পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে যোগস্থাপন করতে সক্ষম ও ইচ্ছুক।

তবে আশ্চর্য এই যে, পৃথিবী থেকে এই বিশেষ নক্ষত্রমণ্ডলের যে দূরত্ব তাতে বেতার তরঙ্গে সংকেত পৌঁছাতে লাগা উচিত দশ বছর। আমি প্রথম সংকেত পাঠাই আজ থেকে বারো বছর আগে; নিয়মমতো উত্তর আসতে লাগা উচিত ছিল আরো আট বছর। সেখানে মাত্র দু-বছর লাগল কেন? তা হলে কি এই প্রাণী বেতারতরঙ্গের গতির চেয়েও অনেক বেশি দ্রুতগতিতে সংকেত পাঠানোর উপায় আবিষ্কার করেছে? এরা কি তা হলে মানুষের চেয়েও অনেক বেশি উন্নত?

যাই হোক, এই নিয়ে এখন আর মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। তোমাকে খবরটা দিলাম কারণ আমার মতো তোমারও নিশ্চয়ই মিশরের প্যাপাইরাসের দৈববাণীর কথাটা মনে পড়ছে।

আশা করি ভালো আছ। নতুন খবর পেলেই তোমাকে জানাব। শুভেচ্ছা নিও।

ফ্রানসিস

ইংলন্ডের বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ফ্রানসিস ফিল্ডিং হলো আমার বাইশ বছরের বন্ধু। অন্য গ্রহে প্রাণী আছে কি না, বহু চেষ্টায় তার কোনো ইঙ্গিত না পেয়ে বিশ্বের অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক যখন প্রায় হাল ছাড়তে বসেছে, ফিল্ডিং তখনও একা তার নিজের তৈরি ৯৫ ফুট ডায়ামিটারের রিসিভার তার নিজের বাড়ির পিছনের জমিতে বসিয়ে এক নাগাড়ে বছরের পর বছর ছায়াপথের একটি বিশেষ অংশে ২১ সেন্টিমিটারের বেতার তরঙ্গে গাণিতিক সংকেত পাঠিয়ে চলেছে। আজ তার সফলতার ইঙ্গিত পেয়ে আমার মনটা আনন্দে ভরে উঠেছে।

ফ্রানসিস যে প্যাপাইরাসের দৈববাণীর কথা তার চিঠিতে উল্লেখ করেছে, সে বিষয়ে কিছু বলা দরকার।

প্রাচীন মিশরের একটানা সাড়ে তিন হাজার বছরের সভ্যতার ইতিহাসে অনেক রাজার উল্লেখ আছে এবং এদের সমাধি খুঁড়ে প্রত্নতত্ত্ববিদরা অনেক আশ্চর্য জিনিস পেয়েছেন। মৃত্যুর পরে রাজার আত্মা যাতে সন্তুষ্ট থাকে তার জন্য কফিনবন্ধ শবদেহের সঙ্গে ধনরত্ন পুঁথিপত্র পোশাকপরিচ্ছদ বাসনকোসন ইত্যাদি বহু সামগ্রী পুরে দেওয়া হতো সমাধির মধ্যে। এই সমাধির প্রবেশদ্বার বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলেও, ভিতরের জিনিসপত্র অনেক সময়ই লুট হয়ে যেত। ১৯২২ সালে বালক-রাজা তুতানখামেনের সমাধি আবিষ্কার হবার পরে যখন দেখা গেল যে প্রবেশদ্বারের সিলমোহরটি অক্ষত রয়েছে, তখন প্রত্নতত্ত্ববিদদের মধ্যে হইচই পড়ে গিয়েছিল। আজ কায়রো মিউজিয়মে গেলে দেখা যায় কী আশ্চর্য সব জিনিস ছিল এই সমাধিতে।

গত মার্চ মাসে আমেরিকান ধনকুবের ও শখের প্রত্নতত্ত্ববিদ গিডিয়ন মর্গেনস্টার্ন কায়রোতে বেড়াতে এসে খবর পান যে সেই দিনই সকালে স্থানীয় পুলিশ দুটি চোর ধরেছে, যাদের কাছে প্রাচীন মিশরের কিছু মূল্যবান জিনিস পাওয়া গেছে। তারা স্বীকার করেছে যে জিনিসগুলো এসেছে একটি মাস্তাবা বা সমাধি থেকে। নাইলের পুব পারে বেনি হাসানে একটি চুনা পাথরের টিলার গায়ে লুকানো ছিল এই মাস্তাবার প্রবেশপথ।

মর্গেনস্টার্ন তৎক্ষণাৎ মিশর সরকারের অনুমতি নিয়ে নিজের খরচে একটি প্রত্নতাত্ত্বিক দল খাড়া করে এই মাস্তাবার ভিতরে খোঁড়ার কাজ শুরু করে দেয়। ধনরত্ন বিশেষ অবশিষ্ট না থাকলেও, একটি জিনিস পাওয়া যায় যেটা খুবই অদ্ভুত এবং মূল্যবান। সেটা হলো একটা প্যাপাইরাসের দলিল।

প্যাপাইরাস গাছের আঁশ চিরে নিয়ে তাকে পানের তবকের মতো করে পিটিয়ে পাতলা করে কাগজের মতো ব্যবহার করত মিশরীয়রা। এতদিন যে সব প্যাপাইরাস পাওয়া গেছে তার বেশির ভাগই রাজপ্রশস্তি, বা ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনা বা স্থানীয় উপকথা। কিন্তু এবারের এই প্যাপাইরাসটির পাঠোদ্ধার করে জানা যায় সেটা কতকগুলি দৈববাণী, যাকে ইংরাজিতে বলে ওর‍্যাকলস। ফ্রান্সের দৈবজ্ঞ নস্ট্রাডামুসের ওর‍্যাফ্‌ল্‌সের কথা অনেকেই জানে। আজ থেকে প্রায় পাঁচশো বছর আগে পদ্যে লেখা এক হাজার ভবিষ্যদ্বাণীর অনেকগুলোই পরবর্তী কালে আশ্চর্যভাবে ফলে গেছে। লন্ডনের প্লেগ ও অগ্নিকাণ্ড, ফরাসি বিপ্লবে ষোড়শ লুই-এর গিলোটিনে মুণ্ডপাত, নেপোলিয়ন হিটলারের উত্থান পতন, এমনকী হিরোশিমা ধ্বংসের কথা পর্যন্ত নস্ট্রাডামুস বলে গিয়েছিলেন।

মিশরের এই প্যাপাইরাসেও এই ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, কিন্তু সবগুলোই বিজ্ঞান সংক্রান্ত। হয়তো যাঁর সমাধি, তিনিই করেছেন এইসব ভবিষ্যদ্বাণী। যিনিই করে থাকুন, তাঁর গণনায় স্তম্ভিত হতে হয়। আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে বলা হয়েছে বাষ্পযান আকাশযান টেলিফোন টেলিভিশন আবিষ্কারের কথা; যান্ত্রিক মানুষের কথা বলা আছে; কম্পিউটারের বর্ণনা আছে, এক্স-রে ইনফ্রারেড রে আলট্রা ভায়োলেট-রের কথা বলা আছে। সবচেয়ে আশ্চর্য যা বলা হয়েছে— এবং যেটা সবে বৈজ্ঞানিকমহল মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে—সেটা হলো এই যে সৌরজগতে একমাত্র পৃথিবী ছাড়া অন্য কোনো গ্রহে প্রাণী নেই। আমাদের সৌরজগতের বাইরে মহাকাশে আরও অসংখ্য সৌরজগৎ আছে যেখানে নাকি নানান গ্রহে নানারকম প্রাণী আছে, কিন্তু মানুষের মতো প্রাণী আছে কেবল আর একটিমাত্র গ্রহে। এই গ্রহের মানুষ পৃথিবীর মানুষের চেয়ে নাকি অনেক বেশি উন্নত। শুধু তাই নয়, বহুকাল থেকে নাকি পাঁচ হাজার বছরে একবার করে এই গ্রহের মানুষ পৃথিবীতে এসেছে, এবং পৃথিবীর মানুষের সভ্যতার পথে বেশ খানিকটা এগিয়ে দিয়ে গেছে। প্যাপাইরাসের লেখক নিজেই নাকি এমন একটি গ্রহান্তরের মানুষের সামনে পড়েছিলেন, এবং তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষমতার জন্য নাকি এই ভিনগ্রহের মানুষই দায়ী।

এই আশ্চর্য প্যাপাইরাসটি মর্গেনস্টার্ন কায়রোর সংগ্রহশালার অধ্যক্ষকে বলেকয়ে আদায় করেছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্য। গত মে মাসে লন্ডনে একটি বিশেষ বৈঠকে পৃথিবীর কয়েকজন বাছাইকরা বৈজ্ঞানিকের সামনে মর্গেনস্টার্ন এই প্যাপাইরাসটি উপস্থিত করেন, এবং সে সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। প্যাপাইরাসটির পাঠোদ্ধার করেন বিখ্যাত মিশর-বিশেষজ্ঞ ডা. এডওয়ার্ড থর্নিক্রফ্‌ট। জীর্ণ প্যাপাইরাসের তলার খানিকটা অংশ নেই। হয়তো সেখানে লেখকের নাম ছিল; কিন্তু সেটা এখন আর জানার উপায় নেই। তবু যেটুকু জানা গেছে তাও খুবই চমকপ্রদ। সন তারিখের যা উল্লেখ পাওয়া যায়, তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে লেখকের সঙ্গে ভিনগ্রহের প্রাণীর সাক্ষাৎ হয়েছিল আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে। ঠিক কবে এবং কোথায় আবার সেই

গ্রহের প্রাণীর আবির্ভাব ঘটবে সে খবরটা মনে হয় পুঁথির লুপ্ত অংশে ছিল, এবং তাই নিয়ে মর্গেনস্টার্ন গভীর আক্ষেপ প্রকাশ করেন।

আমার সঙ্গে আমার জার্মান বৈজ্ঞানিক বন্ধু উইল্‌হেল্‌ম্ ক্রোলও উপস্থিত ছিল এই সভায়। এমন সন্দেহবাতিকগ্রস্ত লোক আমি কমই দেখেছি। বক্তৃতার সময় আমার কানের কাছে মুখ এনে সে যে কতবার 'হামবাগ, ফ্রড, ধাপ্পাবাজ' ইত্যাকার মন্তব্য করেছে তার হিসেব নেই। বক্তৃতার শেষে সে সরাসরি বলে বসল যে প্যাপাইরাসটা সে একবার হাতে নিয়ে দেখতে চায়। ক্রোলের যথেষ্ট খ্যাতি আছে বলেই বোধ হয় মর্গেনস্টার্ন অপমান হজম করে তার অনুরোধ রক্ষা করে। আমিও দেখলাম প্যাপাইরাসটাকে খুব মন দিয়ে, কিন্তু সেটা জাল বলে মনে হলো না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে— ফিল্ডিং যে গ্রহ থেকে তার বেতার সংকেতের উত্তর পেয়েছে, প্যাপাইরাসে কি সেই গ্রহের প্রাণীর কথাই বলা হয়েছে?

ব্যাপারটা আরো কিছু দূর না এগোলে বোঝার উপায় নেই।

২৬শে অক্টোবর

কাগজে আশ্চর্য খবর।

গিডিয়ন মর্গেনস্টার্ন আত্মহত্যা করেছে।

সে ইতিমধ্যে আবার কায়রোয় ফিরে গিয়েছিল; কেন তা খবরে বলেনি। যেটা বলেছে সেটা হলো এই—

কায়রোতে পৌঁছানোর দুদিন পরেই সে হোটেলের ম্যানেজারের কাছে গিয়ে অভিযোগ জানায় যে তার রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে, কারণ ঘুম ভাঙলেই সে দেখতে পায় তার জানালায় একটা শকুনি বসে স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে। ম্যানেজার নাকি প্রথমে ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাতে ফল ভালো হয়নি। মর্গেনস্টার্ন রেগে তার টুঁটি টিপে ধরেছিল। এদিকে সম্ভ্রান্ত অতিথি হিসেবে এহেন অবিশ্বাস্য অভিযোগ সত্ত্বেও মর্গেনস্টার্নের বিরুদ্ধে কোনো স্টেপ নিতে পারেনি ম্যানেজার। জানালাটা বন্ধ রাখার প্রস্তাব করাতে মর্গেনস্টার্ন বলেন যে হাঁপানির জন্য তিনি বন্ধ ঘরে শুতে পারেন না।

দুদিন অভিযোগ করার পর তৃতীয় দিন সকালে কফি নিয়ে রুমবয় মর্গেনস্টার্নের ঘরের বেল বারবার টিপে কোনো জবাব না পেয়ে শেষে মাস্টার কি দিয়ে দরজা খুলে দেখে ঘর খালি। ভদ্রলোকের স্যুটকেস রয়েছে, স্নানের ঘরে প্রসাধনের জিনিসপত্র রয়েছে, আর বেডসাইড টেবিলের উপর রয়েছে টিকিট লাগানো একটা ছোট্ট পার্সেল, আর একটা খোলা চিঠি। চিঠিতে লেখা শুধু একটি লাইন— 'নেখবেৎ আমায় বাঁচতে দিল না।'

মিশরীয়রা সেই প্রাচীন যুগ থেকে নানারকম জন্তু জানোয়ার পাখি সরীসৃপকে দেবদেবীরূপে কল্পনা করে পূজা করে এসেছে। শেয়াল কুকুর সিংহ প্যাঁচা সাপ বাজপাখি বেড়াল ইত্যাদি সবই এর মধ্যে পড়ে। শকুনি ছিল তাদের কাছে নেখবেৎ দেবী।

খোঁজ নিয়ে জানা যায় মর্গেনস্টার্ন ভোররাত্তিরে হোটেল থেকে বেরিয়ে যায় দ্বাররক্ষককে বেশ ভালোরকম বকশিশ দিয়ে। পুলিশ প্যাকেটটা খুলে দেখে তাতে কোনো ক্লু পাওয়া যায় কি না। সেটা থেকে বেরোয় মর্গেনস্টার্নের মহামূল্য রিস্টওয়াচ, যেটা সে পাঠাতে চেয়েছিল নিউইয়র্কে তার এক ভাইপোর কাছে।

এখানে বলা দরকার যে মিশরের প্রাচীন সমাধি খোঁড়ার শোচনীয় পরিণামের নজির এটাই প্রথম নয়। তুতানখামেনের সমাধি খননের ব্যাপারে যিনি প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, সেই লর্ড কারনারভনকেও কিছুদিনের মধ্যেই ভারি অদ্ভুতভাবে মরতে হয়েছিল। কায়রোর এক হোটেলেই তাঁর গালে এক মশা কামড়ায়। সেই কামড় থেকে সেপটিক ঘা, তার ফলে রক্তদৌর্বল্য থেকে নিউমোনিয়া এবং মৃত্যু।

কারনারভনের মৃত্যু যে সময়ে ঘটে, ঠিক একই সময়ে ইংল্যান্ডে হ্যাম্পশায়ারে কারনারভনের পোষা কুকুরটি বিনা রোগে অকস্মাৎ মারা যায়। এই দুই মৃত্যুর কয়েক মাসের মধ্যে এই সমাধির কাজের সঙ্গে জড়িত আরও আটজন পর পর মারা যায় এবং কারুর মৃতুই ঠিক স্বাভাবিক ছিল না।

আমার জানতে ইচ্ছে করছে ব্রায়ান ডেক্সটার এখন কোথায় আছে। ডেক্সটার একজন তরুণ ব্রিটিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ফোটোগ্রাফার। সে মর্গেনস্টার্নের সঙ্গে ছিল এই সমাধি খননের ব্যাপারে। কথা ছিল কায়রোর কাজ শেষ হলে ও ভারতবর্ষে চলে আসবে। বছরতিনেক আগে একবার এসে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে; আমার চিঠিতেই ভারত সরকারের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ ডেক্সটারকে কালিবঙ্গনে গিয়ে হারাপ্পা সভ্যতার নিদর্শনের কিছু ছবি তোলার অনুমতি দেয়। ও বলে রেখেছে এবার এলে গিরিডিতে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে।

২৮ শে অক্টোবর

ফিল্ডিং-এর চিঠিতে চাঞ্চল্যকর খবর।

ছায়াপথ থেকে সংকেত এখন রীতিমতো স্পষ্ট এবং তা শধু মৌলিক সংখ্যায় নয়।
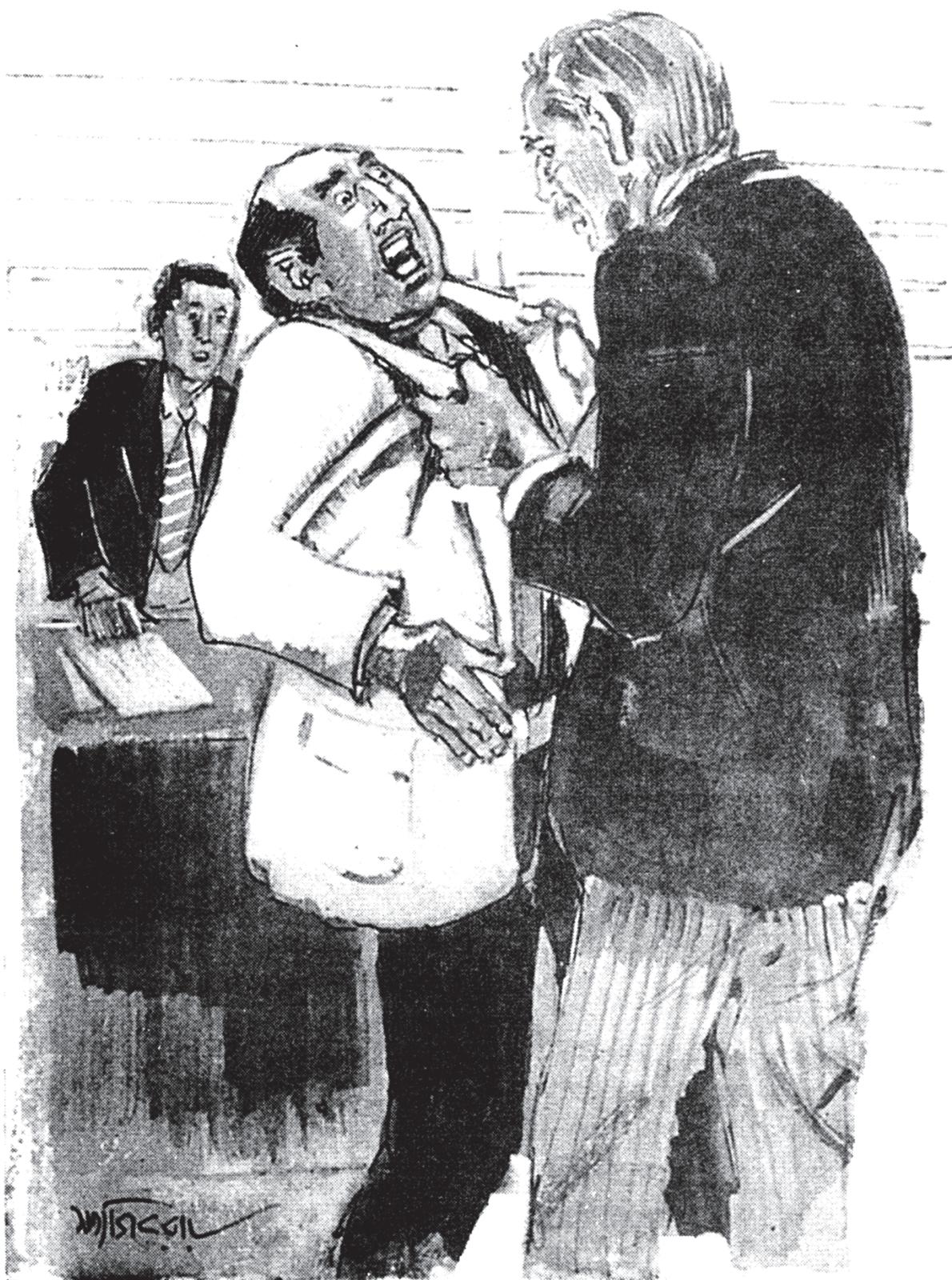
ফিল্ডিং-এর দৃঢ় বিশ্বাস এই গ্রহই হচ্ছে প্যাপাইরাসের গ্রহ। যেভাবে ঘন ঘন সংকেত আসছে, তাতে বোঝাই যাচ্ছে যে পৃথিবীর সঙ্গে যোগস্থাপন করতে পেরে এই নাম-না-জানা গ্রহের প্রাণী উল্লসিত হয়ে উঠেছে, অনেক দিনের পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হলে যেমন হয়।

ফিল্ডিং-এর উত্তেজনা আমিও আমার শিরায় অনুভব করছি। গভীর আপশোস হচ্ছে প্যাপাইরাসের ওই হারানো শেষাংশের জন্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই গ্রহের প্রাণী আবার কবে পৃথিবীতে আসবে এবং কোথায় এসে নামবে, তার ইঙ্গিত এই হারানো অংশে ছিল। কালই রাত্রে আমার বাগানে ডেকচেয়ারে বসে ছিলাম অন্ধকারে, নিউটন আমার কোলে, আমার দৃষ্টি আকাশের দিকে। এমনিতেই অক্টোবরে উল্কাপাত হয় অন্য সময়ের তুলনায় একটু বেশি; কাল দেড় ঘণ্টায় সতেরোটা উল্কা দেখেছি, আর প্রতিবারই প্যাপাইরাসের গ্রহের কথা মনে হয়েছে।

৩০শে অক্টোবর

ফিল্ডিং-এর কাছ থেকে জরুরি টেলিগ্রাম— 'পত্রপাঠ চলে এসো কায়রো— তোমার জন্য হোটেল কার্নাকে ঘর বুক করা হয়ে গেছে।' আমি জানিয়ে দিয়েছি ৩রা নভেম্বর পৌঁছোচ্ছি।

কিন্তু হঠাৎ কায়রো কেন?

ঈশ্বর জানেন।

৪ঠা নভেম্বর

আমি কালই পৌঁছেছি, যদিও প্লেন ছিল তিন ঘণ্টা লেট। আমার মন বলছিল এয়ারপোর্টে এসে দেখব শুধু ফিল্ডিং নয়, ক্রোলও এসেছে; কিন্তু সেইসঙ্গে যে আরেকজন থাকবে, সেটা ভাবতে পারিনি। ইনি হলেন ব্রায়ান ডেক্সটার। ব্রায়ানকে দেখেই বুঝলাম যে তার উপর ভারতবর্ষের সূর্যের প্রভাব পড়েছে, কারণ তার এত তামাটে রং আগে কখনও দেখিনি।

ব্রায়ান এবারও কালিবঙ্গন গিয়েছিল, আর সেখানে থাকতেই মর্গেনস্টার্নের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে সোজা লন্ডনে চলে আসে। আত্মহত্যার বিবরণ শুনে সে নাকি খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিল, যদিও আমি জিজ্ঞেস করাতে বলল, অভিশাপ টভিশাপে তার বিশ্বাস নেই। তার ধারণা মর্গেনস্টার্নের সানস্ট্রোক জাতীয় কোনো ব্যারামের সূত্রপাত হয়, এবং তার ফলে মাথাটা বিগড়ে যায়। ব্রায়ান নাকি বেনি হাসানের সমাধি খননের সময়ই লক্ষ করেছিল যে মর্গেনস্টার্ন রোদের তাপ একদম সহ্য করতে পারে না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে কি সে সত্যিই উৎসাহী ছিল?' ব্রায়ান বলল, 'অগাধ টাকা থাকলে অনেক লোক নানারকম শখকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। তা ছাড়া খ্যাতির প্রতিও মর্গেনস্টার্নের একটা লোভ ছিল। শুধু বড়োলোক হয়ে আর আজকাল আমেরিকায় বিশেষ কেউ নাম করতে পারে না। সবাই চায় একটা কোনো কীর্তি রেখে যেতে। হয়তো মর্গেনস্টার্ন চেয়েছিল এই প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযান ফিনান্স করে সে বেশ কিছুটা খ্যাতি লাভ করবে।'

আমি আরো কয়েকটা প্রশ্ন করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ফিল্ডিং বাধা দিয়ে বলল বাকি কথা হোটেলে গিয়ে হবে।

লাঞ্চের পর কার্নাক হোটেলের দোতলার খোলা বারান্দায় বসে কফি খেতে খেতে বাকি কথা হলো। সামনে নীল নদ বয়ে চলেছে, টুরিস্টদের জন্য নানারকম বোট সাজানো রয়েছে জেটিতে, রাস্তায় দেশবিদেশের বিচিত্র লোকের ভিড়।

প্রথমেই ব্রায়ান তার ক্যামেরার ব্যাগ থেকে একটা বড়ো খাম বার করে আমার দিকে এগিয়ে দিল।

'দেখো তো জিনিসটা তোমার চেনা কি না।'

খুলে দেখি, আরে, এ যে সেই প্যাপাইরাসটার ফোটোগ্রাফ!

'জিনিসটা পাওয়ামাত্র এটার ছবি তুলে রেখেছিলাম,' বলল ব্রায়ান। — 'তুমি যে প্যাপাইরাসটা লন্ডনে দেখেছিলে সেটার সঙ্গে কোনো তফাতটা দেখছ কি?'

দেখছি বই কী!— ছবিটা হাতে নিতেই তো তফাতটা লক্ষ করেছি। এটা সম্পূর্ণ প্যাপাইরাসটার ছবি, তলার অংশটুকুও বাদ নেই।

ব্রায়ানকে জিজ্ঞেস করাতে সে ব্যাপারটা বলল। —

'আসলে প্যাপাইরাসটার অবস্থা এমনিতেও ছিল বেশ জীর্ণ। পাঁচ হাজার বছর পাকানো অবস্থায় সমাধিকক্ষের এক কোণে পড়ে ছিল। এটা আমিই প্রথম পাই। আর পেয়ে প্রথমেই সাবধানে পাক খুলে মাটিতে ফেলে চার কোণে চারটে পাথর চাপা দিয়ে কয়েকটা ফ্ল্যাশলাইট ফোটো তুলে নিই। মর্গেনস্টার্ন এটা দেখেই বগলদাবা করে। আমি ওকে বলি সে যেন খুব সাবধানে জিনিসটা হ্যান্ডল করে। মুখে হ্যাঁ বললেও বেশ বুঝতে পারি এসব জিনিসের মূল্য ঠিক বোঝে না।'

'ও প্রথমেই যায় থর্নিক্রফ্‌টের কাছে। থর্নিক্রফ্‌ট লেখাটা পড়ে দেবার পর মর্গেনস্টার্ন সোজা চলে যায় কায়রো মিউজিয়ামের কিউরেটর মি. এব্রাহিমের কাছে। আমার মনে আছে সেদিন খুব ঝড় ছিল; বালিতে শহর অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। আমার বিশ্বাস তখনই প্যাপাইরাসের শেষ অংশটা খোয়া গেছে।'

‘ওয়েল, শঙ্কু?’

ক্রোল এতক্ষণ চুপচাপ ছিল, যদিও তার মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনার ভাব প্রথম থেকেই লক্ষ করছি। ক্রোল হায়রোগ্লিফিক্সের ভাষা ভালোভাবেই জানে, এবং বুঝতেই পারছি সে ইতিমধ্যে শেষ অংশটির মানে বার করে ফেলেছে, আর তাই এই উত্তেজনা।

আমি বললাম, ‘এই অংশতে তো দেখছি দৈবজ্ঞের নাম রয়েছে— মেনেফ্রু। আর অন্য গ্রহ থেকে যারা আসবে, তারা কবে আসবে এবং কোথায় এসে নামবে, তাও দেওয়া রয়েছে।’

ফিল্ডিং বলল, ‘সেই জন্যেই তোমাকে টেলিগ্রাম করে আনালাম। অমাবস্যা তো আর দুদিন পরেই, আর দৈবজ্ঞ যদি সনে ভুল না করে থাকেন—’

আমি বাধা দিয়ে বললাম, ‘এতে যে ধূমকেতুর উল্লেখ আছে তার থেকেই তো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। আমি একবার হিসাব করে দেখেছিলাম, ছিয়াত্তর বছর পর পর যদি হ্যালির ধূমকেতু আসে, তা হলে আজ থেকে ঠিক পাঁচ হাজার বছর আগে একবার সেই ধূমকেতুর আবির্ভাব ঘটেছিল— অর্থাৎ ৩০২২ বি সি-তে।’

ক্রোল প্রচণ্ড উৎসাহের সঙ্গে সায় দিয়ে বলল, ‘আমারও হিসেব তোমার সঙ্গে মিলছে। প্যাপাইরাসে বলছে দৈবজ্ঞের

যখন অন্য গ্রহের মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তখন আকাশে ধূমকেতু ছিল। সেটা ৩০২২ হওয়া এই জন্যই সম্ভব কারণ তখন ইজিপ্টে মেনিসের রাজত্বকাল, আর সেটাকেই বলা হয় ইজিপ্টের স্বর্ণযুগের শুরু। সব মিলে যাচ্ছে, শঙ্কু!'

ডেক্সটার বলল, 'কিন্তু এর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা চলে কি? এক-আধ বছরও কি এদিক ওদিক হতে পারে না?'

ফিল্ডিং তার চুরুটে একটা লম্বা টান দিয়ে বলল, 'আমার ধারণা, এতে কোনো ভুল নেই, কারণ আমি এখানে আসার আগের দিনই এপসাইলন ইন্ডি থেকে সংকেত পেয়েছি। তাতে বলা হয়েছে যে আগামী অমাবস্যায় তাদের দূত পৃথিবীতে এসে পৌঁছাচ্ছে, এবং তারা যেখানে নামবে সে জায়গাটা হলো এখান থেকে আন্দাজ দুশো কিলোমিটার পশ্চিমে।'

'তার মানে মরুভূমিতে? ডেক্সটার প্রশ্ন করল।'

'সেটাই স্বাভাবিক নয় কি?'

'কিন্তু কী ভাষায় পেলে এই সংকেত?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'টেলিগ্রাফের ভাষা', বলল ফিল্ডিং, 'মর্স'।

'তার মানে পৃথিবীর সঙ্গে তারা যোগ রেখে চলেছে এই গত পাঁচ হাজার বছর?'

'সেটা আর আশ্চর্য কী শঙ্কু। ভুলে যেও না তাদের সভ্যতা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর।'

'তা হলে তো তারা ইংরাজিও জানতে পারে।'

'কিছুই আশ্চর্য নয়। তবে আমি ইংরেজ কি না সেটা হয়তো তাদের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না, তাই তারা মর্স কোড ব্যবহার করেছে।'

'তা হলে আমাদের গন্তব্যস্থল হলো কোথায়?' আমি প্রশ্ন করলাম। —'তারা তো আর এই হোটেলে এসে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে না!'

ফিল্ডিং হেসে বলল, 'না, সেটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। আমরা যাব বাওয়িতি— এখান থেকে দুশো ত্রিশ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে। রাস্তা আছে, তবে তাকে হাইওয়ে বলা চলে না। অবিশ্যি তাতে কোনো অসুবিধা হবে না। ক্রোলের গাড়িটা তো তুমি দেখেছ।'

তা দেখেছি। এয়ারপোর্ট থেকে ক্রোলের গাড়িতেই এসেছি। বিচিত্র গাড়ি— যেন একটি ছোটোখাটো চলন্ত হোটেল। সেইসঙ্গে মজবুতও বটে। 'অটোমোটেল' নামটা ক্রোলেরই দেওয়া।

'ডা. থর্নিক্রফ্‌টও আসছেন কাল সকালে,' বলল ফিল্ডিং, 'তিনিও হবেন আমাদের দলের একজন।'

এ খবরটা জানা ছিল না। তবে থর্নিক্রফ্‌টের আগ্রহের কারণটা স্পষ্ট। হাজার হোক তিনিই তো প্যাপাইরাসের পাঠোদ্ধার করেছেন।

'তোমার অ্যানাইহিলিনটা সঙ্গে এনেছ তো?' ক্রোল জিজ্ঞেস করল।

আমি জানিয়ে দিলাম যে এই ধরনের অভিযানে সেটা সবসময়ই সঙ্গে থাকে। আমার তৈরি এক আশ্চর্য পিস্তলের কথা এরা সকলেই জানে। যত বড়ো এবং যত শক্তিশালী প্রাণীই হোক না কেন, তার দিকে তাগ করে এই পিস্তলের ঘোড়া টিপলেই সে প্রাণী নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সবসুদ্ধ বার দশেক চরম সংকটের সামনে পড়ে আমাকে এই অস্ত্র ব্যবহার করতে হয়েছে। প্যাপাইরাসের বিবরণ থেকে এই ভিনগ্রহের প্রাণীকে হিংস্র বলে মনে হয় না, কিন্তু এবার যারা আসবে তাদের অভিপ্রায় যখন জানা নেই, তখন আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকলে ক্ষতি কী?

আমরা চারজনে পরস্পরের প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে রইলাম যেন আমাদের এই আসন্ন অভিযানের কথা ঘুণাক্ষরেও কেউ না জানে।

আমরা উঠে যে যার ঘরে যাবার তোড়জোড় করছি, এমন সময় দেখি হোটেলের ম্যানেজার মি. নাহুম আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। এখানে বলে রাখি যে এই কার্নাক হোটেল থেকেই মর্গেনস্টার্ন উধাও হয়েছেন এবং এই মি. নাহুমকেই মর্গেনস্টার্নের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল।

নাহুম জানালেন যে মর্গেনস্টার্নের আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। কাজেই ধরে নিতে হয় মর্গেনস্টার্ন শহর থেকে বেরিয়ে গিয়ে নাইলের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছেন।

'আর কোনো শকুনটকুনি এসে কোনো ঘরের জানলায় বসছে না তো?' ব্যঙ্গের সুরে প্রশ্ন করল ক্রোল।

জিভ কাটার অভ্যাস ইজিপ্সীয়দের থাকলে অবশ্যই মি. নাহুম জিহ্বা দংশন করতেন। তার বদলে তিনি আমাদের কাছে এগিয়ে এসে ফিসফিস করে বললেন, 'আপনাদের বলতে দ্বিধা নেই— আমাদের হোটেলের ত্রিসীমানার মধ্যে কেউ কোনোদিন শকুনি দেখেছে বলে শুনিনি। তবে বেড়াল কুকুর যে এক আধটা দেখা যাবে না তার ভরসা দিতে পারছি না, হে হে।'

আমরা ঠিক করেছি কাল লাঞ্চের পরেই রওনা দেবো। কী আছে কপালে জানি না, তবে আমি মনে করি ইজিপ্টে আসার মধ্যেই একটা সার্থকতা আছে। এখানে এসে দু-মিনিট চুপ করে থাকলেই চারপাশের আধুনিক শহরের সব চিহ্ন মুছে গিয়ে চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই প্রাচীন যুগের মিশর। ইমহোটেপ, আখেনাতন, খুফু, তুতানখামেনের দেশে এসে নামবে ছায়াপথের কোন এক অজ্ঞাত সৌরজগতের প্রাণী? ভাবতেও অবাক লাগে।

৫ই নভেম্বর

আজ মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে দুটো ঘটনা আমাদের সকলকে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। এখনও তার জেরে সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারিনি।

আমি ঠিক করেছিলাম আজ ভোর পাঁচটায় উঠে হোটেল থেকে বেরিয়ে নাইলের ধারে একটু ঘুরে আসব। গিরিডিতে রোজ ভোরে উশ্রীর ধারে বেড়ানোর অভ্যাসটা আমার বহুকালের।

ঘুম আমার আপনা থেকেই সাড়ে চারটেয় ভেঙে যায়। আজ কিন্তু ভাঙল স্বাভাবিকভাবে নয়। আমার ঘরের দরজায় প্রচণ্ড ধাক্কাই এই নিদ্রাভঙ্গের কারণ।

ব্যস্তভাবে উঠে জাপানে উপহার পাওয়া বেগুনি কিমোনোটা চাপিয়ে নিয়ে দরজাটা খুলে দেখি ডেক্সটার— তার চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, দম ফেলছে যেন ম্যারাথন দৌড়ে এল!

'কী ব্যাপার?'

'এ স্নেক— এ স্নেক ইন মাই রুম!'

কথাটা শেষ করে টলায়মান অবস্থায় ঘরে ঢুকে সে ধপ করে আমার খাটে বসে পড়ল।

আমি জানি ডেক্সটারের ঘর আমার তিনটে ঘর পরে। বাকি দুজন রয়েছে আমাদের উপরের তলায়, তাই সে আমার কাছেই এসেছে।

ডেক্সটারকে আশ্বাস দিয়ে দৌড়ে প্যাসেজে গিয়ে হাজির হলাম।

মেঝেতে মিশরীয় নকশা করা কার্পেট বিছানো সুদীর্ঘ প্যাসেজের এমাথা থেকে ওমাথায় একটি প্রাণীও নেই। থাকার কথাও নয়, কারণ ঘড়ি বলছে আড়াইটে। যা করার আমাকেই করতে হবে।

সুটকেস থেকে অ্যানাইহিলিন পিস্তলটা বার করে ছুট দিলাম একশো ছিয়াত্তর নম্বর ঘরের দিকে। ডেক্সটারের কথায় যে পুরোপুরি বিশ্বাস হয়েছিল তা বলব না, তবে জরুরি অবস্থায় জন্য তৈরি থাকা দরকার।

ঘরের দরজা হাট হয়ে আছে, ভিতরে ঢুকে বুঝলাম এ ঘর আর আমার ঘরের মধ্যে তফাৎ শুধু দেয়ালের ছবিতে।

বাঁয়ে চোখ ঘোরাতেই দেখলাম সাপটাকে। গোখুরো। খাটের পায়া বেয়ে মেঝেয় কার্পেটের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, অর্ধেক দেহ খাটের উপর। ভারতীয় গোখুরোর মতো অতো মারাত্মক না হলেও, বিষধর তো বটেই। প্রাচীন যুগে এই সাপকেও মিশরীয়রা পুজো করত দেবী হিসেবে।

আমার পিস্তলের সাহায্যে নিঃশব্দে নাগদেবীকে নিশ্চিহ্ন করে ফিরে এলাম আমার ঘরে।

ডেক্সটার এখনও কাবু। মেনেফ্রুর রুষ্ট আত্মার অভিশাপে যে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করেনি এই গোখুরো তার মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সে বিশ্বাস ঢুকিয়ে দিয়েছে।

আমার মন অন্য কথা বলছে, তাই তরুণ ত্রস্ত প্রত্নতত্ত্ববিদকে আমার তৈরি নার্ভিগারের এক ফোঁটা জলে মিশিয়ে খাইয়ে দিয়ে তার পিঠ চাপড়ে দিলাম।

তাতেও অবিশ্যি পুরোপুরি কাজ হলো না। তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে, তার ঘরের আর কোথাও কোনো সাপ নেই সেটা দেখিয়ে দিয়ে তবে নিশ্চিন্তি।

ম্যানেজারের সঙ্গে একটা তুলকালাম হয়ে যেত, কিন্তু সাপটা কোথায় গেল জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেওয়া মুশকিল হতো বলে সেটা আর হলো না। যেহেতু আজই আমরা হোটেল ছেড়ে চলে যাচ্ছি, তাই আর ব্যাপারটা নিয়ে ঘাঁটালাম না।?

দ্বিতীয় ঘটনাটা ঘটল হোটেলের পিরামিড রুমে, ব্রেকফাস্টের সময়। থর্নিক্রফ্‌টের প্লেন এসে পৌঁছাবে ভোর ছটায়, সুতরাং তার হোটেলের পৌঁছে যাওয়া উচিত সাড়ে সাতটার মধ্যে। আটটায়, তখনও আমাদের প্রাতরাশ শেষ হয়নি, ম্যানেজার স্বয়ং এসে খবর দিলেন যে থর্নিক্রফ্‌ট এসে পৌঁছেছেন ঠিকই, কিন্তু অ্যাম্বুল্যান্সে।

এয়ারপোর্ট থেকে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় একটি আঘাত পেয়ে থর্নিক্রফ্‌ট সংজ্ঞা হারান। দুজন সুইস টুরিস্ট পুলিশের সাহায্যে অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করে। ব্যাপারটা রাহাজানি তাতে সন্দেহ নেই। কারণ তিনশো পাউন্ড সমেত থর্নিক্রফ্‌টকে ওয়লেটটি লোপ পেয়েছে।

সৌভাগ্যক্রমে আঘাত গুরুতর হয়নি। ভয় ছিল থর্নিক্রফ্‌কে হয়তো দল থেকে বাদ দিতে হবে, কিন্তু প্রস্তাবটা উনি কানেই নিলেন না। বললেন ওঁর যে কোনো রকম দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, তার জন্য উনি একরকম প্রস্তুতই ছিলেন। কারণ জিজ্ঞেস করাতে বললেন, 'জানি তোমাদের যুক্তিবাদী মন এসব মানতে চায় না, আমি কিন্তু অভিশাপে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী। প্রাচীন মিশর সম্বন্ধে তোমাদের যদি আমার মতো পড়াশুনা থাকত, তা হলে তোমরাও আমার সঙ্গে একমত হতে।'

৫ই নভেম্বর, বিকেল পৌনে তিনটে

আমরা আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই বেরিয়ে পড়ব। ইতিমধ্যে একটা ঘটনা ঘটে গেছে সেটা লিখে রাখছি।

মিনিট পনেরো আগে মি. নাহুম একটি আজব জিনিস এনে দেখালেন আমাকে।

জিনিসটা একটা ছোট্ট পকেট ডায়েরি। বোঝাই যায় সেটা বেশ কিছুকাল জলমগ্ন অবস্থায় ছিল। ভিতরে লেখা যা ছিল তা সব ধুয়ে মুছে গেছে; ছাপা অংশগুলোও আর পড়া যায় না। শুধু একটা কারণে জিনিসটার মালিকানা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকে না; সেটা হলো ডায়েরির ভিতরে পাতার সঙ্গে জেমক্লিপ দিয়ে আটকানো একটা ফটোগ্রাফ। বিবর্ণ হওয়া সত্ত্বেও, যার ফোটো তাকে চিনতে অসুবিধা হয় না। লন্ডনের সেই সভায় এনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। ইনি মর্গেনস্টার্নের স্ত্রী মিরিয়াম। কায়রো থেকে প্রায় এগারো কিলোমিটার দূরে নাইলের ধারে একটি জেলের বাড়ি থেকে পুলিশ এই ডায়েরিটা উদ্ধার করেছে। জেলের

একটি সাত বছরের ছেলে নদীর ধারে কাদার মধ্যে এটাকে পায়।

মর্গেনস্টার্ন যতই বেআক্কেলি করে থাকুক না কেন, এই ডায়েরিটা দেখে তার জন্য কিছুটা অনুকম্পা বোধ না করে পারলাম না।

ঘরের দরজায় টোকা পড়ল। নিশ্চয়ই ফিল্ডিং।

৫ই নভেম্বর, সন্ধ্যা সাড়ে ছটা

বাওয়িতি যাবার পথে কায়রো থেকে তিরাশি কিলোমিটার দক্ষিণে অল্ ফাইয়ুমের একটা সরাইখানায় বসে কফি আর আখরোট খাচ্ছি আমরা পাঁচজনে।

থর্নিক্রফ্‌ট অনেকটা সুস্থ। ডেক্সটার চুপ মেরে গেছে। তার দিকে দৃষ্টি রাখতে হচ্ছে এবং তাকে বলা হয়েছে সে যেন আমাদের ছেড়ে কোথাও না যায়। ক্রোল তার ক্যামেরার সরঞ্জাম সাফ করছে। তিনটে নতুন মডেলের লাইকা। তার একটায় বিরাট টেলিফটো লেন্স। মহাকাশযানের প্রথম আবির্ভাব থেকে শুরু করে সমস্ত ঘটনা সে ক্যামেরায় তুলে রাখবে। কয়েক বছর থেকে ‘আনআইডেনটিফাইড ফ্লাইং অবজেক্ট’ বা ‘অনির্দিষ্ট উড়ন্ত বস্তু’ নিয়ে যে পৃথিবীর বেশ কিছু লোক মাতামাতি করছে, তাদের সম্বন্ধে ক্রোলের অবজ্ঞার শেষ নেই। বলল, ‘এইসব লোকের তোলা বহু ছবি পত্রপত্রিকায় বেরিয়েছে, কিন্তু ধাপ্পাটা ধরা পড়ে এতেই যে, সব ছবিতেই উড়ন্ত বস্তুটিকে দেখানো হয় একটি চাকতির মতো। এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? অন্য গ্রহের মহাকাশযান হলেই কি তার চেহারা চাকতির মতো হবে?’

ফিল্ডিং আমাদের দিকে চোখ টিপে প্রশ্ন করল, ‘ধরো যদি আমাদের এই মহাকাশযানটিও চাকতির মতো দেখতে হয়?’

‘তা হলে সমস্ত সরঞ্জাম সমেত আমার এই তিনটে ক্যামেরাই নাইলের জলে ছুড়ে ফেলে দেবো’, বলল ক্রোল, ‘চাকতি দেখার প্রত্যাশায় আসিনি এই বালি আর পাথরের দেশে।’

একটা চিন্তা কাল থেকেই আমার মাথায় ঘুরছে, সেটা আর না বলে পারলাম না।

‘তোমরা ভেবে দেখছ কি, যে এই পাঁচ হাজার বছরের হিসেবে ক্রমশ পিছিয়ে গেলে বেশ কয়েকটা আশ্চর্য তথ্য বেরিয়ে পড়ে? পাঁচ হাজার বছর আগে ঈজিপ্টের স্বর্ণযুগের শুরু সে তো দেখেইছি। আরো পাঁচ হাজার পিছোলে দেখছি মানুষ প্রথম কৃষিকার্য শুরু করেছে, নিজের চেষ্টায় ফসল উৎপাদন করছে। আরো পাঁচ হাজার পিছিয়ে গেলে দেখছি মানুষ প্রথম হাড় ও হাতির দাঁতের হাতিয়ার, বর্শার ফলক, মাছের বঁড়শি ইত্যাদি তৈরি করছে, আবার সেইসঙ্গে গুহার দেয়ালে ছবি আঁকছে। ত্রিশ হাজার বছর আগে দেখছি মানুষের মস্তিষ্কের আকৃতি বদলে গিয়ে আজকের মানুষের মতো হচ্ছে। .... পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাসের অনেক অধ্যায় আজও আমাদের কাছে অস্পষ্ট, কিন্তু এই পাঁচের হিসেবে যতটুকু ধরা পড়ছে সেটা আশ্চর্য নয় কি?’

আমায় কথায় সবাই সায় দিল।

ক্রোল বলল, ‘হয়তো এদের কাছে পৃথিবীর ইতিহাসের একটা ধারাবাহিক বিবরণ আছে— একেবারে মানুষের আবির্ভাব থেকে শুরু করে ইজিপ্টের স্বর্ণযুগের শুরু অবধি।’

‘তা তো থাকতেই পারে,’ বলল ফিল্ডিং। — ‘এরা যদি জিজ্ঞেস করে আমরা কী চাই, তা হলে ওই দলিলের কথাটাই বলব। ওটা বাগাতে পারলে আর কোনো কিছুর দরকার আছে কি?’

কফি আর আখরোটের দাম চুকিয়ে দিয়ে আমরা উঠে পড়লাম।

আজ অমাবস্যা।

বাকি পথটা আকাশের দিকে চোখ রেখে চলতে হবে।

৬ই নভেম্বর, সকাল সাড়ে ছটা

বিজ্ঞানের সব শাখা প্রশাখায় আমার অবাধ গতি বলে আমি নিজেকে সব সময় বৈজ্ঞানিক বলেই বলে এসেছি, কোনো একটা বিষয়ে বিশেষজ্ঞতার দাবি করিনি। আমাদের দলের বাকি চারজনেই বিশেষজ্ঞের পর্যায়ে পড়ে, যদিও বয়স, অভিজ্ঞতা, কীর্তি বা খ্যাতিতে সকলে সমান নয়। কিন্তু কথা হচ্ছে কী, ফিল্ডিং, ক্রোল, থর্নিক্রফ্‌ট, ডেক্সটার, আমি— এদের কারুর মধ্যেই এখন আর কোনো তারতম্য ধরা পড়ছে না। মহাসাগরের তুলনায় টলির নালা আর গঙ্গার মধ্যে খুব একটা তফাত আছে কি?

কালকের অবিস্মরণীয় ঘটনাগুলো পর পর গুছিয়ে বলার চেষ্টা করছি।

অল্ ফাইয়ুমের সরাইখানা থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে রুক্ষ মরুপ্রান্তরের মধ্যে দিয়ে মিনিটদশেক চলার পরেই একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটে, যেটার বিষয় বলার আগে ক্রোলের অটোমোটেলের ভিতরটা কীরকম সেটা একটু বলা দরকার।

সামনে ড্রাইভারের পাশে দুজনের বসার জায়গা। তার ঠিক পিছনেই একটা সরু প্যাসেজের একদিকে একটা বাথরুম ও একটা স্টোররুম, আর অন্যদিকে একটা কিচেন ও একটা প্যানট্রি। প্যাসেজ থেকে বেরিয়েই দুদিকে দুটো করে বাঙ্ক— আপার ও লোয়ার। একজন অতিরিক্ত লোক থাকলে সে অনায়াসে দুদিকের বাঙ্কের মাঝখানে মেঝেতে বিছানা পেতে শুতে পারে।

গাড়ি চালাচ্ছিল ক্রোল, আর আমি বসে ছিলাম তার পাশে। পিছনে, লোয়ার বাঙ্কের একটায় বসে ছিল থর্নিক্রফ্‌ট, আরেকটায় ফিল্ডিং আর ডেক্সটার।

আমরা যখন বেরিয়েছি, তখন পৌনে সাতটা। আকাশে তখনও আলো রয়েছে। পথের দুধারে বালি আর পাথর। জায়গাটা মোটামুটি সমতল হলেও মাঝে মাঝে চুনা পাথরের টিলা বা টিলার সমষ্টি চোখে পড়ছে, তার মধ্যে এক একটা বেশ উঁচু।

প্রচণ্ড উৎকণ্ঠার মধ্যে মাঝে মাঝে আমাদের হোটেলের ম্যানেজার মি. নাহুমের মুখটা মনে পড়ছে, আর মনটা খচ খচ করে উঠছে। ভদ্রলোকের অতি অমায়িক আচরণটা আমার কাছে সন্দেহজনক বলে মনে হয়েছে— যেন তিনি কোনো একটা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

আকাশে সবে দু-একটা তারা দেখা দিতে শুরু করেছে, এমন সময় একটা আর্তনাদ, আর তার পরমুহূর্তেই একটা বিস্ফোরণের শব্দে স্টিয়ারিং-এ ক্রোলের হাতটা কেঁপে গিয়ে গাড়িটা প্রায় রাস্তার ধারে একটা খানায় পড়ছিল।

দুটো শব্দই এসেছে আমাদের গাড়ির পিছন দিক থেকে।

জায়গা ছেড়ে রুদ্ধশ্বাসে প্যাসেজ দিয়ে পিছনে এসে দেখি থর্নিক্রফ্‌টের হাতে রিভলভার, ডেক্সটার দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ফ্যাকাশে মুখ করে মেঝের দিকে চেয়ে আছে আর ফিল্ডিং যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে হতভম্বের মতো বসে আছে, তার চশমার কাচে কোনো তরল পদার্থের ছিটে লেগে তাকে যেন সাময়িকভাবে ধাঁধিয়ে দিয়েছে।

ডেক্সটারের দৃষ্টি যেখানে, সেখানে মাথা থেঁতলানো অবস্থায় পড়ে আছে আরেকটি গোখুরো। এর জাত কালকের গোখুরোর থেকে আলাদা। ইনিও মিশরের অধিবাসী। এঁর নাম স্পিটিং কোবরা। ইনি ছোবল না মেরে শিকারের চোখের দিকে তাগ করে বিষের থুথু দাগেন। এতে মৃত্যু না হলেও অন্ধত্ব অবধারিত। ফিল্ডিং বেঁচে গেছে তার চশমার জন্য। আর সাপবাবাজি মরেছেন থর্নিক্রফ্‌টের সঙ্গে হাতিয়ার ছিল বলে।

অটোমোটেল থামিয়ে ফিল্ডিং-এর পিছনে কিছুটা সময় দিতে হলো। বিষের ছিটে চশমার কাচের তলা দিয়ে বাঁ চোখের কোলে লেগেছিল, সেখানে আমার মিরাকিউরল অয়েন্টমেন্ট লাগিয়ে দিলাম।

ব্যাপারটা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। অভিশাপ টভিশাপ নয়; কেউ আমাদের পিছনে লেগেছে। আমরা যখন সরাইখানায় বসে কফি খাচ্ছিলাম সেই সময় গাড়ির জানালা দিয়ে সাপটাকে ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে এই কাজটা করেছে, সে নিশ্চয়ই কায়রো থেকেই এসেছে।

আবার যখন রওনা দিলাম তখন অন্ধকার নেমে এসেছে। বাওয়িতি এখান থেকে আরও একশো কিলোমিটার। ম্যাপে

তারপরে আর কোনো রাস্তার ইঙ্গিত নেই, তবে মোটামুটি সমতল জমি পেলে বালি পাথর অগ্রাহ্য করে এ গাড়ি এগিয়ে চলবে যদি সেটার প্রয়োজন হয়।

মিনিটদশেক চলার পর পথে একই সঙ্গে মানুষ ও জানোয়ারের সাক্ষাৎ মিলল।

একটি বছর পনেরোর ছেলে, হাতে লাঠি, এগিয়ে আসছে রাস্তা ধরে আমাদেরই দিকে, তার পিছনে একপাল গাধা।

আমাদের গাড়িটা দেখে হাঁটার গতি কমিয়ে হাতদুটোকে মাথার উপরে তুলে ঝাঁকাতে শুরু করল ছেলেটা।

'এস্টাপ, এস্টাপ, সহিব! এস্টাপ!'

ক্রোল বাধ্য হয়েই গাড়ি থামাল, কারণ পথ বন্ধ।

ব্যাপারটা কী? হেডলাইটের আলোতে ছেলেটির চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে, গাধাগুলোও যেন কেমন অস্থির।

হাতছানি দিয়ে আমাদের বাইরে বেরোবার ইঙ্গিত করাতে আমি থামলাম। ছেলেটি দৌড়ে এল আমার দিকে।

'পিরমিট, সহিব, পিরমিট!'

ছেলেটি যে প্রচণ্ড রকম উত্তেজিত সেটা তার ঘন ঘন নিশ্বাস আর চোখের চাহনি থেকেই বুঝতে পারছি। কিন্তু এখানে পিরামিড কোথায়?

জিজ্ঞেস করাতে সে সামনে বাঁয়ে দেখিয়ে দিল।

'ওগুলো তো পাহাড়— চুনোপাথরের পাহাড়। ওখানে পিরামিড কোথায়?'

ছেলেটি তবুও বার বার ওই দিকেই দেখায়।

'তার মানে ওগুলোর পিছনে?' ক্রোল জিজ্ঞেস করল। ছেলেটি মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল— হ্যাঁ, ওই পাহাড়গুলোর পিছনে।

আমি ক্রোলের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলাম। ইতিমধ্যে বাকি তিনজনও এসে জুটেছে। তাদের বললাম ব্যাপারটা। ফিল্ডিং বলল, 'আস্ক হিম হাউ ফার।'

জিজ্ঞেস করাতে ছেলেটি আবার বলল, টিলাগুলোর পিছনে। কত দূর সেটা জিজ্ঞেস করে লাভ নেই, কারণ আমি দেখেছি পৃথিবীর সব দেশেই অশিক্ষিত চাষাভুষোদের দূরত্ব সম্বন্ধে কোনো ধারণা থাকে না। অর্থাৎ পিরামিড এখান থেকে দু-কিলোমিটারও হতে পারে, আবার বিশ কিলোমিটারও হতে পারে।

'হিয়ার'—থর্নিক্রফ্‌ট পকেট থেকে কিছু খুচরো পয়সা বার করে ছেলেটার হাতে দিয়ে তার পিঠে একটা চাপড় মেরে বুঝিয়ে দিল—এবার তুমি প্রস্থান করো।

ছেলেটি মহা উল্লাসে পিরমিট পিরমিট করতে করতে গর্দভবাহিনী সমেত যে পথে যাচ্ছিল সে পথেই চলে গেল।

আমরা আবার রওনা দিলাম। আকাশে আলোকবিন্দুর সংখ্যা বাড়ছে, তবে চলমান বিন্দু এখনও কোনো চোখে পড়েনি। আমি জানি পিছনের কামরার তিনজনই জানলায় চোখ লাগিয়ে বসে আছে, বেচারা ক্রোলই শুধু রাস্তা থেকে চোখ তুলতে পারছে না।

মিনিট তিনেক যাবার পরই বাঁয়ে চোখ পড়তে দেখলাম, ছেলেটা খুব ভুল বলেনি।

টিলার আড়াল সরে যাওয়াতে সত্যিই একটা পিরামিড বেরিয়ে পড়েছে। সেটা কত দূর বা কত বড়ো তা বোঝার উপায় নেই, কিন্তু আকৃতি সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। লাইমস্টোনের রুক্ষ স্তূপগুলোর পাশে ওটা একটা পিরামিডই বটে।

ইজিপ্টের সব জায়গা দেখা না থাকলেও এটুকু জানি যে এখানে পিরামিড থাকার কথা নয়, আর ভুঁইফোঁড়ের মতো হঠাৎ গজিয়ে ওঠাটাও ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

ক্রোলই বলল যে রাস্তা খারাপ হোক না কেন, একবার কাছে গিয়ে জিনিসটা দেখে আসা দরকার। মহাকাশযান সত্যিই যদি আজ রাত্রেই এসে নামে, তা হলে তার সময় আছে এখনও প্রায় আট ঘণ্টা। আর, আকাশযান এলে আকাশে তার আলো তো দেখা যাবেই, কাজেই কোনো চিন্তা নেই।

অতি সন্তর্পণে বালি আর এবড়ো খেবড়ো পাথরের উপর দিয়ে অটোমোটেল এগিয়ে চলল পিরামিডের দিকে।

শ-খানেক মিটার যাবার পরই বুঝতে পারলাম যে মিশরের বিখ্যাত সমাধি সৌধগুলির তুলনায় এ পিরামিড খুবই ছোটো। এর উচ্চতা ত্রিশ ফুটের বেশি নয়।

আরও খানিকটা কাছে যেতে বুঝলাম পিরামিডটা পাথরের তৈরি নয়, কোনো ধাতুর তৈরি। ক্রোলের গাড়ির হেডলাইট পড়ে পিরামিডের গা থেকে একটা তামাটে আলো প্রতিফলিত হয়ে বাঁয়ের টিলাগুলোর উপর পড়ছে।

ক্রোল গাড়ি থামিয়ে হেডলাইট নিভিয়ে দিল। আমরা পাঁচজন নামলাম।

ফিল্ডিং এগোতে শুরু করেছে পিরামিডটার দিকে।

আমরা তাকে অনুসরণ করলাম।

ক্রোল আমার কানে ফিসফিস করে বলল, 'কিপ ইওর হ্যান্ড অন ইওর গান। দিস মে বি আওয়ার স্পেসশিপ'।

আমারও অবিশ্যি সেই কথাই মনে হয়েছে। গাড়ির ভিতর ছিলাম, তাই আকাশের সব অংশে চোখ রাখতে পারিনি। এই ফাঁকে কখন ল্যান্ড করে বসে আছে কে জানে।

সামনে ফিল্ডিং থেমে হাত তুলেছে। বুঝতে পারলাম কেন। শরীরে একটা উত্তাপ অনুভব করছি। সেটা স্পেসশিপটা থেকেই বেরোচ্ছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু এই নৈঃশব্দ্য কেন?

আলো নেই কেন?

নামবার কোনো শব্দ পাইনি কেন?

আর উত্তাপের কারণ কি এই যে এরা আমাদের কাছে আসতে দিতে চায় না?

কিন্তু না, তা তো নয়। উত্তাপ কমে আসছে দ্রুত বেগে।

আমরা আবার পা টিপে টিপে এগিয়ে চললাম পিরামিডের দিকে। মাথার উপরে আকাশ জুড়ে ছায়াপথ দেখা দিয়েছে। মরু অঞ্চলের রাতের আকাশ আমার চিরকালের বিস্ময়ের বস্তু।

'ওয়ান — থ্রি — সেভেন্ — ইলেভ্‌েন — সেভেনটিন — টোয়েন্টি থ্রি ....'

ফিল্ডিং মৌলিক সংখ্যা আওড়াতে শুরু করেছে। অবাক হয়ে দেখলাম পিরামিডের গায়ে অসংখ্য আলোকবিন্দুর আবির্ভাব হচ্ছে। ওগুলো আসলে ছিদ্র — স্পেসশিপের ভিতরে আলো জ্বলে উঠেছে, আর সেই আলো দেখা যাচ্ছে পিরামিডের গায়ে ছিদ্রগুলির ভিতর দিয়ে।

ফর্টি ওয়ান — ফর্টি সেভ্‌ন — ফিফ্‌টি থ্রি — ফিফ্‌টি নাইন .....'

এটা মানুষেরই কণ্ঠস্বর, তবে আমাদের পাঁচজনের মধ্যে কারুর নয়। এর উৎস ওই পিরামিড।

আমরা রুদ্ধশ্বাসে ব্যাপারটা দেখছি, শুনছি, আর উপলব্ধি করার চেষ্টা করছি।

এবার কথা শুরু হলো। —

'পাঁচ হাজার বছর পরে আবার আমরা তোমাদের গ্রহে এসেছি। তোমরা আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করো'।

ফিল্ডিং তার ক্যাসেট রেকর্ডার চালু করে দিয়েছে। ডেক্সটার ও ক্রোলের হাতে ক্যামেরা। কিন্তু এখনও ছবি তোলার মতো কিছু ঘটেনি।

আবার কথা। নিখুঁত ইংরাজি, নিখাদ উচ্চারণ, নিটোল কণ্ঠস্বর।

'তোমাদের গ্রহের অস্তিত্ব আমরা জেনেছি পঁয়ষট্টি হাজার বছর আগে। আমরা তখনই জানতে পারি যে তোমাদের গ্রহ ও আমাদের গ্রহের মধ্যে কোনো প্রাকৃতিক প্রভেদ নেই। এই তথ্য আবিষ্কার করার পর তখনই আমরা প্রথম তোমাদের গ্রহে আসি, এবং সেই থেকে প্রতি পাঁচ হাজার বছর এসেছি। প্রত্যেকবারই এসেছি একই উদ্দেশ্য নিয়ে। সেটা হলো পৃথিবীর মানুষকে সভ্যতার পথে কিছুদূর এগিয়ে দিতে সাহায্য করা। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে মহাকাশে আমাদের একটি পর্যবেক্ষণপোত এই পঁয়ষট্টি হাজার বছর ধরে পৃথিবীর অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখে আসছে। আমরা যখনই এখানে আসি, তখন পৃথিবীর অবস্থা জেনেই আসি। আমরা অনিষ্ট করতে আসি না। আমাদের কোনো স্বার্থ নেই। সাম্রাজ্যবিস্তার আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা কেবল মানুষের সমস্যার সমাধানের উপায় বাতলে দিয়ে আবার ফিরে যাই। আজকের মানুষ বলতে যা বোঝো, সেই মানুষ আমাদেরই সৃষ্টি, সেই মানুষের মস্তিষ্কের বিশেষ গড়নও আমাদেরই সৃষ্টি। মানুষকে কৃষিকার্য আমরাই শেখাই, যাযাবর মানুষকে ঘর বাঁধতে শেখাই। গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিজ্ঞান — পৃথিবীতে এসবের গোড়াপত্তন আমরাই করেছি, স্থাপত্যের অনেক সূত্র আমরাই দিয়েছি।'

'এই শিক্ষা মানুষ কীভাবে কাজে লাগিয়েছে তার উপর আমাদের কোনো হাত নেই। অগ্রগতির কিছু সূত্র নির্দেশ করার বেশি কিছু করা আমরা আমাদের কর্তব্য বলে মনে করিনি। মানুষকে আমরা যুদ্ধ শেখাইনি, স্বার্থের জন্য সাম্রাজ্যবিস্তার শেখাইনি, শ্রেণিভেদ শেখাইনি, কুসংস্কার শেখাইনি। এসবই তোমাদের মানুষের সৃষ্টি। আজ যে মানুষ ধ্বংসের পথে চলেছে, তার কারণই হলো মানুষ নিঃস্বার্থ হতে শেখেনি। যদি শিখত, তা হলে মানুষ নিজের সমস্যার সমাধান নিজেই করতে পারত। আজ আমরা তোমাদের হাতে যা তুলে দিতে এসেছি, তার সাহায্যে মানবজাতির আয়ু কিছুটা বাড়তে পারে। সেটা কী সেটা বলার আগে আমরা জানতে চাই তোমাদের কিছু জিজ্ঞাস্য আছে কি না।'

'আছে।'—চেঁচিয়ে উঠল ক্রোল।

'করো প্রশ্ন'।

'তোমরা মানুষেরই মতো দেখতে কি না সেটা জানার কৌতূহল হচ্ছে,' বলল ক্রোল। — 'তোমাদের গ্রহের আবহাওয়া যদি পৃথিবীর মতোই হয়, তা হলে তোমাদের একজনের বাইরে বেরিয়ে আসতে কোনো বাধা নেই নিশ্চয়ই।'

ক্রোল তার ক্যামেরা নিয়ে রেডি।

উত্তর এল—

'সেটা সম্ভব নয়'।

'কেন?' — ক্রোলের অবাক প্রশ্ন।

'কারণ এই মহাকাশযানে কোনো প্রাণী নেই।'

আমরা পাঁচজনেই স্তম্ভিত।

‘প্রাণী নেই?’ ফিল্ডিং প্রশ্ন করল, ‘তার মানে কি—?’

‘কারণ বলছি। একই বছরের মধ্যে একটি প্রলয়ংকর ভূমিকম্প ও একটি বিশাল উল্কাখণ্ডের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে আমাদের গ্রহ থেকে প্রাণী লোপ পায়। অবশিষ্ট আছে কয়েকটি গবেষণাগার ও কয়েকটি যন্ত্র—যার মধ্যে একটি হলো এই মহাকাশযান। দুর্যোগের দশ বছর আগে, দুর্যোগের পূর্বাভাস পেয়ে আমাদের বিজ্ঞানীরা পূর্বপরিকল্পিত পৃথিবী-অভিযানের সব ব্যবস্থা করে রেখে গিয়েছিলেন। এই অভিযান সম্ভব হয়েছে যন্ত্রের নির্দেশে। আমি নিজে যন্ত্র। এই আমাদের শেষ অভিযান।’

এবার আমি প্রশ্ন করলাম।

‘তোমাদের এই শেষ অভিযানের উদ্দেশ্য কী জানতে পারি?’

‘বলছি শোনো,’ উত্তর এল পিরামিডের ভিতর থেকে।—‘তোমাদের চারটি সমস্যার সমাধান দিয়ে যাচ্ছি আমরা। এক—ইচ্ছা মতো আবহাওয়া বদলানো—যাতে খরা বা বন্যা কোনোটাই মানুষের ক্ষতি না করতে পারে। দুই—শহরের দূষিত বায়ুকে শুদ্ধ করার উপায় । তিন—বৈদ্যুতিক শক্তির বদলে সূর্যের রশ্মিকে যৎসামান্য ব্যয়ে মানুষের ব্যাপক কাজে লাগানোর উপায়; এবং চার—সমুদ্রগর্ভে মানুষের বসবাস ও খাদ্যোৎপাদনের উপায়। যে হারে পৃথিবীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, আর পাঁচশো বছর পরে শুকনো ডাঙায় আর মানুষ বসবাস করতে পারবে না। .... এই চারটি সূত্র ছাড়াও, শুধু মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য, পৃথিবীর গত পঁয়ষট্টি হাজার বছরের বিবরণ আমরা দিয়ে যাচ্ছি তোমাদের।’

‘সূত্র এবং বিবরণ কি লিখিতভাবে রয়েছে?’ প্রশ্ন করল ফিল্ডিং।

হ্যাঁ। তবে লেখার ব্যাপারে মিনিয়েচারাইজেশনের সাহায্যে নেওয়া হয়েছে। সাত বছর আগে আমাদের গ্রহে দুর্ঘটনার পর থেকে পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। আশা করি এই ক’ বছরে মিনিয়েচারাইজেশনে তোমরা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছ?’

‘হয়েছি বই কী!’ বলে উঠল ক্রোল। ‘গণিতের জটিল অঙ্কের জন্য আমরা এখন যে ক্যালকুলেটর ব্যবহার করি, তা একটা মানুষের হাতের তেলোর চেয়ে বড়ো নয়।’

‘বেশ। এবার লক্ষ করো, মহাকাশযানের গায়ে একটি দরজা খুলে যাচ্ছে।’

দেখলাম, জমি থেকে মিটারখানেক উপরে পিরামিডের দেয়ালে একটা ত্রিকোণ প্রবেশদ্বারের আবির্ভাব হলো।

যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর বলে চলল —

‘মহাকাশযানের ভিতরে একটি টেবিল ছাড়া আর কোনো আসবাব নেই। সেই টেবিলের উপর একটি স্বচ্ছ আচ্ছাদনের নীচে যে বস্তুটি রয়েছে, তাতেই পাওয়া যাবে চারটি সমস্যার সমাধান ও পৃথিবীর গত পঁয়ষট্টি হাজার বছরের ইতিহাস। তোমাদের মধ্যে থেকে যে কোনো একজন প্রবেশদ্বার দিয়ে ঢুকে আচ্ছাদন তুলে বস্তুটিকে নিয়ে বেরিয়ে আসামাত্র মহাকাশযান ফিরতি পথে রওনা দেবে। তবে মনে রেখো, সমাধানগুলি সমগ্র মানবজাতির মঙ্গলের জন্য; এই বস্তুটি যদি কোনো স্বার্থপর ব্যক্তির হাতে পড়ে, তা হলে—’

কণ্ঠস্বর থেমে গেল।

কারণ কথার মাঝখানেই চোখের পলকে আমাদের সকলের অজান্তে অন্ধকার থেকে একটি মানুষ বেরিয়ে এসে তিরবেগে মহাকাশযানে প্রবেশ করে, আবার তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে এসে অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। পরমুহূর্তে দেখলাম, ত্রিকোণ প্রবেশদ্বারটি বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে একটা গগনভেদী হাহাকারের মতো শব্দ করে পিরামিড মিশরের মাটি ছেড়ে শূন্যে উত্থিত হলো।

আমরা পাঁচ হতভম্ব অভিযাত্রী অপরিসীম বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলাম একটি চতুষ্কোণ জ্যোতি ছায়াপথের অগণিত নক্ষত্রের ভিড়ে মিলিয়ে যাচ্ছে।

একটা গাড়ি স্টার্ট দেবার শব্দে আমরা সকলে আবার সংবিৎ ফিরে পেলাম।

গাড়িটা আমাদের না। শুনে মনে হচ্ছে জিপ, এবং সেটা রওনা দিয়ে দিয়েছে।

'কাম অ্যালং!'—চাবুকের মতো আদেশ এল ক্রোলের কাছ থেকে। সে তার অটোমোটেলের দিকে ছুটেছে।

এক মিনিটের মধ্যে আমাদের গাড়িও ছুটে চলল রুক্ষ মরুভূমির উপর দিয়ে।

কোন দিকে গেল জিপ? রাস্তায় গিয়ে তো উঠতেই হবে তাকে। শেষপর্যন্ত একটা কানফাটা সংঘর্ষের শব্দ, ও ক্রোলের গাড়ির তীব্র হেডলাইট জিপটার হদিস দিয়ে দিল। হেডলাইট না জ্বালিয়েই মরিয়া হয়ে ছুটে চলেছিল সেটা, আর তার ফলেই জমিতে পড়ে থাকা প্রস্তরখণ্ডের সঙ্গে সজোর সশব্দ সংঘাত।

আর তাড়া নেই, তাই সাবধানে চালিয়ে নিয়ে গিয়ে ক্রোল তার গাড়িটাকে জিপের দশ হাত দূরে দাঁড় করাল। আমরা পাঁচজনে নেমে এগিয়ে গেলাম।

জিপের দফা শেষ। সেটা উলটে কাত হয়ে পড়ে আছে বালি ও পাথরের মধ্যে, আর তার পাশে রক্তাক্ত দেহে পড়ে আছে দুজন লোক। একজন স্থানীয়, সম্ভবত গাড়ির চালক, আর অন্যজন— থর্নিক্রফ্‌টের টর্চের আলোয় চেনা গেল তাকে—হলেন

মার্কিন ধনকুবের ও শখের প্রত্নতত্ত্ববিদ গিডিয়ন মর্গেনস্টার্ন।

সাপ ও শকুনের রহস্য মিটে গেল। কার্নাক হোটেলের ম্যানেজার নাহুমের সঙ্গে এনার ষড় ছিল নিঃসন্দেহে। স্বার্থান্বেষণের পথে যাতে কোনো বাধা না আসে, তাই আমাদের হটাবার জন্য এত তোড়জোড়। এটা বেশ বুঝতে পারছি যে মর্গেনস্টার্নের মৃত্যু হয়েছে প্রাচীন মিশরের কোনো দেবতার অভিশাপে নয়; তার উপর অভিশাপ বর্ষণ করেছে ছায়াপথের একটি বিশেষ নক্ষত্রমণ্ডলে অবস্থিত একটি বিশেষ গ্রহ।

'লোকটার পকেটে ওটা কী?'

ক্রোল এগিয়ে গিয়ে মর্গেনস্টার্নের পকেট থেকে একটি জীর্ণ কাগজের টুকরো টেনে বার করল। সেটা যে মেনেফ্রুর প্যাপাইরাসের ছেঁড়া অংশ সেটা আর বলে দিতে হয় না।

কিন্তু এ ছাড়াও আরেকটা জিনিস আমরা লক্ষ করেছি।

মর্গেনস্টার্নের মুঠো করা ডান হাতটা বালির উপর পড়ে আছে, আর সেই মুষ্টিবদ্ধ হাতের আঙুলের ফাঁক দিয়ে একটা নীল আভা বেরিয়ে পাশের বালির উপর পড়েছে।

ফিল্ডিং এগিয়ে গিয়ে মুঠোটা খুলল।

এই কি সেই বস্তু, যার মধ্যে ধরা রয়েছে মানবজাতির চারটি প্রধান সংকটের সমাধান, আর পৃথিবীর পঁয়ষট্টি হাজার বছরের ইতিহাস?

ফিল্ডিং তার ডান হাতের তর্জনী আর বুড়োআঙুলের মধ্যে ধরে আছে একটি দেদীপ্যমান প্রস্তরখণ্ড, যার আয়তন একটি মটরদানার অর্ধেক।

২৭শে নভেম্বর, গিরিডি

এই আশ্চর্য পাথরের টুকরোর মধ্যে কী করে এত তথ্য লুকিয়ে থাকতে পারে, সেটা যদি কেউ বের করতে পারে তো আমিই পারব, এই বিশ্বাসে আমার চার বন্ধু সেটা আমাকেই দিয়ে দিয়েছে। আমি গত দু-সপ্তাহ ধরে আমার গবেষণাগারে অজস্র পরীক্ষা করেও এটার রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারিনি। আমি বুঝেছি আরো সময় লাগবে, কারণ আমাদের বিজ্ঞান এখনও এতদূর অগ্রসর হয়নি।

পাথরটা আপাতত আমার ডান হাতের অনামিকায় একটি আংটির উপর বসানো রয়েছে। রাতের অন্ধকারে যখন বিছানায় শুয়ে এটার দিকে দেখি, তখন এই অপার্থিব রত্নখণ্ড থেকে বিচ্ছুরিত নীলাভ আলো আমাকে আজীবন অক্লান্ত গবেষণার সাহায্যে মানুষের মনের অন্ধকার দূর করার প্রেরণা জোগায়।

আনন্দমেলা। পূজাবার্ষিকী ১৩৮৬

স্বর্ণপর্ণী

১৬ জুন

আজ আমার জন্মদিন। হাতে বিশেষ কাজ নেই, সকাল থেকে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, আমি বৈঠকখানায় আমার প্রিয় আরামকেদারাটায় বসে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে আকাশপাতাল ভাবছি। বৃদ্ধ নিউটন আমার পায়ের পাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে ঘুমোচ্ছে। ওর বয়স হলো চব্বিশ। বেড়াল সাধারণত চোদ্দো-পনেরো বছর বাঁচে; যদিও কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিশ বছর বেঁচেছে এমনও শোনা গেছে। নিউটন যে এত বছর বেঁচে আছে, তার কারণ হলো আমার তৈরি ওষুধ মার্জারিন। নিউটনকে ছাড়া আমি যে কত একা হয়ে পড়ব সেটা ভেবেই আমি অনেক গবেষণার পর আজ থেকে দশ বছর আগে এই ওষুধটা তৈরি করি।

আমি বললাম আকাশপাতাল ভাবছি, কিন্তু আসলে ভাবছি পুরোনো দিনের কথা— এই বয়সে যেটা স্বাভাবিক। পঞ্চাশ-বাহান্ন বছর আগে আমাকে লেখা বাবার চিঠিগুলো আমি কালই পড়ছিলাম। সেগুলোর কথা ভেবেই মনটা অতীতের দিকে চলে যাচ্ছে। নানা কারণে বেশ প্রসন্ন বোধ করছি। সাফল্যের স্বাদ আমি পেয়েছি আমার জীবনে তাতে সন্দেহ নেই। কোনও ভারতীয় বিজ্ঞানী দেশেবিদেশে এত সম্মান পেয়েছে বলে তো মনে হয় না। আমার খ্যাতি প্রধানত ইনভেন্টর বা আবিষ্কারক হিসাবে। এ ব্যাপারে টমাস অ্যালভা এডিসনের পরেই যে আমার স্থান, সেটা পাঁচটি মহাদেশেই স্বীকৃত হয়েছে। আমার ইনভেনশনের একটা তালিকা মনে মনে তৈরি করছিলাম। প্রথম হলো মিরাকিউরল, বা সর্বরোগনাশক বড়ি (এটা আবিষ্কারের কৃতিত্ব কেন আমি একা দাবি করতে পারি না, সেটা যথাস্থানে বলব)।

মিরাকিউরলের পরে এল অ্যানাইহিলিন পিস্তল। আমার অ্যাডভেঞ্চারপূর্ণ জীবনে আমাকে অনেকবারই চরম সংকটে পড়তে হয়েছে। আত্মরক্ষার জন্য একটা অস্ত্রের প্রয়োজন, অথচ আমি রক্তপাত সহ্য করতে পারি না। তাই এই পিস্তল, যা শত্রুকে নিহত না করে নিশ্চিহ্ন করে।

এরপরে এল এয়ারকন্ডিশনিং পিল— যা জিভের তলায় রাখলে শরীর শীতকালে গরম আর গ্রীষ্মকালে ঠান্ডা রাখে। তারপর লুপ্ত স্মৃতি ফিরিয়ে আনার জন্য রিমেমব্রেন; ঘুমের অব্যর্থ বড়ি সমনোলিন; অতি সস্তায় উজ্জ্বল আলো দেবার জন্য লুমিনিম্যাক্স; অচেনা ভাষা ইংরাজিতে অনুবাদ করার জন্য লিঙ্গুয়াগ্রাফ; পাখিকে শিক্ষা দেবার জন্য অর্নিথন...আর কত বলব?

মিরাকিউরল আবিষ্কার হয় আমার যৌবনে। এই ওষুধকে ঘিরে বেশ কিছু আশ্চর্য ঘটনা ঘটে, যার কোনো সম্পূর্ণ লিখিত বিবরণ নেই, কারণ তখন ডায়রি লিখতে শুরু করিনি। আমার স্ফটিকস্বচ্ছ স্মৃতির উপর নির্ভর করে আজ সেইসব ঘটনার বিষয়ে লিখব; তবে সেটা করার আগে আমার বাবার বিষয়ে কিছু বলা দরকার।

বাবার নাম ছিল ত্রিপুরেশ্বর শঙ্কু। গিরিডির অপ্রতিদ্বন্দ্বী চিকিৎসক ছিলেন তিনি। আয়ুর্বেদিক মতে চিকিৎসা করতেন, লোকে বলত ধন্বন্তরি। বাবা স্বভাবতই রোজগার করেছিলেন অনেক, কিন্তু যতটা করতে পারতেন ততটা নয়; কারণ পেশাদারি প্র্যাকটিস ছাড়াও উনি সারাজীবন বিনা পয়সায় বহু দরিদ্র রোগীর চিকিৎসা করেছেন। আমাকে বলতেন, 'ক্ষমতা আছে বলেই যে

অঢেল উপার্জন করতে হবে তার কোনো মানে নেই। সচ্ছল জীবনযাপনের জন্য অর্থের প্রয়োজন ঠিকই, আর তাতে মানসিক শান্তির পথ সহজ হয়ে যায়; কিন্তু যাদের সে সংস্থান নেই, সুখে থাকা কাকে বলে যারা জানে না, সারা জীবন যারা দু'বেলা দু'মুঠো ভাতের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, বা যারা দৈবদুর্বিপাকে উপার্জনে অক্ষম— তাদের দুঃখ যদি কিছুটা লাঘব করতে পারিস, তার চেয়ে বড়ো সার্থকতা, তার চেয়ে বড়ো আনন্দ, আর কিছুতে নেই।'

বাবার এই কথাগুলো আমার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল।

আমি গিরিডির ইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতায় যাই কলেজে পড়তে। আমি নিজেই বলছি, ছাত্র হিসাবে আমি ছিলাম যাকে বলে ব্রিলিয়ান্ট। শুধু যে জীবনে কোনোদিন সেকেন্ড হইনি তা নয়, এত কম বয়সে বিদ্যায় বুদ্ধিতে এতটা অগ্রসর হবার উদাহরণও বিরল। বারো বছর বয়সে ম্যাট্রিক পাশ করি; চোদ্দোয় আই. এস-সি, আর ষোলোয় ফিজিক্স কেমিস্ট্রিতে ভালো অনার্স নিয়ে বি. এস-সি।

পরীক্ষার পাট শেষ করে গিরিডিতে ফিরে এলে বাবা বলেন, 'এত কচি বয়সে তুই আর চাকরির কথা ভাবিস না। অ্যাদ্দিন তো বিজ্ঞান পড়লি। এবার বছরচারেক অন্য বিষয় নিয়ে পড়্। শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন—বিষয়ের কি অভাব আছে? বই এখানে না পাওয়া গেলে, কী চাই বললেই আমি কলকাতা থেকে আনিয়ে দেব।' তারপর একটু ভেবে বললেন, 'তুই যদি চাকরিবাকরি না করে বাকি জীবনটা শুধু রিসার্চেই কাটিয়ে দিতে চাস, তাতেও আমার আপত্তি নেই। তুই আমার একমাত্র সন্তান। আমি চলে গেলে আমি যা সঞ্চয় করেছি তার একটা অংশ ব্যয় হবে লোকহিতকর কাজে; বাকি সবটাই তুই পাবি। কাজেই—।' আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'না, বাবা। তোমার কথামতো আমি চার বছর নানা বিষয় নিয়ে পড়াশুনো করব ঠিকই, কিন্তু তারপরে আমাকে রোজগারের পথ দেখতেই হবে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পারলে আমি শান্তি পাব না।' বাবা বললেন, 'বেশ, ভাল কথা। কিন্তু রোজগার যেভাবেই করিস না কেন, যারা দরিদ্র, যারা নিরক্ষর, যারা মাথা উঁচু করে চলতে পারে না, তাদের কথা ভুলিস না।'

বিশ বছর বয়সে কলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজে আমি পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপকের কাজ পাই। যাদের পড়াতাম তাদের বেশ কয়েকজন আমারই বয়সি। এমনকী, দু-একজনের বয়স আমার চেয়ে বেশি। কিন্তু সেজন্য আমাকে কোনোদিন ছাত্রদের টিটকিরি ভোগ করতে হয়নি। তার কারণ, এত কম বয়সেও আমার মধ্যে একটা স্বাভাবিক গাম্ভীর্য এসে গিয়েছিল।

গ্রীষ্ম এবং পুজোর ছুটিতে আমি বাড়ি আসতাম। চাকরি নেবার ঠিক আড়াই বছর পরে একদিন গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ি এসে চাকরের হাতে মাল তুলে দিয়ে বাবার ঘরে গিয়ে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখে মুহূর্তের জন্য আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল।

বাবা তাঁর কাজের টেবিলের পাশে মেঝেতে চিত হয়ে পড়ে আছেন।

আমি এক লাফে এগিয়ে ঝুঁকে পড়ে বাবার নাড়ী টিপে বুঝলাম তিনি সংজ্ঞা হারিয়েছেন, তার বেশি কিছু নয়। আমি তৎক্ষণাৎ চাকরকে ডাঃ সর্বাধিকারীকে ডাকার জন্য পাঠিয়ে দিলাম।

ডাক্তার আসার আগেই বাবার জ্ঞান ফিরে এল। আমি বাবাকে ধরে নিয়ে তক্তপোশে শুইয়ে দিলাম। অদ্ভুত লাগছিল, কারণ বাবাকে এর আগে কোনওদিন অসুস্থ দেখিনি। বাবা আমার দিকে চেয়ে ম্লান হাসি হেসে বললেন, 'এই প্রথম না রে তিলু, এর আগে আরও দু'বার ও জিনিস হয়েছে, তোকে বলিনি।'

'এটা কেন হয়, বাবা?'

'অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। এর কোনও চিকিৎসা নেই। এ রোগেই একদিন ফস করে চলে যাব।'

পরে জেনেছিলাম বাবার এই রোগকে বলে হার্টব্লক। হার্টব্লকে যাতে মানুষ না মরে, তার ব্যবস্থা আজকাল হয়েছে। পেসমেকার বলে ব্যাটারিচালিত একটা ছোট্ট চতুষ্কোণ যন্ত্র রোগীর বুকে অস্ত্রোপচার করে শরীরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। হার্টের স্পন্দন যাতে স্বাভাবিকভাবে চলতে থাকে সে কাজটা এই যন্ত্রই করে।

দেড় বছর পরে আমি পুজোর ছুটিতে বাড়ি আসার তিন দিন পরে হার্টব্লকেই পঞ্চাশ বছর বয়সে বাবা মারা যান। আমি যেদিন এলাম, সেদিনই রাত্রে বাবা আমাকে একটা আশ্চর্য ঘটনা বলেন।

রাত্রে খাবার পরে দু'জনে একসঙ্গে বৈঠকখানায় বসে আছি এমন সময় বাবা বললেন, 'টিক্‌ড়ীবাবার নাম শুনেছিস?'

'যিনি উশ্রীর ওপারে একটা গ্রামে গাছতলায় বসে ধ্যান করেন?'

'হ্যাঁ। বেশ নামডাক এ অঞ্চলে। বহুলোক দর্শনের জন্য যায়। সেই টিক্‌ড়ীবাবাকে তাঁর কয়েকজন শিষ্য গত পরশু আমার কাছে এনে হাজির করে। যা বোঝা গেল, বাবা শ্বাসকষ্টে ভুগছেন, তার জন্য আমি যদি কোনো ওষুধ দিতে পারি, তা হলে বাবা অত্যন্ত তুষ্ট হবেন।'

'আমি শিষ্যদের ওষুধ বাতলে দিচ্ছি, এমন সময় বাবা হঠাৎ বাংলা হিন্দি মিশিয়ে বললেন, 'তুই হামার চিকিৎসা করছিস, লেকিন তোর পীড়ার কী হবে?' বাবা কী করে টের পেলেন জানি না। যাই হোক—আমি বাবাকে বুঝিয়ে বললাম যে, আমার পীড়ার কোনও চিকিৎসা হয় না। 'জরুর হোতা!' হাঁপের মধ্যে চেঁচিয়ে বললেন বাবাজি। —'সোনেপত্তীর নাম শুনেছিস?'

'আমি বুঝলাম বাবা স্বর্ণপর্ণীর কথা বলছেন। গাছ নয়, গাছড়া। চরকসংহিতায় নাম পেয়েছি, কিন্তু আধুনিক যুগে এই গাছড়ার হদিশ কেউ পায়নি। সে কথা বাবাজিকে বলতে তিনি বললেন, ''আমি জানি সে গাছ কোথায় আছে। যুবা বয়সে আমি যখন কাশীতে থাকতাম, তখন আমার একবার খুব কঠিন পাণ্ডুরোগ হয়। আমার গুরুর কাছে সোনেপত্তীর পাতা ছিল। দুটো শুকনো পাতা গুঁড়িয়ে দুধের সঙ্গে মিশিয়ে আমাকে খাইয়ে দেন। রাতমে সোনে কা পহলে গটগট পী লিয়া, আউর সুবহ—রোগ গায়ব! উপ্‌শম! —যদি এই গাছ পেতে চাস, তা হলে চলে যা কসৌলি। সেখান থেকে তিন কোশ উত্তরে আছে একটা চামুণ্ডার

মন্দিরের ভগ্নাবশেষ। সেই মন্দিরের পিছনে জঙ্গল, সেই জঙ্গলে এক ঝরনা, সেই ঝরনার পাশে গজায় সোনেপত্তীর গাছ। তোর পীড়ায় ওই এক দাওয়াই কাজ দেবে, আর কোনো দাওয়াই দেবে না।"

'এককালে কত জায়গায় না গেছি গাছগাছড়ার অনুসন্ধানে। কিন্তু নাউ ইট্‌স টু লেট।'

আমি টিক্‌ড়ীবাবার এই আশ্চর্য কাহিনি শুনেই মনস্থির করে ফেলেছিলাম। বললাম, 'তুমি যাবে না বলে কি আমিও যেতে পারি না? আমি কালই কসৌলির উদ্দেশে রওনা দেব। কী বলা যায়—বাবাজির কথা তো সত্যিও হতে পারে। আর তুমি যখন বলছ চরকসংহিতায় এই স্বর্ণপর্ণীর উল্লেখ রয়েছে...'

বাবা একটা শুকনো হাসি হেসে মাথা নেড়ে বললেন, 'না রে তিলু, এখন যাস না। কালকা থেকে যেতে হয় কসৌলি—সে কি কম দূর? যেতে আসতে পাঁচ-সাতদিন তো লাগবেই। ফিরে এসে হয়তো দেখবি আমি আর নেই। এখন যাস না।'

দু'দিন পরে সেই হার্টব্লকেই বাবার মৃত্যু প্রমাণ করে দিল যে, তাঁর আশঙ্কা অমূলক ছিল না।

বাবার অসুখে প্রয়োগ না করতে পারলেও, আমি স্থির করেছিলাম যে স্বর্ণপর্ণীর খোঁজে আমাকে কসৌলি যেতেই হবে। বাবার শ্রাদ্ধের পরেও আমার কলেজ খুলতে আরও দু'-সপ্তাহ বাকি ছিল। আমি আর সময় নষ্ট না করে কসৌলির উদ্দেশে রওনা হলাম। কালকা থেকে ছেচল্লিশ কিলোমিটার দূরে সাড়ে ছ' হাজার ফুট উঁচুতে ছোট্ট শহর কসৌলি। কালকা থেকে ট্যাক্সি করে যেতে হয়। শুনেছি খুব স্বাস্থ্যকর স্থান।

আড়াই দিন লাগল গিরিডি থেকে কালকা পৌঁছোতে।

বাবার অকালমৃত্যুতে মনটা ভারী হয়ে ছিল, পাহাড়ের গায়ে নিরিবিলি সুদৃশ্য শহরটায় পৌঁছে খানিকটা হালকা বোধ করলাম।

একটা সস্তা হোটেলে উঠে আর সময় নষ্ট না করে সোজা ম্যানেজার নন্দকিশোর রাওয়ালকে জিজ্ঞেস করলাম চামুণ্ডার মন্দিরের কথা জানেন কি না। 'জানি বই কী', বললেন ভদ্রলোক, 'তবে সেখানে যেতে হলে ঘোড়ায় চড়ে যেতে হবে, কারণ ঘোড়ায় চলা পথের ধারেই পড়ে মন্দিরটা।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম মন্দিরের পিছনে কোনো জঙ্গল আছে কি না। 'আছে,' বললেন ভদ্রলোক, 'বেশ গভীর জঙ্গল।'

ঘোড়ার ব্যবস্থা নন্দকিশোরই করে দিলেন। এই প্রথম অশ্বারোহণের অভিজ্ঞতা, তবে দেখলাম আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না, বরং বেশ মজাই লাগছে। আমার সঙ্গে ঘোড়ার মালিক ছোটেলালও চলছিল আরেকটা ঘোড়ায়; গন্তব্যস্থলে পৌঁছোতে আমি তাকে বললাম, 'তোমাকে হয়তো ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করতে হবে; আমার এই জঙ্গলে একটু কাজ আছে।'

'একেলা মৎ যাইয়ে, বাবুজি', বলল ছোটেলাল, 'শের-উর হ্যায় জঙ্গলমে।'

'তুমি কি আমার সঙ্গে আসতে চাও?'

'হাঁ, বাবুজি।'

ঘোড়া দুটোকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে আমরা দু'জন জঙ্গলে ঢুকলাম। আমি কী খুঁজছি জিজ্ঞেস করাতে আমি সোনেপত্তীর নাম বললাম। ছোটেলাল বলল ও নাম সে কস্মিনকালেও শোনেনি।

মিনিট পনেরো যেতে না যেতেই একটা কুলকুল শব্দ পেলাম। শব্দ অনুসরণ করে পা চালিয়ে এগিয়ে যেতে তিন মিনিটের মধ্যেই ঝরনাটা দেখতে পেলাম। চারিদিক ঘন পাতাওয়ালা গাছের ছায়ায় অন্ধকার, কেবল একটা জায়গায় পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো এসে মাটিতে পড়েছে থিয়েটারের স্পটলাইটের মতো, আর সেই স্পটলাইটে ঝলমল করছে এককোমর উঁচু হলদে পাতায় ভরা একটা গাছড়া। এটাই যে স্বর্ণপর্ণী তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আমার মনটা নেচে উঠল। এত অল্প সময়ে আমার অভিযান সফল হবে সেটা ভাবতে পারিনি। কিন্তু এখানে তো দেখছি মাত্র একটা গাছ। খুঁজলে আরো বেরোবে কি?

প্রায় পনেরো মিনিট ধরে খুঁজেও আর কোনো স্বর্ণপর্ণীর সন্ধান না পেয়ে আমরা ঝরনার ধারে ফিরে এলাম। গাছ পেলে কী করব সেটা আগে থেকেই স্থির করে রেখেছিলাম। সঙ্গে চটের থলিতে কসৌলির বাজার থেকে কেনা একটা কোদাল ছিল। সেটা থলি থেকে বার করে কাজে লেগে গেলাম। উদ্দেশ্য—গাছড়াটাকে শিকড়সুদ্ধ তুলে আমার সঙ্গে গিরিডিতে নিয়ে আসব।

আমাকে কোদাল চালাতে দেখে ছোটেলাল 'আরে রাম রাম!' —বলে আমার অপটু হাত থেকে কোদালটা ছিনিয়ে নিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে শিকড়সুদ্ধ গাছড়াটা আমার হাতে তুলে দিল।

তিন দিন পরে গিরিডিতে ফিরে এসে প্রথমেই আমার মালি হরকিষণকে ডেকে পাঠালাম। সে এলে পর তার সামনে গাছড়াটা তুলে ধরে বললাম, 'এ জিনিস দেখেছ কখনো?'

'কভি নেহি,' ভ্রূকুটি করে মাথা নেড়ে বলল হরকিষণ।

আমি বললাম, 'তুমি এক্ষুনি এটাকে বাগানের একপাশে পুঁতে ফেলে এর পরিচর্যা শুরু করো।'

হরকিষণ স্বর্ণপর্ণীটাকে হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল এ থেকে দাওয়াই হয় কি না। আমি বললাম, 'বঢ়িয়া দাওয়াই।'

'তব তো এক পেড় সে নেহি হোগা, বাবুজি।'

'এ থেকে আরও গাছ গজায় এমন ব্যবস্থা তুমি করতে পার?'

মালি বলল, 'এ গাছের ডালের একটা বিশেষ অংশে সেটাকে ভেঙে নিয়ে টুকরোটা মাটিতে পুঁতে তাকে তোয়াজ করলে তা থেকে নিশ্চয়ই আরেকটা গাছ গজাবে।'

'তুমি তাই করো,' বললাম আমি।

ওষুধ যখন এনেছি, তখন তার দৌড়টা একবার যাচাই করে দেখা দরকার। টিক্‌ড়ীবাবার গাছের সন্ধানে যখন ভুল ছিল না, তখন অনুমান করা যেতে পারে পাণ্ডুরোগ সারার ঘটনাটাও সত্যি।

যাবার আগে শুনে গিয়েছিলাম যে, আজন্ম গিরিডিবাসী উকিল জয়গোপাল মিত্র গুরুতরভাবে অসুস্থ। উনি বাবার পেশেন্ট ছিলেন; ওঁর স্ত্রীকে আমি মাসিমা বলি। ফোন করে জানলাম মিত্রমশাইয়ের উদরি হয়েছে, যাকে ইংরিজিতে বলে অ্যাসাইটিস। 'আমি চোখে অন্ধকার দেখছি রে, তিলু!' বললেন জয়ন্তীমাসিমা। 'ডাক্তারেরা সবাই জবাব দিয়ে গেছে।'

আমি স্বর্ণপর্ণীর কথা বলতে উনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'এত ওষুধই তো পড়ল, আরেকটা পড়লে আর ক্ষতি কী?' বুঝলাম তিনি খুব একটা আশ্বস্ত হয়েছেন তা নয়।

তাও আমি সেদিনও সন্ধ্যাবেলা গেলাম মিত্রমশাইয়ের বাড়িতে, সঙ্গে একটা কাগজের মোড়কে গুঁড়ো করা দুটো স্বর্ণপর্ণীর পাতা। 'আধ কাপ দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খাইয়ে দিন, মাসিমা। আমি কাল সকালে এসে খোঁজ নেব।'

উৎকণ্ঠায় রাত্রে ভাল ঘুম হলো না।

সকালে বৈঠকখানায় এসে বসেছি, চাকর দুখি চা এনে সামনের টেবিলে রেখেছে, এমন সময় টেলিফোনটা বেজে উঠল। আমি এক লাফে উঠে গিয়ে ফোনটা তুলে 'হ্যালো' বলতেই জয়ন্তীমাসিমার 'তিলু!' চিৎকারে ফোনটা কান থেকে ইঞ্চিখানেক সরিয়ে নিতে হলো। 'তিলু, বাবা তিলু! এসে দেখে যাও—যমের দোর থেকে ফিরে এসেছেন তোমার মেসো!'

তাড়াহুড়ো করে কিছু করব না এটা আমি আগেই ঠিক করেছিলাম। তবে মিত্রমশাইয়ের আরোগ্যের পরে যে আমার ওষুধের খবর গিরিডির চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে, এটা আমি আন্দাজ করেছিলাম। ফলে, চাই বা না চাই, আমাকে কিছু দুরারোগ্য ব্যারামের চিকিৎসা করতে হয়েছিল। বলা বাহুল্য, সব ক্ষেত্রেই আমার ওষুধ কাজ করেছিল। এই আশ্চর্য ওষুধ কী করে পেলাম সে প্রশ্ন অবিশ্যি আমাকে বহুবার শুনতে হয়েছে। উত্তরে প্রতিবারই আমি একই মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছি : বাবা মারা যাবার আগে এ ওষুধ আমাকে দিয়ে যান; কোথায় পাওয়া, কী নাম, তা জানি না।

ইতিমধ্যে আমার মালির অধ্যবসায়ের ফলে আমার বাগানের দক্ষিণ দিকে দেয়ালের সামনে মাটিতে এগারোটা স্বর্ণপর্ণী শোভা পাচ্ছে। প্রত্যেকটিতেই প্রতি বছর নতুন করে পাতা গজাবে, তাই সাপ্লাইয়ের অভাব হবে বলে মনে হয় না।

এমন যদি ধারণা দিয়ে থাকি যে, আমি এখন কলকাতার কলেজে অধ্যাপনা ছেড়ে পুরোপুরি ডাক্তারিতে লেগে গেছি, তা হলে সেটা শুধরোনো দরকার। অধ্যাপনা পুরোদস্তুর চলছে। কলকাতায় এখনও কেউ স্বর্ণপর্ণীর কথা জানে না, কারণ আমি কাউকে কিছু বলিনি। তবে হঠাৎ যদি চেনাশোনার মধ্যে শুনি কেউ কঠিন ব্যারামে মরণাপন্ন, তা হলে যাতে তাকে দিতে পারি সেজন্য আমার সঙ্গে সব সময়ই গোটা বারো পাতা থাকে।

একটা ব্যাপারে আমার একটু খুঁতখুঁতেমি ছিল; শুকনো পাতা গুঁড়িয়ে দুধে মিশিয়ে খাওয়ানোর প্রাচীন পন্থাটা আমার ভাল লাগছিল না। আমি ঠিক করলাম স্বর্ণপর্ণীর বড়ি তৈরি করব।

এক মাসের মধ্যেই আমার পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত হলো। আমার পঁচিশ বছরের জন্মদিনে গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়িতে বসে কলের হাতল ঘোরাচ্ছি, আর কলের নীচের দিকে নল দিয়ে বড়ির পর বড়ি বেরিয়ে টপ টপ করে একটা বাটিতে পড়ছে, এমন সময় বিদ্যুৎঝলকের মতো এই ওষুধের একটা নাম আমার মাথায় এসে গেল—মিরাকিউরল! অর্থাৎ মিরাক্‌ল কিওর ফর অল কমপ্লেন্টস। সর্বরোগনাশক বড়ি।

এইসময় একটা ঘটনা ঘটল, যেটা বলা যেতে পারে আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল।

আমি তখন কলকাতায়। প্রোফেসরির কাজ নেবার মাসখানেকের মধ্যেই আমি ইংরেজি ভাষায় বিজ্ঞানবিষয়ক সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা 'নেচার'-এর গ্রাহক হয়েছিলাম। এই পত্রিকায় জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে একটা চমৎকার প্রবন্ধ পড়ে আমি লেখক জেরেমি সন্ডার্সকে তার বাসস্থান লন্ডনে একটা চিঠি লিখি। নেচার-এ লেখক পরিচিতিতে বলা হয়েছিল সন্ডার্স দু'বছর হলো কেমব্রিজ থেকে বায়োলজি পাশ করে বেরিয়েছে। আন্দাজে মনে হয় সে আমারই বয়সি হবে।

তখন বিলেতে চিঠি যেতে জাহাজে লাগত আঠারো দিন, আর প্লেনে আট দিন। আমি এয়ারমেলেই লিখেছিলাম। সন্ডার্সের উত্তর এল উনিশ দিন পর। অর্থাৎ সেও এয়ারমেলেই লিখেছে। সে যে আমার চিঠি পেয়ে শুধু খুশি হয়েছে তাই নয়, সে নাকি চিঠিতে এক বিরল বিদগ্ধ বৈজ্ঞানিক মনের পরিচয় পেয়েছে। শেষ ক'-লাইনে সে জানিয়েছে যে, তার জন্ম হয় ভারতবর্ষের পুণা শহরে। — 'আমার ঠাকুরদাদা বত্রিশ বছর ইন্ডিয়ান আর্মিতে ছিলেন। আমি অবিশ্যি সাত বছর বয়সে বাবা মার সঙ্গে ইংলন্ডে চলে আসি, কিন্তু সেই সাত বছরের স্মৃতি, আর ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর উপর টান আমার এখনও অম্লান রয়েছে।'

চিঠি লেখালেখি চলল। তৃতীয় চিঠিতে সন্ডার্স লিখল, 'যদিও আমাদের দু-জনেরই বয়স পঁচিশ, আমি বিশ্বাস করি না যে এই বয়সে পত্রবন্ধু হওয়া যায় না। তুমি আমার মতে সায় দাও কি না সেটা জানার অপেক্ষায় রইলাম।'

আমি স্বভাবতই সন্ডার্সের প্রস্তাবে রাজি হলাম। পরস্পরকে ছবি পাঠানো হলো, অপ্রতিহতভাবে চলতে লাগল এয়ারমেলে চিঠি যাওয়া আসা।

মাসআষ্টেক চলার পর হঠাৎ আমার একটা চিঠির পর এক মাস পেরিয়ে গেলেও সন্ডার্সের উত্তর এল না।

ঠিক করলাম আরো দু'সপ্তাহ দেখে একটা টেলিগ্রাম করব। সন্ডার্স চাকরি করে না সেটা জানি; সে এখনও জীববিদ্যা নিয়ে রিসার্চ করছে।

সাত দিনের মাথায় হঠাৎ বিলেত থেকে চিঠি। খামের উপর হাতের লেখা সন্ডার্সের নয়; কোনো এক মহিলার। চিঠি খুলতে খুলতে মনে পড়ল সন্ডার্স লিখেছিল সে গতবছর বিয়ে করেছে, তার স্ত্রীর নাম ডরথি।

চিঠি খুলে দেখি—হ্যাঁ, লেখিকা ডরথিই বটে।

কিন্তু এ যে নিদারুণ দুঃসংবাদ!—'তোমাকে খবরটা জানাতে আমার কী মনের অবস্থা হচ্ছে বোঝাতে পারব না,' লিখেছে ডরথি। 'তুমি জেরির এত বন্ধু বলেই এ কর্তব্যটা আমার কাছে আরও কঠিন' ...এই ভণিতার পরেই বজ্রাঘাত—'জেরির যকৃতে ক্যানসার ধরা পড়েছে। ডাক্তারের মতে তার মেয়াদ আর মাত্র দু মাস।'

পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার কী করণীয় আমি স্থির করে ফেলেছি। দশটা মিরাকিউরলের বড়ি সেদিনই এয়ারমেলে পাঠিয়ে দিলাম ডরথির নামে, সঙ্গে চিঠিতে কাতর অনুরোধ—'এই পার্সেল পাওয়ামাত্র তুমি তোমার স্বামীকে দুটো বড়ি খাইয়ে দেবে। দুদিনে যদি কাজ না হয়, তা হলে আরও দুটো। এইভাবে দশটা বড়িই তুমি শেষ করে ফেলতে পারো। যেই মুহূর্তে মনে হবে বড়িতে কাজ দিয়েছে, তক্ষুনি আমাকে টেলিগ্রাম করে জানাবে।'

দেড় মাস কেটে গেল—কোনো খবর নেই। ক্যানসারে কি তা হলে মিরাকিউরল কাজ করে না? তা হলে তো ওষুধের নাম পালটাতে হবে!

আমি ততদিনে গিরিডি ফিরে এসেছি পুজোর ছুটিতে। সন্ডার্সের কাছে আমার দুটো ঠিকানাই ছিল, এখন কখন আমি গিরিডিতে থাকি আর কখন কলকাতায় থাকি, সেটাও ও জানত।

কালীপুজোর আগের দিন ডরথিকে একটা টেলিগ্রামের খসড়া করে অত্যন্ত বিষণ্ণ মনে সেটায় চোখ বুলোচ্ছি, এমন সময় দুখি ব্যস্ত হয়ে এসে বলল, 'একজন সাহেব এক্ষুনি ট্যাক্সি থেকে নামলেন।'

বলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। আমার বাড়িতে ঢুকে প্রথমেই বৈঠকখানা পড়ে। দরজা খুলে দেখি, একটি স্বর্ণকেশ শ্বেতাঙ্গ সুপুরুষ যুবক ঠোঁটের কোণে হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ফোটো বিনিময় হবার দরুন আমরা পরস্পরের মুখ চিনতাম, তাই আমি আর থাকতে না পেরে সন্ডার্সকে জড়িয়ে ধরে রুদ্ধকণ্ঠে বললাম, 'তুমি বেঁচে আছ!'

ততক্ষণে আমরা দুজনেই ঘরে ঢুকে এসেছি, দুখি সন্ডার্সের হাত থেকে তার সুটকেস নিয়ে নিয়েছে। এবার সন্ডার্স আমার পিঠে দুটো চাপড় মেরে ধপ করে একটা সোফায় বসে পড়ে বলল, 'তা যে আছি, সে তো দেখতেই পাচ্ছ। কিন্তু সত্যি করে বলো তো—এটা কি কোনো ভারতীয় ভেলকি? লন্ডনের ডাক্তারি মহলে তো হইচই পড়ে গেছে। কী ট্যাবলেট পাঠিয়েছিলে তুমি আমাকে?'

আমি দুখিকে কফি করতে বলে স্বর্ণপর্ণীর ঘটনাটা আদ্যোপান্ত সন্ডার্সকে বললাম। সন্ডার্স সবটুকু শুনে কিঞ্চিৎ অভিমানের সুরে বলল, 'এমন একটা ঘটনা তুমি অ্যাদ্দিন তোমার পত্রবন্ধুর কাছে লুকিয়ে রেখেছ?'

আমি সত্যি কথাটাই বললাম।

'আমার ভয় হয়েছিল তুমি আমার কথা বিশ্বাস করবে না; ফলে আমাদের দুজনের মধ্যে একটা ব্যবধান এসে পড়বে।'

'ননসেন্স! তোমার চিঠিতে যেটা সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পায়, সেটা হলো তোমার চিন্তাধারার স্বচ্ছতা ও গভীরতা। আমি তোমার কথা বিশ্বাস করব না এ কি হতে পারে? কী নাম তোমার এই আশ্চর্য ওষুধের?'

'সংস্কৃত নামটা তো তোমায় বলেইছি; আমার দেওয়া নাম হলো মিরাকিউরল।'

'ব্রাভো!' বলে উঠল সন্ডার্স। 'এর চেয়ে ভালো নাম আর হতে পারে না। ...কিন্তু, আশা করি তুমি এই ওষুধের পেটেন্ট নিয়েছ?'

আমি 'না' বলাতে সন্ডার্স সোফা ছেড়ে প্রায় তিন ইঞ্চি লাফিয়ে উঠে বলল, 'আর ইউ ম্যাড? তুমি কি বুঝতে পারছ না যে, এ ওষুধ তোমাকে ক্রোড়পতি করে দেবে?'

আমি একটু হেসে বললাম, 'সেটাই আমি চাই না, সন্ডার্স। বৈভবের প্রতি কোনো আকর্ষণ নেই। আমি মোটামুটি স্বচ্ছন্দে সাধারণ জীবনযাপন করতে পারলেই খুশি।'

সন্ডার্স সোফার হাতলে চাপড় মেরে বলল, 'ড্যামিট, শঙ্কু! তুমি এর জন্য নোবেল প্রাইজ পেতে পার, তা জান?'

'না সন্ডার্স; তা পারি না। তুমি তো শুনলে, এই ওষুধের ব্যাপারে আমি যদি কিছু করে থাকি, সেটা হলো এই গাছটাকে খুঁজে বার করা। সেটাও সম্ভব হয়েছে কারণ আরেকজন নির্দেশ দিয়েছিল বলে। আর এর গুণ, সে তো প্রকৃতির অবদান। তুমি প্রাইজ দেবে কাকে?'

'বেশ তো, প্রাইজের কথা ছেড়ে দিলাম; কিন্তু খ্যাতি বলে তো একটা জিনিস আছে!—তুমি কি সে সম্বন্ধেও উদাসীন?

মিরাকিউরল যে একমাত্র তোমার কাছেই আছে, আর কারুর কাছে নেই, সেটা তো তুমি অস্বীকার করবে না? ক্যানসার পর্যন্ত যখন সেরে গেছে, তাতেই বোঝা যায় এ ওষুধের ক্ষমতার দৌড়। পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিমান ওষুধের স্বত্বাধিকারী তুমি। তোমাকে দেশবিদেশের লোকে চিনবে না?'

'তার জন্য তুমি কী করতে বলো আমাকে?'

'আমার প্রস্তাব হচ্ছে এই— তুমি আমার সঙ্গে লন্ডন চলো। আমার মিরাক্‌ল কিওরের কথা শুনে শুধু ডাক্তারি মহলে নয়, বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেও তুমুল আলোড়ন চলছে। তারা তোমাকে দেখতে চায়, তোমার মুখ থেকে এ ওষুধের কথা শুনতে চায়, আর আরও যেটা জানতে চায় সেটা হলো এই ওষুধের উপাদানের মধ্যে এমন কী থাকতে পারে যার ফলে এর এত তেজ, রোগজীবাণুনাশক এত শক্তি। এর কেমিক্যাল অ্যানালিসিস করিয়েছ তুমি?'

'না।'

'তা হলে সে কাজটা লন্ডনে করাতে হবে। উপাদানগুলি জানতে পারলে কৃত্রিম উপায়ে ল্যাবরেটরিতে এই ওষধি তৈরি করে বাজারে ছাড়া যেতে পারে। ভেবে দেখো, সেটা মানুষের মনে কতটা ভরসা আনবে। তাই বলছি তুমি চলো আমার সঙ্গে। আধুনিক বিজ্ঞানের ঘাঁটি যে এখন পশ্চিমে, সেটা তো তুমি স্বীকার কর? বৈজ্ঞানিক হিসাবেও তো তোমার একবার বিলেত যাওয়া দরকার।'

অগত্যা সন্ডার্সের প্রস্তাবে সায় দিতে হলো। সত্যিই বলতে কী, বিদেশ যাবার বাসনা আমি অনেক দিন থেকে পোষণ করছি। সেটা যে এত তাড়াতাড়ি ঘটে যাবে তা ভাবিনি।

কলকাতায় গিয়ে সাত দিনের মধ্যে যাবার সব ব্যবস্থা হয়ে গেল।

২৫ অক্টোবর ১৯৩৭ আমরা বোম্বাই থেকে পি. অ্যান্ড ও. কোম্পানির জাহাজ 'এস্ এস্ এথিনা'-তে ইংলন্ড রওনা দিলাম। ১৬ নভেম্বর পোর্টসমাউথ বন্দরে জাহাজ থেকে নেমে ট্রেনে এলাম লন্ডনের ভিক্টোরিয়া স্টেশনে। সেখান থেকে টিউব অর্থাৎ পাতালরেলে চড়ে গেলাম হ্যাম্পস্টেড। এই হ্যাম্পস্টেডেই উইলোবি রোডে সন্ডার্সের বাড়ি।

সন্ডার্সের চিঠিতে আগেই জেনেছিলাম, তার বাড়িতে স্ত্রী ছাড়া থাকেন তার মা ও বাবা। বাবা জনাথ্যান সন্ডার্স লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক।

আমাদের দেখে সকলেরই মুখে হাসি ফুটে উঠল। সন্ডার্সের মা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'তুমি জেরিকে মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার করেছ; এ ঋণ আমরা কোনোদিন শোধ করতে পারব না।'

দোতলা বাড়ি, তার একতলাতেই গেস্টরুমে আমার জায়গা হলো। আমরা পৌঁছেছিলাম সন্ধ্যা ছটায়। সাড়ে আটটায় ডিনার (এরা দেখলাম বলে 'সাপার') টেবিলে সন্ডার্স তার প্ল্যান বলল।

'কাল সকালে তোমার বড়ির কেমিক্যাল অ্যানালিসিসের বন্দোবস্ত করব। তারপর তোমার বক্তৃতার জন্য জায়গা ঠিক করে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেব জনসাধারণকে জানানোর জন্য। অবিশ্যি আমার কিছু চেনা ডাক্তার ও বৈজ্ঞানিকদের আমি আলাদা করে টেলিফোন করে খবরটা জানিয়ে দেব।'

'বিজ্ঞপ্তিতে কী বলবে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। 'নামে তো কেউই চিনবে না আমাকে।'

সন্ডার্স নির্দ্বিধায় বলল, 'বলব সর্বরোগনাশক যুগান্তকারী ড্রাগ মিরাকিউরলের আবিষ্কর্তা ভারতীয় বিজ্ঞানী প্রোফেসর টি. শঙ্কু তাঁর আবিষ্কার সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবেন।'

আমি বললাম, 'সর্বনাশ! আমি যে কোনওদিনই নিজেকে আবিষ্কারক বলে প্রচার করতে পারব না। সে যে মিথ্যা বলা হবে।'

সন্ডার্স ধমকের সুরে বলল, 'আবিষ্কারক নয় কেন বলছ শঙ্কু? যে গাছের উল্লেখ শুধু প্রাচীন সংস্কৃত ডাক্তারিশাস্ত্রে পাওয়া যায়, কাশীর এক সাধু ছাড়া যে গাছ কেউ কোনোদিন চোখে দেখেনি, সেই গাছের সন্ধানে ঘোড়ার পিঠে চড়ে সাড়ে ছ-হাজার ফুট উঁচুতে পাহাড়ের গায়ে গভীর জঙ্গলে নিজের জীবন বিপন্ন করে কে গিয়েছিল? তুমি, না আর কেউ? তুমি এত বিদ্বান, এত বুদ্ধিমান, এটুকু বুঝতে পারছ না যে, এই গাছ ''ডিসকভার'' করে ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো একমাত্র তুমি ছাড়া আর কেউ করেনি?'

এরপর আর আমি কী বলব? প্রোফেসর সন্ডার্স বললেন, 'খাও, শঙ্কু, খাও। মাথা হেঁট করে বসে থেকো না। জেরি যা

বলেছে তা ষোলো আনা সত্যি। নিজের যেটুকু প্রাপ্য, সেটা আদায় করে নেওয়াটাই বিচক্ষণ ব্যক্তির কাজ। এ ব্যাপারে বিনয় প্রকাশ আমি মোটেই সমর্থন করি না।'

পরদিন সকালে সন্ডার্স বলল, 'তোমাকে আর আমার সঙ্গে টানব না; তুমি বরং ডরথির সঙ্গে গিয়ে হ্যাম্পস্টেড হিথে হাওয়া খেয়ে এসো। আর এখান থেকে দশ মিনিটের হাঁটা পথে কবি কিট্‌সের বাড়িটা দেখে এসো।'

হ্যাম্পস্টেড হিথের কথা আগেই শুনেছিলাম। এটা একটা বিস্তীর্ণ ঘাসে ঢাকা অসমতল ময়দান। তার উপর দিয়ে হেঁটে চলেছি ডরথি আর আমি। নভেম্বর মাস, তাই ঠান্ডা বেশ জবরদস্ত।

ডরথি যে অতি বুদ্ধিমতি মেয়ে, সেটা ওর সঙ্গে পাঁচ মিনিট কথা বলেই বুঝেছি। সেও কেমব্রিজের ছাত্রী, অর্থনীতিতে গ্র্যাজুয়েট। কেমব্রিজেই জেরেমির সঙ্গে ওর আলাপ হয়।

ডরথির কথা শুনে এটা বুঝলাম যে ভারতবর্ষে বসে শুধু খবরের কাগজ পড়ে ইউরোপে কী ঘটছে না ঘটছে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা যায় না। গত কয়েক বছরে জার্মানিতে হিটলারের অভ্যুত্থান ও নাৎসি পার্টি সংগঠনের কথা অবিশ্যি জানতাম, কিন্তু সেটা যে কী ভয়ংকর চেহারা নিয়েছে এবং হিটলারের আত্মম্ভরিতা ও তার শাসনতন্ত্রের যথেচ্ছাচারিতা যে কোন স্তরে পৌঁছেছে, সেটা দেশে বসে ধারণা করতে পারিনি। ডরথি বলল, 'ইংরাজিতে পাওয়ার-ম্যাড বলে একটা কথা আছে জান তো? হিটলার সেই অর্থে উন্মাদ। সমস্ত ইউরোপকে গ্রাস করে সে একটা বিশাল জার্মান রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন দেখছে। তাতে ইন্ধন জোগাচ্ছে ওর সাঙ্গোপাঙ্গোরা—গোয়রিং, গোয়বেল্‌স, হিমলার, রিবেনট্রপ...। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ।'
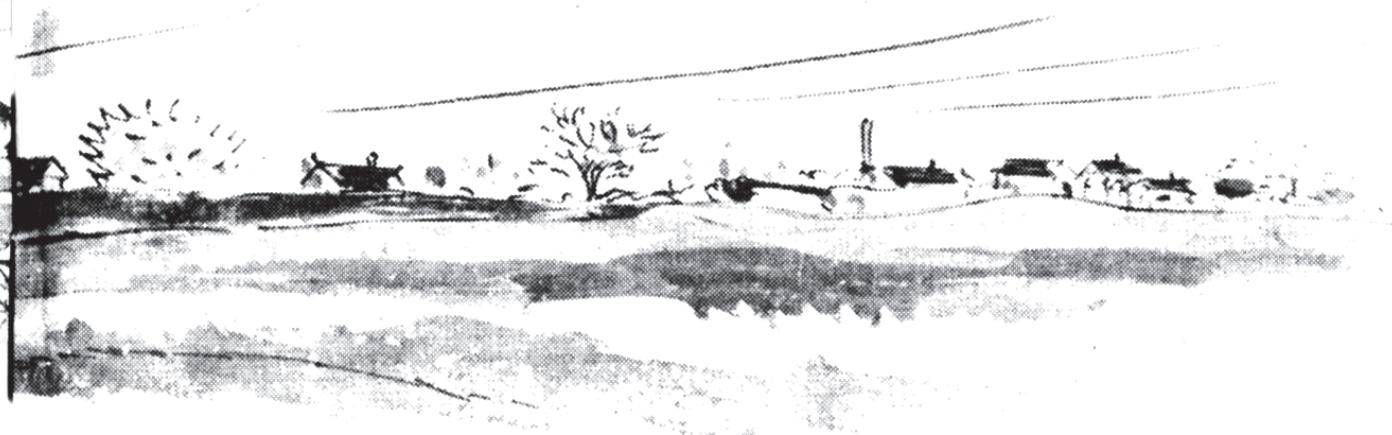
আমি গম্ভীর হয়ে গেছি দেখে ডরথি বলল, 'দেখো তো আমার কী আক্কেল! তুমি এই প্রথমবার লন্ডনে এলে, আর আমি তোমাকে যত সব অলুক্ষুণে কথা বলে ভাবিয়ে তুলছি। ভেরি সরি, শঙ্কু! চলো কিট্‌সের বাড়ি দেখলে তোমার মন খুশি হয়ে যাবে নিশ্চয়ই।'

ডরথি ভুল বলেনি। আমি ভাবতে পারি না যে আমাদের দেশের অতীতের কোনো কৃতকর্মার স্মৃতি এত যত্ন নিয়ে জিইয়ে রাখা হচ্ছে। ডরথি বলল, 'এটা শুধু ব্রিটেনের বিশেষত্ব নয়; ইউরোপের যেখানেই যাও সেখানেই এ জিনিস দেখতে পাবে।'

সন্ডার্স ফিরল সন্ধ্যা সাড়ে ছটায়। প্রথমেই বলল, 'তোমার বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়ে গেছে পরশু সন্ধ্যা সাতটায় ক্যাক্সটন হলে। টাইমস আর ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ানে কাল বিজ্ঞপ্তি বেরোবে। ফোন করে যাঁদের খবর দিয়েছি তার মধ্যে যিনি আমার ক্যানসারের চিকিৎসা করছিলেন— ডাঃ কানিংহ্যাম— তিনিও আছেন। সকলেই উন্মুখ হয়ে আছেন তোমার বক্তৃতা শোনার জন্য।'

'কিন্তু আমার বড়ির অ্যানালিসিসের কী খবর?'

সন্ডার্স পকেট থেকে একটা খাম বার করে আমাকে দিল। খাম থেকে যেটা বেরোল, সেটাই হলো অ্যানালিসিসের রিপোর্ট। আমি তাতে কিছুক্ষণ চোখ বুলিয়ে বললাম, 'এ তো দেখছি সবরকম ভিটামিনই রয়েছে। তা ছাড়া পোট্যাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, আয়রন, আয়োডিন ...দেখে অনেকটা মনে হয় যেন রসুনের উপাদানের তালিকা দেখছি।'

সন্ডার্স বলল, 'অ্যালিল সালফাইড রয়েছে বলেই এতরকম রোগের জীবাণু এর কাছে পরাস্ত হয়।'

‘কিন্তু রিপোর্টের শেষে যে কথাটা বলা হয়েছে, সেটা তো অত্যন্ত অর্থপূর্ণ। বলছে, একটি উপাদান রয়েছে এই বড়িতে, রসায়নে যার কোনো পরিচিতি নেই।’

‘এগজ্যাক্টলি,’ বলল সন্ডার্স। ‘এবং সেই কারণেই ল্যাবরেটরিতে কৃত্রিম উপায়ে এই ওষুধ তৈরি করা যাবে না। অর্থাৎ পৃথিবীতে একমাত্র তুমিই এই ওষুধের সোল প্রোপ্রাইটার। তোমার জায়গা কেউ কোনোদিন নিতে পারবে না।’

কথাটা শুনে আমার মনে একটা মিশ্র ভাব দেখা দিল। মিরাকিউরল আমার একার সম্পত্তি এটা ভাবতে খারাপ লাগছে না; কিন্তু এও তো ঠিক যে, যেহেতু ওষুধটা বাজারে ছাড়া যাবে না, পৃথিবীর কোটি কোটি মুমূর্ষু ব্যক্তি এর রোগনাশক ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হবে।

এর পরের দিন সন্ডার্সের সঙ্গে বেরিয়ে লন্ডনে অনেক কিছু দ্রষ্টব্য—ব্রিটিশ মিউজিয়াম, ন্যাশনাল গ্যালারি, মাদাম ত্যুসোর মিউজিয়াম—দেখে সন্ধ্যায় মারমেড থিয়েটারে বার্নার্ড শ-র ‘পিগম্যালিয়ন’ নাটক দেখলাম। সব মিলিয়ে এটা বলতে পারি যে লন্ডন আমাকে হতাশ করেনি।

আমার বক্তৃতায় এত লোক হবে সেটা স্বপ্নেও ভাবিনি। সন্ডার্স আমার সঙ্গে মঞ্চে উঠে মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে আমার পরিচয় দিল। সন্ডার্সেরই অধ্যাপক রেমন্ড ক্যারুথার্স মিটিং-এর চেয়ারম্যান ছিলেন। সন্ডার্স তাঁকে আগেই তালিম দিয়ে রেখেছিল। তিনি ‘ব্রিলিয়ান্ট ইয়াং ইন্ডিয়ান সায়ান্টিস্ট প্রোফেসর শ্যাঙ্কু’ সম্বন্ধে দু-চার কথা বলার পর আমার বলার পালা এল।

বিশ বছর বয়স থেকে ছাত্র পড়াচ্ছি বলে বক্তৃতার ব্যাপারে আমার কোনো অস্বস্তিবোধ ছিল না। তাই আমি বেশ সহজভাবেই বলে চললাম, ভারতে আয়ুর্বেদ চর্চার কথা, চরক-সুশ্রুতের সংহিতার কথা, আমার বাবার কথা, এবং টিক্ড়ীবাবার কাছে শুনে কীভাবে কসৌলির জঙ্গল থেকে স্বর্ণপর্ণী সংগ্রহ করি তার কথা। যতক্ষণ বললাম, ততক্ষণ হলে কেউ টু শব্দটি করেনি। বলা শেষ হলে পর করধ্বনির বহর থেকে বুঝলাম আমি উতরে গেছি।

বক্তৃতার পর প্রশ্নোত্তরের জন্য কিছুটা সময় রাখা হয়েছিল, কিন্তু যে দুটো সবচেয়ে স্বাভাবিক প্রশ্ন—এক, আমি ওষুধটা মার্কেট করব কি না, এবং দুই, আমি কিছুকাল লন্ডনে থেকে চিকিৎসা চালাব কি না—এই দুটোর উত্তরই আমার বক্তৃতার মধ্যে আমি দিয়ে দিয়েছিলাম। তাই বক্তৃতার শেষে দু’ মিনিট অপেক্ষা করে সন্ডার্স আমাকে নিয়ে মঞ্চ থেকে নীচে নেমে এল। বহু লোকের সঙ্গে করমর্দন করে এবং অন্তত পঞ্চাশজনের কনগ্র্যাচুলেশনস-এ ‘থ্যাঙ্ক ইউ’ বলে তবে আমি রেহাই পেলাম।

পরদিন দেখলাম লন্ডনের সব কাগজেই আমার ছবি সমেত খবরটা বেরিয়েছে। বিকেলের দিকে সন্ডার্স বেরিয়ে কাছেই একটা দোকান থেকে জার্মান, ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান, সুইডিশ ইত্যাদি যাবতীয় ইউরোপীয় ভাষায় ডজনখানেক খবরের কাগজ নিয়ে এল। সেইদিনেরই কাগজ, কিছুক্ষণ আগে এয়ারমেলে এসেছে।

উলটেপালটে দেখা গেল প্রত্যেকটি কাগজেই খবরটা বেরিয়েছে এবং তার সঙ্গে প্রত্যেকটি কাগজেই আমার ছবি।

আমি হকচকিয়ে গেছি দেখে সন্ডার্স বলল, ‘এতে অবাক হবার কিছু নেই শঙ্কু। ক্যাক্সটন হলে বহু কাগজের রিপোর্টার উপস্থিত ছিল। তুমি ভুলে যাচ্ছ হে, মিরাকিউরল আবিষ্কারের মতো এমন চাঞ্চল্যকর ঘটনা সম্প্রতি আর ঘটেনি। তুমি এবং তোমার স্বর্ণপর্ণীকে কোনও কাগজ অগ্রাহ্য করতে পারে না।’

এখানে শনি রবি হল উইক-এন্ড। এই দুটো দিন খুব কমই লোক লন্ডনে থাকে; ইংলন্ডেই কোথাও না কোথাও চলে যায় নির্ঝঞ্ঝাটে দু’দিন কাটিয়ে আসতে। সন্ডার্স আগেই বলে রেখেছিল যে এই উইক-এন্ডে সে আমাকে কেমব্রিজ ও অক্সফোর্ড দেখিয়ে আনবে। শনিবার কেমব্রিজ, সেখানে কোনও হোটেলে থেকে রবিবারে অক্সফোর্ড দেখে বাড়ি ফেরা।

এ ব্যাপারে ডরথিও আমাদের সঙ্গে এল। সুপ্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় দুটো দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। কোনটা যে বেশি ভাল বলা খুব কঠিন, যদিও শহর হিসেবে কেমব্রিজের শান্ত সৌন্দর্য অক্সফোর্ডকে ছাপিয়ে যায়। সন্ডার্স ও ডরথি দুজনেই কিংস কলেজ থেকে পাশ করেছে। দেখে মনে হল পড়াশুনার পক্ষে এর চেয়ে ভাল পরিবেশ আর হতে পারে না।

রবিবার বিকেলে সাড়ে চারটায় বাড়ি ফিরে সদর দরজা দিয়ে ঢুকতেই ডরথির মা ব্যস্তভাবে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন।

'শঙ্কুর সঙ্গে দেখা করার জন্য একটি বিদেশি যুবক প্রায় আধ ঘণ্টা হলো বসে আছে।'

'বিদেশি মানে?' সন্ডার্স জিজ্ঞেস করল।

'সেটা তোমরা বুঝবে। আমাদের মতো ইংরেজি বলে না এটা বলতে পারি।'

বৈঠকখানায় ঢুকতে সোফা থেকে উঠে দাঁড়াল একটি যুবক, তার চোখে চশমা, মাথা ভর্তি সোনালি চুল।

'গুটেন—গুড ইভনিং;' বলল ছেলেটি। বুঝতে পারলাম ছেলেটি জার্মান কিংবা অস্ট্রিয়ান, 'গুটেন আবেন্ড' বলতে গিয়ে মাঝপথে সামলে নিয়ে ইংরেজি বলছে। এখানে বলে রাখি যে, বি. এস.সি পাশ করার পর যে চার বছর বসে ছিলাম, সেই অবসরে আমি লিঙ্গুয়াফোন রেকর্ড গ্রামোফোনে বাজিয়ে বাজিয়ে ফরাসি আর জার্মান শিখে নিয়েছিলাম।

ডরথি আর আমাদের সঙ্গে আসেনি; আমরা তিন জন সোফায় বসার পর কথা আরম্ভ হলো। ছেলেটি প্রথমেই ইংরেজি ভাষায় সড়গড় না হবার জন্য মার্জনা চেয়ে নিল।

'আমার নাম নরবার্ট স্টাইনার', বলল ছেলেটি, 'আমি বার্লিনে থাকি; সেখানে থেকেই আসছি।' তারপর সটান আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'মিরাকিউরলের খবর আমাদের কাগজে বেরিয়েছে এবং এটা নিয়ে সকলেই আলোচনা করছে। আই আশ্চর্য ড্রাগের ব্যাপারেই আমি তোমার কাছে এসেছি। তুমি যে বক্তৃতা দিয়েছিলে সেই ক্যাক্সটন হলে ফোন করে আমি জানি যে তুমি হ্যাম্পস্টেডে আছ। এখানে এসে হাই স্ট্রিটে একটা ওষুধের দোকানে জিজ্ঞেস করে জানলাম, মিঃ সন্ডার্স উইলোবি রোডে থাকেন।'

তোমার আসার কারণটা জানতে পারি কি? সন্ডার্স প্রশ্ন করল।

'তার আগে আমি দুটো প্রশ্ন করতে চাই।'

'কী?'

'নাৎসিরা যে ইহুদিদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালাচ্ছে সেটা জান?'

এ খবর আমি দেশে থাকতে পেয়েছি। হিটলারের ধারণা ইহুদিরা বহুদিন থেকে জার্মানির নানরকম ক্ষতি করে আসছে; সুতরাং তাদের উৎখাত না করলে জার্মানি তার পূর্ব গৌরব ফিরে পাবে না। হিটলারের মতে ইহুদিরা মানুষই নয়: আসল মানুষ হচ্ছে সেইসব জার্মান, যাদের শিরায় এক ফোঁটা ইহুদি রক্ত নেই। এই অজুহাতে তারা ইহুদিদের উপর নৃশংস অত্যাচার চালিয়েছে। অথচ জার্মানির জ্ঞানীগুণীদের মধ্যে যাদের স্থান সবচেয়ে উপরে তাদের অনেকেই ইহুদি।

সন্ডার্স বলল, 'আমরা এ অত্যাচারের কথা জানি। তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন কী?'

'তোমরা হাইনরিখ স্টাইনারের নাম শুনেছ?'

হাইনরিখ স্টাইনার? এ নাম যে আমার চেনা। বললাম, যিনি সংস্কৃতের অধ্যাপনা করেন? যিনি বেদ উপনিষদ নতুন করে জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেছেন?'

'হ্যাঁ', বলল নরবার্ট স্টাইনার। 'আমি তাঁর কথাই বলছি।'

'তিনি তোমার কে হন?'

'বাবা। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। নাৎসিরা জার্মানির সব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইহুদিদের তাড়িয়ে দিয়েছে। গেস্টাপোর নাম শুনেছ?'

এ নামও আমার জানা। বললাম, 'জার্মানির গুপ্ত পুলিশ?'

'হ্যাঁ। নাৎসি পার্টিতে হিটলারের পরেই যার স্থান, সেই হেরমান গোয়রিং-এর সৃষ্টি এই গেস্টাপো। এই পুলিশ বাহিনীর প্রতিটি লোক এক একটি মূর্তিমান শয়তান। কোনও কুকার্যে এরা পেছপা হয় না।'

'তোমার বাবা কি—?'

'হ্যাঁ। এদের শিকার। বাবা বেশ কিছুদিন থেকেই জার্মানি ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ভাবছিলেন, কিন্তু বার্লিন ওঁর জন্মস্থান, আর ওঁর ছাত্ররা ওঁকে যেরকম ভালবাসে আর ভক্তি করে— উনি দোটানার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। দুদিন আগে গেস্টাপোর সশস্ত্র পুলিশ আমাদের বাড়িতে এসে হাজির হয়। তখন দুপুর, আমরা খেতে বসেছি। একজন পুলিশ খাবার ঘরে এসে বাবার দিক পিস্তল উঁচিয়ে বলে, ''বলো— হাইল হিটলার।''

আমি জানতাম যারা হিটলারের আনুগত্য স্বীকার করে, তারা পরস্পরের সঙ্গে দেখা হলে ডান হাত সামনের দিকে উঁচিয়ে 'হাইল হিটলার' বলে। এর মানে যদি করা যায় 'হিটলার জিন্দাবাদ' তাহলে খুব ভুল হবে না।

নরবার্ট বলে চলল, 'বাবা বারবার আদেশ সত্ত্বেও হাইল হিটলার বলতে রাজি হননি। তখন পুলিশ তাঁকে আক্রমণ করে। বেপরোয়াভাবে প্রহার করে পুলিশ যখন চলে যায়, তখন বাবা অর্ধমৃত। তাঁর সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত, মাথা ফেটে গেছে। বার্লিনের কোনও হাসপাতালে ইহুদিদের ঢুকতে দেয় না। আমাদের বাড়ির ডাক্তার হুবারমানও ইহুদি— তিনি বাড়ি থেকে বেরোন না। পরিচর্যা যেটুকু করার সেটা করেছি আমার বোন আর আমি। কিন্তু বাবা যে অবস্থায় রয়েছেন, ভুল বকছেন, গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে— তাতে মনে হয় না তিনি আর দু'এক দিনের বেশি বাঁচবেন। গতকাল কাগজে আমি প্রোফেসার শাঙ্কু আর মিরাকিউলের কথা পড়লাম।'

নরবার্টের কাতর দৃষ্টি এবার আমার দিকে ঘুরল।

'এক, যদি আপনি বাবাকে বাঁচান....'

সন্ডার্স বলল, 'তুমি কি প্রোফেসরকে বার্লিন নিয়ে যেতে চাইছ?'

'না হলে বাবা বাঁচবেন না, মিঃ সন্ডার্স! আর বাবা হলেন সত্যিকার ভারতপ্রেমিক। সাতবার ভারতবর্ষে গেছেন। বলেন, সংস্কৃত ভাষায় যে ঐশ্বর্য আছে তেমন আর কোনো ভাষার নেই। ... আমি টাকা নিয়ে এসেছি। কাল দুপুরে হেস্টন থেকে বার্লিনের প্লেন ছাড়বে সাড়ে এগারোটায়, বিকেল সাড়ে চারটায় বার্লিন পৌঁছোবে। আমাদের বাড়িতেই থাকবেন প্রোফেসার। আমিই আবার দুদিন পরে ওকে প্লেনে তুলে দেব। ওঁর এক পয়সা খরচ লাগবে না।'

'কিন্তু ওঁর নিরাপত্তার কী ব্যবস্থা হবে?'

'ভারতবাসীদের উপর তো নাৎসিদের কোনও আক্রোশ নেই,' বলল নরবার্ট। 'ওঁর কোনো ক্ষতি হবে না এ আমি জোর দিয়ে বলতে পারি।'

সন্ডার্স কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল, 'তোমার বাবাকে কি দেখলে ইহুদি বলে বোঝা যায়?'

'তা যায়।'

'ওঁর চুল কি কালো?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে তোমার চুল সোনালি হলো কী করে? তোমার মা-র চুল কি তোমার মতো?'

'না, মা-র চুলও কালো ছিল। উনি মারা গেছেন পাঁচ বছর আগে।'

এই বলে নরবার্ট তার চুলের একটা অংশ ধরে টান দিতে সোনালি পরচুলা খুলে গিয়ে কালো চুল বেরিয়ে পড়ল।

'এবার বুঝতে পারছ কেন আমি স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াতে পারি? আর তা ছাড়া স্টাইনার নাম শুধু ইহুদিদের হয় না, অন্যদেরও হয়। আমি বলছি ওঁর কোনো বিপদ হবে না। '

আমি মনে মনে ভাবছিলাম বাবা বেঁচে থাকলে বলতেন, 'তুই যা রে তিলু। একজন মনীষীর ত্রাণকর্তা হতে পারলে তোর জীবন ধন্য হবে।'

সন্ডার্সকে দেখেই বুঝতে পারছিলাম ও সবিশেষ চিন্তিত। এবার ও আমার দিকে ফিরে বলল 'তোমার কী মত, শঙ্কু?'

আমি বললাম, 'এত বড় একজন ভারততাত্ত্বিককে মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার করতে পারলে আমার আত্মা শান্তি পাবে।'

'তবে যাও,' বলল সন্ডার্স, 'কিন্তু দু'দিনের বেশি কোনোমতেই থাকবে না। তোমাকেও বলছি, নরবার্ট— যদি ঈশ্বরের কৃপায় এবং মিরাকিউরলের গুণে তোমার বাবা পুনর্জীবন লাভ করেন, সে খবরটা তুমি ঢাক পিটিয়ে লোককে বলতে যেও না। তা হলে

প্রেফেসরকে আরো ডজনখানেক মুমূর্ষ ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য অনির্দিষ্টকাল বার্লিনে থেকে যেতে হবে।'

'আমি কথা দিচ্ছি সেটা হবে না।'

নরবার্ট উঠে পড়ে বলল, 'আমি কাল সকাল দশটায় ট্যাক্সি নিয়ে এখানে এসে হাজির হব।'

নরবার্ট চলে গেলে সন্ডার্স আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি মিরাকিউরলের কটা বড়ি এনেছ?'

'চব্বিশটা'

'সেগুলো কোথায় থাকে?'

'আমার সুটকেসে একটা শিশির মধ্যে। কারুর চিকিৎসা করতে যাবার সময় আমি চারটে বড়ি সঙ্গে নিয়ে নিই। তবে বার্লিনে অবিশ্যি আমার সঙ্গে সব বড়িই থাকবে, চারটে থাকবে পকেটে, আর বাকি ব্যাগে।'

'যে ব্যাপারে আমার সবচেয়ে বেশি ভয় করছে সেটা হল এই— জার্মানিতে তোমার খবর পৌঁছে গেছে সে তো তুমি দেখলেই; ধরো যদি বার্লিন গিয়ে তুমি নাৎসিদের খপ্পরে পড়? তাদের মধ্যে তো অনেকেরই দূরারোগ্য ব্যাধি থাকতে পারে। তাদের কেউ তোমার ওষুধের উপকারিতা ভোগ করছে এটা ভাবতে আমার আপাদমস্তক জ্বলে যায়।'

'তুমি কোনো চিন্তা করো না, সন্ডার্স। খবরের কাগজের ছবি থেকে মানুষ চেনা অত সহজ নয়। তা ছাড়া বার্লিনে আমার বয়সি আরও অনেক ভারতীয় আছে। যারা সেখানে পড়াশুনা করছে। আমাকে কেউ মিরাকিউরলের শঙ্কু বলে চিনবে না, দেখে নিও।'

সন্ডার্স একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'ঠিক আছে, তবে এটা জেনো যে তুমি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমার সোয়াস্তি নেই।'

সন্ডার্স একটা জীবতত্ত্ববিষয়ক পত্রিকার জন্য একটা প্রবন্ধ লিখছিল, বলল, 'যাও, তুমি আর ডরথি একটু ঘুরে এসো।'

কোনো বিশেষ জায়গায় যাবার ছিল না। তাই ডরথি আর আমি হ্যাম্পস্টেডেই এদিক ওদিক একটু ঘুরে দেখলাম। একটা রেস্টোরান্টে বসে কফি খেতে খেতে ডরথি বলল, 'আমার জার্মানি আর জার্মান জাতটার উপর এমন ঘৃণা ধরে গেছে যে কেউ ওখানে যাচ্ছে শুনলেই আমি বাধা না দিয়ে পারি না। অবিশ্যি তোমার ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছি। হাইনরিখ স্টাইনারের প্রতি তোমার শ্রদ্ধার ভাব থাকাটা স্বাভাবিক।'

আমি বললাম, 'ভারতবর্ষের শিল্প সাহিত্য সম্পর্কে অনেক জার্মানই শ্রদ্ধাশীল। আর সেটা আজ থেকে নয়। দুশো বছর থেকে। আমাদের বিখ্যাত প্রাচীন সংস্কৃত নাটক শকুন্তলা জার্মানে অনুবাদ হয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায়।'

'তখন মধ্যাহ্নের সূর্য জামানির মাথার উপরে, শঙ্কু। এখন সে দেশে অন্ধকার, লোকেরা সব অন্ধ, তাই তো হিটলারের স্বরূপ তারা দেখতে পায় না।'

ডিনারের পর বৈঠকখানায় বসে কফি পান ও গল্পগুজব করে আমার ঘরে চলে গেলাম জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে। সুটকেসটা সবে বিছানার উপর তুলেছি, এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল। খুলে দেখি সন্ডার্স।

'আসতে পারি '

'নিশ্চয়ই।'

সন্ডার্স ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে একটা অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন করল।

'আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের অভ্যাস আছে তোমার?'

'পিস্তল বন্দুকের কথা বলছ?'

'হ্যাঁ।'

আমাকে বলতেই হলো সে অভ্যাস আমার নেই। 'সত্যি বলতে কী, আট-দশ বছর বয়সে আমার গুলতিতে খুব ভাল টিপ ছিল। সাধারণত ওই বয়সে ছেলেরা গুলতি দিয়ে পাখিটাখি মেরে আস্ফালন করে। আমি কিন্তু কোনোদিন কিছু মারিনি। ছেলেবেলা থেকেই রক্তপাত জিনিসটাকে আমি সহ্য করতে পারি না। '

'আমিও তাই, শঙ্কু' বলল সন্ডার্স, 'কিন্তু নিরীহ মানুষের উপর যারা অমানুষিক অত্যাচার করে, তাদের উপর গুলি চালাতে আমি বিন্দু মাত্র দ্বিধা করব না। বাইব্‌লে যে বলে: এক গালে চড় খেলে অন্য গাল এগিয়ে দাও— এতে আমি মোটেই বিশ্বাস করি না।'

'কিন্তু এসব কথা তুমি আমায় বলছ কেন?'

সন্ডার্স কোনও জবাব না দিয়ে কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা রিভলভার বার করল।— 'এটা জার্মানিতে তৈরি। এর নাম লুগার অটোম্যাটিক। এতে আমি ছটা গুলি ভরেছি। তুমি এটা সঙ্গে নেবে। একটু দেখে নাও। এই হল সেফটি ক্যাচ। এটা এইভাবে টিপলে আলগা হয়, আর তখনই গুলি চালানো সম্ভব। গুলতিতে টিপ ভাল হলে রিভলভারেও হবে, এটা আশা করা ঠিক না। সত্যি বলতে কী, রিভলভারের চেয়ে রাইফলের সাহায্যে লক্ষ্যভেদ করা অনেক সহজ। কিন্তু কেউ যদি তোমার কাছে— অর্থাৎ পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে— দাঁড়ায়, তা হলে তার দিকে ত্যাগ করে রিভলভার চালালে তাকে কিছুটা ঘায়েল করবে নিশ্চয়ই। অতএব— হাত বাড়াও।'

অগত্যা রিভলভারটা নিয়ে নিলাম। আমি রোগাপটকা পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি মানুষ হলেও— শরীরে আমার শক্তির অভাব ছিল না। এর কারণ আমার বাবা। পুষ্টিকর খাবার খাওয়া আর নিয়মিত ব্যায়াম করা— এই দুটোর জন্যই দায়ী ছিলেন বাবা।

আজকাল বড়ো বড়ো জেট প্লেন ওড়ে পৃথিবী থেকে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার ফুট উপরে। ফলে জানালা দিয়ে নীচের দিকে চাইলে প্রায় কিছুই দেখা যায় না। যে প্লেনে নরবার্টের সঙ্গে বার্লিন যাচ্ছিলাম, তাতে চারটে প্রপেলার রয়েছে, আর সেটা অনেক নীচ দিয়ে ওড়ার ফলে ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট খেতখামার সবই দিব্যি দেখতে পাচ্ছিলাম। ভারী মনোরম, পরিচ্ছন্ন এই দৃশ্য। শীতকাল বলে সবুজের একটু অভাব, এক এক জায়গায় দেখছি বরফও জমে রয়েছে।

বিকেলে যথাসময়ে আমরা বার্লিন এয়ারপোর্টে এসে নামলাম। তখন অবিশ্যি এয়ারপোর্ট কথাটা চালু হয়নি; বলা হতো এয়ারোড্রোম। আজকের তুলনায় অনেক ছোটো, তবে আজকের মতোই নানান নিয়মকানুনের মধ্যে দিয়ে চলতে হয়।

একটা কাউন্টারের পিছনে হৃষ্টপুষ্ট এক জার্মান বসে যাত্রীদের পাস্‌পোর্ট চেক করছে। নরবার্ট আর আমি লাইনে দাঁড়িয়েছিলাম। দশ মিনিটের মধ্যে কাউন্টারের সামনে পৌঁছে গেলাম। নরবার্ট আমার পিছনে, কাজেই আমাকে আগে পাস্‌পোর্টটা দিতে হলো। সেই সঙ্গে একটা হলদে কার্ড দেবার ছিল, যাতে কতগুলো নির্দিষ্ট জায়গায় নামধাম, কোন দেশের লোক, বার্লিনে ক' দিন থাকব, কোথায় থাকব, কেন এসেছি, সব লিখতে হয়েছিল প্লেনে বসেই।

ইনস্পেক্টর কার্ডটায় চোখ বুলোতে বুলোতে একবার চশমার উপর দিয়ে আমার দিকে দেখলেন; তারপর মৃদুস্বরে বার তিনেক 'শাঙ্কু' বলে প্রশ্ন করার সুরে বললেন, 'আর্টস্ট্? অর্থাৎ আমি ডাক্তার কিনা প্রশ্ন করা হচ্ছে। আমি বললাম, 'নাইন। ভিজেনশাফ্‌টলের। প্রোফেসর।' অর্থাৎ, 'না, আমি বৈজ্ঞানিক। অধ্যাপক।'

লোকটা এবার পাস্‌পোর্টটা ভাল করে দেখল। তারপর তার পিছনে দাঁড়ানো একজন ইউনিফর্মধারী পুলিশের দিকে বলল, 'ফ্রিৎস, আনেরকেনেন সী ডাস হের?' অর্থাৎ, তুমি এই ভদ্রলোককে চিনতে পারছ?

উত্তর এল, 'নাইন, নাইন।'— না, না।

'এখানে কদিনে থাকবে? আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল ইনস্পেক্টর। বললাম, দিন তিনেক।'

'আসার উদ্দেশ্য?'

'ভ্রমণ। কার্ডেই লেখা আছে।'

'ঠিক আছে। এগিয়ে যাও।'

যাক। একটা বাধা অতিক্রম করা গেছে। ভদ্রলোক যে কাগজে আমার ছবি দেখেছেন, এবং আমার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে দেখছে। এর ফলে যে কিছুটা অস্বস্তি ভোগ করছিলাম সেটা অস্বীকার করব না।

ট্যাক্সিতে উঠে নরবার্ট ড্রাইভারকে গন্তব্যস্থল বাতলে দিল— সতেরো নম্বর ফ্রিডরিখস্ট্রাসে।

বার্লিন যে পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম শহর সেটা বুঝতে বেশি সময় লাগল না। এও বুঝলাম যে শহরটা ঘড়ির কলের মতো চলে; এর চরিত্রের সঙ্গে লন্ডনের কোনো মিল নেই। লন্ডনের রাস্তাঘাটে যে সংখ্যায় ভারতীয় দেখা যায়, এখানে ততটা দেখা যায় না, যদিও জানি যে বেশ কিছু ভারতীয় এখানে হয় পড়াশুনো করছে না হয় চাকরি করছে।

আধ ঘণ্টাখানেক চলার পর নরবার্ট ট্যাক্সিওয়ালাকে ডাইনে থামতে বলল। ট্যাক্সি একটা দোতালা বাড়ির সামনে থামল।

নরবার্ট ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে বাঁ হাতে নিজের সুটকেস আর ডান হাতে আমারটা নিয়ে সদর দরজায় গিয়ে বেল টিপল। অল্পক্ষণের মধ্যেই একটা চাকর এসে দরজা খুলতে নরবার্ট তার হাতে ব্যাগগুলো চালান দিয়ে আমাকে সঙ্গে করে সিঁড়ি দিয়ে পা চালিয়ে দোতালায় উঠে গেল।

'আগে বাবাকে দেখবে তো?'

'এক্ষুনি, এক্ষুনি।'

একটা বইয়ে ঠাসা ঘরের ভিতর দিয়ে যে ঘরে গিয়ে ঢুকলাম, সেটা শোবার ঘর। একপাশে একটা খাটে লেপের তলায় একজন প্রৌঢ় শুয়ে আছেন আধবোজা চোখে। তাঁর হাঁ করা মুখ দিয়ে দমকে দমকে নিশ্বাস বেরোচ্ছে। ভদ্রলোকের পাতলা হয়ে আসা কালো চুলের অল্প পাকা চুল মিশেছে, আন্দাজে মনে হয় বছর পঞ্চান্ন বয়স। তাঁর মাথায় আর ডান কনুইয়ে ব্যান্ডেজ যে অপটু হাতের কাজ, সেটা দেখলেই বোঝা যায়। ইনিই যে হাইনরিখ স্টাইনার সেটা আর বলে দিতে হয় না।

খাটের পাশে দাঁড়িয়ে চোখের জল মুছছে একটি ষোলো-সতেরো বছর বয়সের মেয়ে। নরবার্ট তাকে দেখিয়ে বলল, 'আমার বোন লেনি।'

আমি এগিয়ে গিয়ে ভদ্রলোকের নাড়ী দেখলাম। স্পন্দন প্রায় নেই বললেই চলে। আমার বাবার মৃত্যুর সময় আমি পাশেই ছিলাম। তাঁর মুখে যে মৃত্যুর ছায়া দেখেছিলাম, এখানেও তাই দেখছি।

আর দেরি করা চলে না।

আমি জানতাম এই অবস্থায় বড়ি গেলানো চলবে না, তাই একটা কাগজের মোড়কে দুটো বড়ি গুঁড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। লেনিকে বললাম তোমার পাশেই টেবিলে ফ্লাস্ক আর গেলাস দেখছি; আমাকে এক গেলাস জল দাও।'

লেনি যখন ঢালছে, তখন একটা শব্দ শুনে আমার দৃষ্টি প্রফেসর স্টাইনারের দিকে চলে গেল। তাঁর ঠোঁট কাঁপছে। একটা শব্দ বেরোল— 'আ-হা'। আমি নরবার্টের দিকে চাইলাম।

'আমার মা-র নাম ছিল হানা।'

প্রোফেসারের মুখ এখনও হাঁ। আমি মোড়ক খুলে জলের গেলাস হাতে নিয়ে রুগির পাশে গিয়ে তাঁর হাঁ করা মুখের ভিতর জল আর পাউডার ঢেলে দিলাম।

'আর কিছু করতে হবে কি?' নরবার্ট প্রশ্ন করল। বললাম, 'হ্যাঁ, আমি একটু কফি খাব— ব্ল্যাক কফি।'

লেনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঘড়িতে বার্লিনের টাইম করে নিয়েছিলাম, দেখলাম পৌনে ছটা। জানলা দিয়ে দেখছি রাস্তার আলো জ্বলে গেছে, আকাশে তারা দেখা যাচ্ছে। এটা জানি যে, কাল সকালের আগে ওষুধের ফলাফল জানা যাবে না, তাই কফি খেয়ে নরবার্টকে বললাম, 'বার্লিনের একটা বিখ্যাত রাস্তার নাম আমি শুনেছি— কুরফ্যুরস্টেনডাম। সেটা একবার দেখে আসা যায় কি?'

'হাঁটতে রাজি আছ?'

'নিশ্চয়ই। দেশে আমি সকালে রোজ চার মাইল করে হাঁটি।'

'অবিশ্যি ক্লান্ত লাগলে সব সময়ই ট্যাক্সি নেওয়া যায়।'

আশ্চর্য!—পুলিশশাসিত দেশ, কর্ণধার হলেন দুর্নীতির পরাকাষ্ঠা, অথচ বাইরে থেকে রাজধানীর চেহারা দেখে কিছুই

বোঝার উপায় নেই। পুলিশ চোখে পড়ে ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে রয়েছে নিরুদ্বিগ্ন জনস্রোত, ঝলমলে দোকানপাট, সিনেমা থিয়েটারের বাইরে সুসজ্জিত নারী পুরুষের ভিড়। নরবার্টকে কথাটা বলাতে ও বলল, 'সেই জন্যই তো যারা অল্পদিনের জন্য এখানে আসে, তারা বাইরে থেকে হিটলারের শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে যা শুনেছে সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ শুরু করে।'

কুরফ্যুরস্টেনডামের একটা পোশাকের দোকানে কোট প্যান্ট শার্ট পুলোভার দেখছি, এমন সময় আমার ডান হাতের কনুইয়ে একটা মৃদু চাপ অনুভব করলাম। ঘুরে দেখি, একজন মাঝবয়সি মহিলা আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন।

'প্রোফেসার শ্যাঙ্কু?' ইতস্তত ভাব করে জিজ্ঞেস করলেন মহিলা। আমি মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলাতে দ্বিতীয় প্রশ্ন এল, 'কোয়নেন সি ডয়েচ?' অর্থাৎ, তুমি জার্মান বলো?

এ প্রশ্নের উত্তরেও হ্যাঁ বলাতে ভদ্রমহিলার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত, আর পরমুহূর্তে বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। আমার হাতদুটো ধরে কাতরকণ্ঠে মহিলা বললেন, 'হেলফেন মিখ, বিটে, হেলফেন মিখ, হের প্রোফেসর!' অর্থাৎ, দোহাই প্রোফেসর, আমাকে সাহায্যে করো। তাঁর কী হয়েছে জিজ্ঞেস করাতে ভদ্রমহিলা বললেন ত্রিশ বছর থেকে তাঁর ''কাটার'' বা সর্দির ধাত, আর সেই সঙ্গে মাথার যন্ত্রণা। 'তুমি তো জানো সর্দির ওষুধ আজ পর্যন্ত কেউ বার করতে পারেনি। তোমার ''আলহাইলমিটেল'' বড়ি মিরাকুরল একটা দাও আমাকে দয়া করে!''

'আলহাইলমিটেল' হলো সর্বরোগনাশক। এখনও যে ভদ্রমহিলার নাক বন্ধ হয়ে রয়েছে সেটা তাঁর কথা শুনেই বুঝতে পারছিলাম।

'তোমার নাম কী?' নরবার্ট জিজ্ঞেস করল।

'ফ্রয়লাইন ফিৎস্‌নার',— অর্থাৎ মিসেস ফিৎস্‌নার।

আমি বললাম, 'আমি দিতে পারি, কিন্তু একটা শর্তে। আমি যে তোমাকে ওষুধ দিয়েছি সেটা কাউকে বলবে না।'

ভদ্রমহিলা ঘন ঘন মাথা নেড়ে প্রতিজ্ঞা করলেন যে তিনি কাউকে বলবেন না।

আমার পকেটে চারটে বড়ি ছিল, তার দুটো প্রোফেসর স্টাইনারকে দিয়েছি, বাকি দুটো মহিলাকে দিয়ে দিলাম।

'তোমার কাছে কাগজ পেনসিল আছে?' নরবার্ট প্রশ্ন করল।

'ইয়া, ইয়া', বলে ভদ্রমহিলা তাঁর হ্যান্ডব্যাগ থেকে একটা ছোট্ট নোটবুক আর পেনসিল বার করলেন। নরবার্ট তাতে তার বাড়ির ফোন নম্বরটা লিখে দিয়ে বলল, 'কাল যে কোনও একটা সময় ফোন করে প্রোফেসরকে জানাবে তুমি কেমন আছো।'

ভদ্রমহিলা 'ডাঙ্কেশোয়েন, ডাঙ্কেশোয়েন' বলে ধন্যবাদ দিতে দিতে ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন।

আমরা কুরফ্যুরস্টেনডামেরই একটা রেস্টোরান্টে ডিনার সেরে নিলাম।

ন'টায় বাড়ি ফিরে প্রোফেসর স্টাইনারের ঘরে গিয়ে দেখলাম তিনি ঘুমাচ্ছেন। লেনিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার বাবা কি এর মধ্যে কোনো কথা বলেছেন?'

লেনি বলল, 'আরেকবার মা-র নাম করেছিলেন। আর বললেন— আমি আসছি।'

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমার ঘরে চলে এলাম। হে প্রভু— মিরাকিউরল যেন ব্যর্থ না হয়।

খাটের পাশে একটা টেবিলের উপর চকোলেট আর একটা ছোট্ট কার্ডে মেয়েলি হাতে লেখা 'গুটে নাট্‌ট'— অর্থাৎ গুড নাইট— দেখে বুঝলাম মায়ের অভাবে লেনি এই বয়সেই পাকা গৃহিণী হয়ে উঠেছে।

দিনে ধকল গেছে বলে রাত্রে ঘুমটা ভালই হলো। গিরিডিতে উঠি পাঁচটায়, এখানে ঘুম ভাঙতে ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি ছটা বাজতে পাঁচ। আসলে পালকের বালিশে শুয়ে আরামটা হয়েছে একটু বেশি।

আমি চটপট লেপের তলা থেকে বেরিয়ে মাটিতে পা দিতেই কণ্ঠস্বর কানে এল— উদাত্ত, সুরেলা কণ্ঠ। কিন্তু এ কী! এ যে সংস্কৃত, আর কথাগুলো আমার চেনা!—

'বেদাহমেতং পুরুষংমহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ...'— আমি এই তিমিরাতীত জ্যোতির্ময় মহাপুরুষকে চিনিয়াছি... এ যে উপনিষদের কথা! ছেলেবেলায় বাবাকে আবৃত্তি করতে শুনেছি, আর আজও মনে আছে।

আমি গায়ে একটা কোট চাপিয়ে নিয়ে কণ্ঠস্বর লক্ষ করে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম।

গলা আসছে প্রোফেসরের ঘরের দিক থেকে।

'ত্বমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্য পন্থা বিদ্যতেহয়নায়।'

সাধক কেবল তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করেন... তদ্ভিন্ন মুক্তিপ্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই।...

প্রোফেসরের ঘর খালি। ওই যে ওদিকে দরজা। তার ওদিকে ব্যালকনি!

রুদ্ধশ্বাসে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে দেখি, প্রোফেসর স্টাইনার ব্যালকনির অপর প্রান্তে আমার দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে ভোরের আকাশের দিকে চেয়ে উপনিষদ আবৃত্তি করছেন।

হয়তো আমার পায়ের আওয়াজ পেয়েই মাঝপথে থেমে গিয়ে আমার দিকে ঘুরে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে যেন একটু অবাক হয়েই প্রশ্ন করলেন, 'কস্তম্‌।' অর্থাৎ সংস্কৃতে 'তুমি কে?'

আমি জার্মানেই উত্তর দিলাম।

আমার নাম ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু।'

'ত্রিলোকেশ্বর?' বিষ্ণু, শিব ন সূর্য?'

আমি জানতাম আমার নাম তিনটেকেই বোঝায়। আমি মৃদু হেসে বললাম, 'কোনোটাই না। আমি ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের অধ্যাপনা করি। আমি একটা আশ্চর্য আয়ুর্বেদিক ওষুধ পেয়েছি, যেটা সবরকম ব্যারামেই কাজ করে। লন্ডনে—'

'মিরাকুরল?' ভদ্রলোক আমাকে বাধা দিয়ে বললেন। 'আমি তোমার ওষুধে ভালো হয়ে উঠেছি? আমি তাই ভাবছিলাম — এই চার বছর তো দুর্যোগ ছাড়া আর কিছু জোটেনি আমার কপালে, হঠাৎ ঈশ্বর আমার উপর এত সদয় হলেন কেন? ... কিন্তু, ত্রিলোকেশ্বর — আমি তো মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছিলাম; কারণ, বেঁচে থেকে তো আমার কোনো লাভ নেই!'

'লাভ আছে, প্রোফেসার স্টাইনার। কাল আপনার ছেলে বলছিল, আপনি ভালো হয়ে উঠলে আপনাকে জার্মানি থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার উপায় সে নিশ্চয়ই বার করবে। তাতে যদি প্রতারণার আশ্রয় নিতে হয় তাতেও ক্ষতি নেই। শঠে শাঠ্যম্‌ কথাটা তো আপনি জানেন। এই রাজ্যে এই অন্ধকার যুগে নীতির কথা ভাবলে চলবে না। আপনি বাইরে কোথাও চলে গিয়ে আপনার কাজ আবার শুরু করুন।'

সৌমদর্শন পণ্ডিত যেন আপন মনেই বলে উঠলেন, 'প্যারিস!... আঁদ্রে... আঁদ্রে ভের্সোয়া... আমার বন্ধু... সেও ভারততাত্ত্বিক... কতবার বলেছে এখানে চলে এসো, এখানে চলে এসো...'

'বেশ তো, তাই যাবেন আপনি!'

স্টাইনার উদাস দৃষ্টিতে সবে ওঠা সূর্যের দিকে চেয়ে বললেন, 'কত কাজ বাকি! কত কাজ বাকি! এরা কিছুই করতে দেয়নি আমাকে। ভাগ্যের কী পরিহাস! নাৎসি পার্টি — যাদের নাম উচ্চারণ করতে মন বিষিয়ে ওঠে — তারা স্বস্তিককে করেছে তাদের প্রতীক, সিম্বল, এমব্লেম! সু — অর্থাৎ ভালো, অস্তি — অর্থাৎ আছে; এই হলো স্বস্তি, আর তার থেকে স্বস্তিক। এরা বলে স্‌ভাসটিকা! এর চেয়ে —'

প্রোফেসরকে কথা থামাতে হলো। আর সেইসঙ্গে আমিও তটস্থ।

বাড়ির সদর দরজায় ধাক্কা পড়েছে সজোরে। একবার নয়, তিনবার।

'আবার তারা!' গভীর উৎকণ্ঠার সুরে বললেন স্টাইনার।

বাইরে একটা পায়ের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে নরবার্ট আর লেনি ব্যালকনিতে ছুটে এল।

বাবাকে সুস্থ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রথমে দু'জনেরই মুখ হাঁ হয়ে গেল। পরমুহূর্তে বিস্ময় কাটিয়ে উঠে নরবার্ট

তার বাবাকে হাত ধরে টেনে ঘরে নিয়ে গিয়ে বলল, 'বিছানাতে শুয়ে পড়ো—এক্ষুনি। মুমূর্ষর অভিনয় করতে হবে। গেস্টাপো আবার এসেছে।'

এর মধ্যে আরো তিনবার দরজায় ধাক্কা পড়েছে। স্টাইনার বিছানায় শোয়া মাত্র লেনি একটানে লেপটা তাঁর উপরে টেনে তাঁর চোখ বুজিয়ে মুখ হাঁ করিয়ে দিল।

'কয়খেন সী, পাপা!' অর্থাৎ হাঁপ ধরার মতো করে নিশ্বাস নাও, বাবা।

নরবার্ট ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, আমি তার পিছনে।

দরজায় আবার তিনগুণ জোরে ধাক্কা পড়েছে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে দরজা খুলতে সশস্ত্র পুলিশ ভিতরে ঢুকে এল। পরমুহূর্তে নরবার্টের দিক থেকে তার দৃষ্টি আমার দিকে ঘুরে এল। তারপর ডান হাত প্রসারিত করে উপরদিকে তুলে বলল, 'হাইল হিটলার!'

আমাকে নির্বাক দেখে পুলিশের গলা সপ্তমে চড়ে গেল।

'হাইল হিটলার!'

সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।

অর্ধেক কেন, আমি গোটা আত্মসম্মান ত্যাগ করে ঝামেলা বাঁচানোর জন্য ডান হাত তুলে দিব্যি বাজখাঁই গলায় বললাম, 'হাইল হিটলার'। প্রোফেসর স্টাইনারই যখন অভিনয় করছেন, তখন আমারই বা করতে আপত্তি কী?

পরে জেনেছিলাম ইনি গেস্টাপো নন। গেস্টাপোর কোনো ইউনিফর্ম নেই। ইনি হলেন গেস্টাপোর মাসতুতো ভাই 'ব্ল্যাকর্শার্ট'।

এবার হাত নামিয়ে ব্ল্যাক্শার্ট বললেন — আমার সঙ্গে চলো, জল্‌দি। — 'কম মিট মীর — শ্নেল্!'

লোকটা বলে কী? জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায়?'

'সে পরে জানতে পারবে। ভদ্র পোশাক পরে নাও, আর সঙ্গে তোমার যা কিছু আছে সব নিয়ে নাও।'

বুঝতে পারলাম আমি নিরুপায়, এদের আদেশ মানতেই হবে। বললাম, 'পাঁচ মিনিট সময় দাও। আমি তৈরি হয়ে আসছি।'

পোশাক বদলে সুটকেসটার দিকে দৃষ্টি দিতে মনে হলো, সন্ডার্সের দেওয়া লুগার অটোম্যাটিকটা তাতে রয়েছে। জানি এরা আমাকে সার্চ করতে পারে, তাও পিস্তলটা প্যান্টের পকেটে নিয়ে নিলাম।

ঘর থেকে যখন বেরোব, তখন নরবার্ট এসে হাজির — তার মুখ ফ্যাকাশে, চোখের কোলে জল চিকচিক করছে।

'আমায় ক্ষমা করো, প্রোফেসর!'

আমি নরবার্টের পিঠে দুটো চাপড় মেরে বললাম, 'ছেলেমানুষি কোরো না। আমার মনে হয় না এখন এরা তোমার বাবার উপর আর অত্যাচার করবে। এইবেলা ভেবে স্থির করো তোমরা কী করে পালাবে। আমার সম্বন্ধে একদম ভেবো না। আমার মন মিথ্যে বলে না, এটা আমি আগেও দেখেছি। মন বলছে আমার মৃত্যুর সময় এখনও আসেনি। কাজেই তোমার কর্তব্য তুমি করে যাও। এ দেশে তোমাদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। তোমার বাবা প্যারিস যেতে চান। তুমি তার ব্যবস্থা করো। মনে রেখো, এ অবস্থায় জাল, জুয়াচুরি, মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া—কোনোটাই অন্যায় নয়।'

নরবার্ট রুমাল দিয়ে চোখ মুছে বলল, 'একটা কথা...'

'কী?'

‘মিসেস ফিৎস্‌নার এক্ষুনি ফোন করেছিলেন। তাঁর সর্দি সেরে গেছে।’

‘গুড।’

নরবার্ট ও লেনিকে গুডবাই করে পুলিশের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। বাইরে এসে দেখি বাড়ির সামনে এক বিশাল কালো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। এমন গাড়ি আমি এর আগে দেখিনি, তাই নামটা জিজ্ঞেস না করে পারলাম না। উত্তর এল, ‘ডাইমলার’।

গাড়ির দরজা খুলে আমাকে ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়ে আমার পাশেই বসলেন পুলিশ। গাড়ি রওনা দিল। আর একটিমাত্র প্রশ্ন করেছিলাম, আর তার জবাবও পেয়েছিলাম।

‘আমরা কোথায় যাচ্ছি সেটা জানতে পারি কি?’

‘কারিনহল।’

এটা বুঝতে পারছিলাম যে, আমরা উত্তর দিকে চলছি। প্রশস্ত, আরামদায়ক গাড়ি, মসৃণ রাস্তা, গাড়ি যে চলেছে তা প্রায় টেরই পাওয়া যায় না। মিনিট পনেরো চলার পরেই তন্দ্রা এসে গেল।

যখন আবার সজাগ হলাম তখন দেখলাম বাইরের দৃশ্য একেবারে বদলে গেছে। আমরা শহর ছেড়ে গ্রামাঞ্চলে চলে এসেছি। গাছপালা খেতখামার, কৃষকদের ছোটো ছোটো কটেজ বাড়ি মিলিয়ে মনোরম দৃশ্য, যার সঙ্গে আমাদের দেশের পল্লীগ্রামের দৃশ্যের কোনো সাদৃশ্য নেই।

এতক্ষণ কথা না বলে অস্বস্তি লাগছিল, তাই আমার পার্শ্ববর্তী ভদ্রলোককে আরেকটা প্রশ্ন করলাম।

‘আমার নাম তো তুমি নিশ্চয় জানো; তোমারটা কী জানতে পারি?’

উত্তরে এল, ‘এরিখ ফ্রোম।’

এবারে বাইরের দৃশ্য বদলে গেল। এখানে গাছপালা অনেক বেশি, খোলা প্রান্তরের বদলে দুপাশে ফলের বাগান, যদিও শীতকাল বলে গাছের পাতা সব ঝরে গেছে।

এবারে বাঁয়ে একটা দীর্ঘ পাঁচিল পড়ল। কিছুদূর গিয়েই পাঁচিলের গায়ে একটা প্রকাণ্ড ফটকের মধ্যে দিয়ে আমাদের গাড়িটা ঢুকে গেল।

প্রায় আধ মিনিট ধরে আমরা এগিয়ে চললাম প্রশস্ত নুড়ি ঢালা পথ দিয়ে। এ কোথায় এলাম? কোনো বাসস্থানের চিহ্ন তো দেখতে পাচ্ছি না এখনও পর্যন্ত?

এবার একটা মোড় ঘুরেই আমাদের গন্তব্যস্থল চোখে পড়ল। এটা যে একটা প্রাসাদ তাতে সন্দেহ নেই, তবে প্রাচীন নয়। অথবা প্রাচীন হলেও, সম্প্রতি যে অনেক সংস্কার হয়েছে সেটা বোঝা যায়। একটা বিস্তীর্ণ বাগান—তাতে ফুলের কেয়ারি, লিলিপুল, শ্বেতপাথরের মূর্তি, সবই আছে—সেই বাগানের তিন দিক ঘিরে প্রাসাদ। তারই একটার বিশাল সদর দরজার সামনে আমাদের গাড়িটা থামল। আমরা দুজন গাড়ি থেকে নেমে প্রহরীকে পেরিয়ে সেই দরজা দিয়ে প্রাসাদের ভিতরে ঢুকলাম।

প্রথমেই পড়ল একটা ঘর, যেটা লম্বায় অন্তত পঞ্চাশ গজ তো হবেই। ঐশ্বর্যের এমন জলজ্যান্ত নমুনা আমি আর দেখিনি। মাথার উপর বিশাল বিশাল ঝাড়লণ্ঠন, দেয়ালে গিল্টি করা ফ্রেমে বাঁধানো জগদ্বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা তেলরঙের ছবি, ঘরের এ প্রান্তে দোতলায় যাবার জন্য প্রশস্ত ঘোরানো সিঁড়ি।

এই ঘর পেরিয়ে আমরা আরেকটা ঘরে পৌঁছোলাম, যেটাকে বলা যেতে পারে রিসেপশন রুম। এখানে বসার জন্য বড়ো বড়ো সোফা, কাউচ, বাহারের চেয়ার ছাড়া একপাশে একটা প্রকাণ্ড টেবিল, যার উপর রয়েছে কাগজপত্র, টেলিফোন, ফুলদানি, জলের ফ্লাস্ক ইত্যাদি।

এরিখ একটা সোফার দিকে নির্দেশ করে নিজে এক কোণে একটা সুদৃশ্য চেয়ারে বসল।

পুরু পারস্য দেশীয় কার্পেটের উপর দিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে সোফায় বসে নরম গদিতে প্রায় চার ইঞ্চি ডুবে গেলাম। এখনও জানি না কী কারণে আমাকে এখানে আনা হয়েছে। তবে এটা দেখেছি যে, একটি ভৃত্যস্থানীয় লোক আমাকে প্রাসাদে ঢুকতে দেখেই সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে গেছে।

মিনিট পাঁচেক বসার পর প্রাসাদের চতুর্দিক থেকে নানান ঘড়িতে ঢং ঢং করে আটটা বাজছে, এমন সময় এরিখ হঠাৎ তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে ডান হাত তুলে 'হাইল হিটলার' বলল। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করলেন ছাই রঙের ডাবল-ব্রেস্টেড সুট পরা বিশালবপু এক ব্যক্তি।

তিনি আমার দিকে এগিয়ে এসে 'স্প্রেখেন সি ডয়েচ?' প্রশ্ন করতেই আমি বুঝলাম এঁর ছবি আমি দেখেছি। আমি 'হ্যাঁ' বলতে ভদ্রলোক আরও দু'পা এগিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন।

'কেনেন সি মির?'

অর্থাৎ তুমি আমাকে চেন?

আমি বললাম, 'ভারতবর্ষে যারা খবরের কাগজ পড়ে, তাদের অধিকাংশই তোমার চেহারার সঙ্গে পরিচিত, হের্ গোয়রিং।'

'হিটলারের পরেই আমার স্থান', পায়চারি শুরু করে বললেন গোয়রিং। 'জার্মানির সামরিক শক্তির প্রধান কারণ আমি। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে জার্মানির তুল্য শক্তিশালী দেশ আর নেই।'

আমি চুপ করে রইলাম।

'তুমি এখন কোথায় এসেছ, জান?' পায়চারি থামিয়ে আমার দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন গোয়রিং।

আমি বললাম, 'কারিনহল।'

'কারিনহল কী জান?'

'মনে হচ্ছে তোমার বাসস্থান।'

'কারিন ছিল আমার প্রথম স্ত্রীর নাম। কারিন ফন কাট্সফ্। ১৯৩১-এ তার মৃত্যু হয়। কারিনহল আগে ছিল একটা হান্টিং লজ। এটাকে আমি কিনে নিয়ে একটি প্রাসাদে পরিণত করি। এটা একাধারে কারিনের স্মৃতিসৌধ এবং আমার কান্ট্রি হাউস। অদূর ভবিষ্যতে কারিনহল হবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৌধের মধ্যে একটি।'

আপাতত কথা শেষ। কিন্তু এটা বুঝতে পারছি যে, গোয়রিং একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে।

এবার যে প্রশ্নটার জন্য আমি অপেক্ষা করছিলাম, সেটা গোয়রিং-এর গম্ভীর গলায় উচ্চারিত হলো।

'সতেরো নম্বর ফ্রিডরিখস্ট্রাসের ওই বর্বর ইহুদি স্টাইনারের বাড়িতে তুমি কী করছিলে?'

আমায় কয়েক মুহূর্তে ভাবতে হলো। সত্যি বলব, না বানিয়ে বলব ? তারপর মনে হলো, বানিয়ে বলে হয়তো এখনকার মতো রেহাই পেতে পারি, কিন্তু আসলে কী ঘটেছে সেটা বার করতে এদের মতো দুর্ধর্ষ গুপ্ত পুলিশের সময় লাগবে না। তাই যতটা পারি সাহস সঞ্চয় করে বললাম, 'পুলিশি অত্যাচারে প্রোফেসর স্টাইনারের প্রাণ সংশয় হওয়াতে আমাকে লন্ডন থেকে নিয়ে আসা হয় ওঁর চিকিৎসার জন্য।'

'মিরাকুরলে কাজ দিয়েছে?'

'দিয়েছে।'

গোয়রিং-এর চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল।

'যে জাতকে আমরা নির্বংশ করতে চলেছি, তারই একজনকে তুমি অনুকম্পা দেখাচ্ছ? ইহুদিরা কী জান?'

আমি কিছু বলার আগেই গোয়রিং ইহুদিদের সম্পর্কে পাঁচটা বিশেষণ প্রয়োগ করল—গ্রাউসাম, নিডের, গাইৎসিগ, লিস্টিগ, বেডেনকেনলস। অর্থাৎ—অসভ্য, হীন, লোভী, ধূর্ত, বিবেকহীন।

লোকটার প্রতি আমার অশ্রদ্ধা ক্রমেই বাড়ছিল। এই শেষ কথাগুলোতে হঠাৎ আমার মাথা গরম হয়ে গেল। আমি বললাম, 'আমি জাত মানি না। আমি বিজ্ঞানী। একজন ইহুদি বৈজ্ঞানিক আমার আরাধ্য দেবতা। তাঁর নাম অ্যালবার্ট আইনস্টাইন।'

চোখের সামনে গোয়রিং-এর মুখ দেখতে দেখতে লাল হয়ে গেল।

'তুমি কি ভাবছ স্টাইনার রেহাই পাবে?'

'ভাবছি না, আশা করছি।'

'তোমার আশা আমি পায়ের তলায় গুঁড়িয়ে দিলাম। স্টাইনারের মেয়াদ শুধু আজকের দিনটা। একটি ইহুদিকেও আমরা পার পেতে দেবো না। তারাই আমাদের দেশকে সর্বনাশের পথে নিয়ে যাচ্ছিল। আগাছার মতো তাদের একেকটাকে ধরে ধরে উপড়ে ফেলতে হবে।'

ইহুদিদের বিরুদ্ধে এ জাতীয় বিদ্বেষ-বর্ষণ শুনতে আমার মোটেই ভালো লাগছিল না। আমি একটু কড়া সুরেই বললাম, 'হের

গোয়রিং, আমাকে এখানে আনার উদ্দেশ্যটা কী, সেটা জানতে পারি?'

গোয়রিং যেন কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হয়ে বলল, 'বিনা কারণে আনিনি। একটা উদ্দেশ্য ছিল একজন ভারতীয়কে আমার এই কান্ট্রি হাউসটা দেখানো—এর আগে কোনো ভারতীয় দেখেনি—কিন্তু আসল উদ্দেশ্য সেটা নয়।'

'তা হলে?'

গোয়রিং আমার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বলল—

'আমাকে দেখে আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তোমার কী ধারণা হয়?'

'তোমার মতো মোটা লোককে স্বাস্থ্যবান বলা চলে না নিশ্চয়ই, আর তোমার মতো ঘামতে আমি আর কাউকে দেখিনি। এই দশ মিনিটের মধ্যে পাঁচবার তুমি রুমাল বার করে মুখ মুছেছ। অবিশ্যি আমি তো ডাক্তার নই, কাজেই তোমার ব্যারামটা কী, তা আমি আন্দাজ করতে পারছি না।'

গোয়রিং হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে গলা সপ্তমে চড়িয়ে বলল, 'তুমি কি জান যে, এই ঘামের জন্য আমাকে দিনে আটবার শার্ট বদল করতে হয়? তুমি কি জান যে, আমার ওজন একশো সত্তর কিলো? ড্রুসে কাকে বলে জান?

'জানি।'

ড্রুসে হচ্ছে ইংরেজিতে যাকে বলে গ্ল্যান্ড, বাংলায় গ্রন্থি।

'এই ড্রুসেই হলো যত নষ্টের গোড়া,' বলল গোয়রিং। 'সেটা আমার ডাক্তার জানে। কিন্তু নানারকম চিকিৎসাতেও কোনো ফল দেয়নি। অথচ আমি যে শারীরিক পরিশ্রম করি না, তা নয়; আমি হাঁটি, আমি টেনিস খেলি—যদিও যার সঙ্গে খেলি তাকে বলে দিতে হয় যে, বল যেন আমার হাতের নাগালে পড়ে, কারণ আমি দৌড়োতে পারি না। এ ছাড়া আমি নিয়মিত শিকার করি। অথচ—'

'খাওয়া ? অতিরিক্ত আহার কিন্তু মোটা হবার একটা বড়ো কারণ।'

গোয়রিং একটুক্ষণ চুপ থেকে বলল, 'খেতে আমি অত্যন্ত ভালোবাসি। দিনে চারবার খাওয়ায় আমার হয় না। ঘণ্টায় ঘণ্টায় স্যান্ডউইচ, সসেজ, বিয়ার আনিয়ে খেতে হয়। কিন্তু আমি তো আরও অনেক খাইয়েকে জানি; তারা তো আমার মতো মোটা নয়, আর আমার মতো অনবরত ঘামে না। এই অতিরিক্ত চর্বির জন্য কাজের কী অসুবিধা হয়, তা তুমি জান?'

আমি কোনো মন্তব্য করলাম না দেখে গোয়রিং আবার মুখ খুলল।

'তোমার ওষুধে কী কী অসুখ সারিয়েছ?'

'ক্যানসার, যক্ষ্মা, উদরি, হাঁপানি, ডায়াবেটিস...'

'তা যদি হয়, তা হলে তোমার ওষুধে আমার গ্ল্যান্ডের গোলমাল নিশ্চয়ই সারবে। কটা বড়ি খেতে হয় রুগিকে?'

'সাধারণত দুটো, এবং একবারই খেতে হয়।'

'কদিনে ফল পাওয়া যায়?'

'আমার অভিজ্ঞতায় চব্বিশ ঘণ্টার বেশি লাগে না।'

'ওষুধ আছে তোমার সঙ্গে?'

'আমার সব কিছুই তো সঙ্গে নিয়ে আসতে বলা হয়েছিল।'
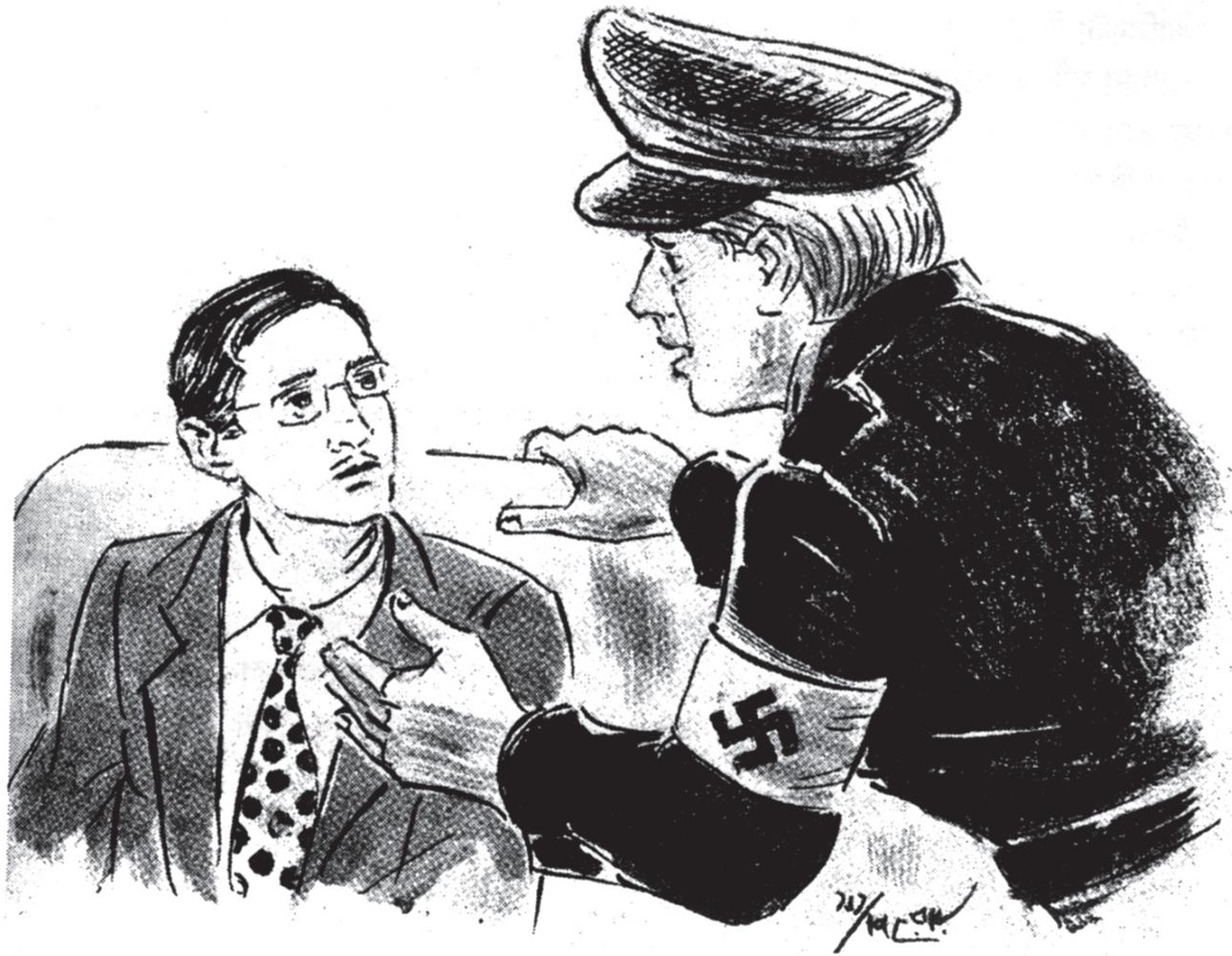
‘তা হলে দুটো আমাকে দাও। আমি এখনই খাব।’

‘ওষুধ আমি দেবো, হের্ গোয়রিং—কিন্তু একটা শর্তে।’

‘কী?’

‘কাল প্রোফেসর স্টাইনার তাঁর ছেলে মেয়েকে নিয়ে প্যারিস যাবেন। তুমি যথাস্থানে আদেশ দাও যে, তাঁদের যেন কেউ বাধা না দেয়।’

এবার গোয়রিং-এর মুখ শুধু লাল হলো না, সেই সঙ্গে তার সর্বাঙ্গে কাঁপুনি ধরল। তারপর রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে সে ঘর কাঁপিয়ে বলে উঠল, ‘দুশো বছর ধরে যে জাত পরাধীন হয়ে আছে, তাদেরই একজনের এত বড়ো আস্পর্ধা!—এরিখ, আমি এই ব্যক্তিকে এবং এর ব্যাগ সার্চ করতে চাই ; তুমি এর দিকে রিভলবার তাগ করে থাকো।’

এরিখের অস্তিত্ব প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। এবার সে দ্রুতপদে এগিয়ে এসে কোমরের খাপ থেকে রিভলবার বার করে আমার দিকে উচিয়ে দাঁড়াল। এবার গোয়রিং আমার দিকে এগিয়ে আসতে আমি হাত তুললাম।

'হাল্ট, হের্ গোয়রিং!'

গোয়রিং থতমত খেয়ে বলল, 'মানে?'

আমি মনে মনে স্থির করে নিয়েছিলাম, এ অবস্থায় যা বললে কাজ হবে, সেটাই বলব।

'এ ওষুধ স্বপ্নে পাওয়া ওষুধ, হের্ গোয়রিং,' অকম্পিত কণ্ঠে বললাম আমি। 'যে গাছ থেকে এ ওষুধ তৈরি হয় সেটা কোথায় পাওয়া যায়, তা আমি স্বপ্নে জেনেছি। এও জেনেছি যে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ ওষুধ প্রয়োগ করলে এতে ফল তো হয়ই না, বরং অনিষ্ট হতে পারে। তুমি কি চাও যে তোমাকে আটের জায়গায় বারো বার করে শার্ট বদল করতে হয়? কাজেই রিভলভার দেখিয়ে কোনো ফল হবে না, হের্ গোয়রিং। তুমি এরিখকে যেতে বলো। তারপর আমি বাক্স থেকে ওষুধের শিশি বার করব, তারপর তুমি ফোন করে স্টাইনারের পথে বাধা অপসারণ করবে, তারপর আমি তোমাকে ওষুধ দেবো।'

আমার কথাগুলো গোয়রিং-এর মগজে ঢুকতে খানিকটা সময় নিল। তারপর এরিখকে রিভলভার নামাবার জন্য ইশারা করে টেবিল থেকে টেলিফোনটা তুলে বলল, 'আন্টনকে দাও।'

এর পরে টেলিফোনে যা কথা হলো তা থেকে বুঝলাম যে, আন্টন নামধারী ব্যক্তিটিকে বলা হয়েছে স্টাইনারদের পলায়নের পথে বাধার সৃষ্টি না করতে।

টেলিফোন নামিয়ে রেখে গোয়রিং টেবিলেই রাখা ফ্লাস্ক থেকে গেলাসে জল ঢেলে সেটা হাতে করে আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

'দাও, তোমার ট্যাবলেট দাও। তবে দুটো নয়, চারটে।'

আমি ব্যাগ খুলে শিশি থেকে চারটে বড়ি বার করে গোয়রিং-এর হাতে দিলাম। গোয়রিং সেগুলো একবারেই গিলে ফেলল।

আমি বললাম, 'এবার আমার ছুটি তো?'

'মোটেই না!' জলদ্গম্ভীর কণ্ঠে বলল গোয়রিং।

'মানে?'

'অত সহজে ছুটি পাবে না তুমি। দু' দিনের মধ্যে যদি দেখি, আমি আর ঘামছি না, তা হলে বুঝব তোমার ওষুধে কাজ দিয়েছে। দু' দিনের পর তোমার বড়ির কেমিক্যাল অ্যানালিসিস করা হবে। যদি—'

আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'অ্যানালিসিস লন্ডনেই হয়ে গেছে; তাতে জানা গেছে যে, বড়িতে একটা বিশেষ উপাদান রয়েছে, যেটাকে আইডেনটিফাই করা যাচ্ছে না। অতএব—'

এবার গোয়রিং বাধা দিল আমাকে।

'ব্রিটিশরা নিপাত যাক! আমাদের ল্যাবরেটরির সঙ্গে লন্ডনের ল্যাবরেটরির তুলনা করছ তুমি?'

'যদি সেই অচেনা উপাদানকে তোমাদের ল্যাবরেটরি চিনতে পারে, তা হলে কী করবে তুমি?'

'কৃত্রিম উপায়ে এই বড়ি তৈরি করাব।'

'তারপর বাজারে ছাড়বে?'

'মোটেই না! এ ওষুধ ব্যবহার করবে শুধু আমাদের পার্টির লোক। যারা পার্টির মাথায় রয়েছে তারাও নানান রোগে ভুগছে। প্রত্যেক বক্তৃতার পর হিটলারের রক্তের চাপ মারাত্মকভাবে বেড়ে যায়। গোয়বেলসের ছেলেবেলায় প্যারালিসিস হয়েছিল, তাই

সে খুঁড়িয়ে চলে। পার্টির প্রচারসচিবের পক্ষে সেটা অশোভন; ওকে সোজা হাঁটতে হবে। হিমলারের হিস্টিরিয়া আছে, আর সে মাথার যন্ত্রণায় ভোগে। ... কাজেই ল্যাবরেটরির রিপোর্ট যদ্দিন না আসে, তদ্দিন তোমাকে এখানে থাকতে হবে। ইয়ে—তুমি ব্রেকফাস্ট করে এসেছ?'

'না।'

'আমি শার্ট বদল করতে একটু ওপরে যাচ্ছি ; আমার লোককে বলে দিচ্ছি তোমায় ব্রেকফাস্ট এনে দেবে।'

গোয়রিং ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কে জানত, বার্লিনে এসে এদের খপ্পরে পড়তে হবে? সন্ডার্সকে যে খবর দেবো তারও উপায় নেই। কবে যে ফিরতে পারব তাও জানি না। সবচেয়ে খারাপ লাগছিল এটা ভাবতে যে, যদি এরা সেই অজ্ঞাত উপাদানকে চিনে ফেলতে পারে, তা হলে আমার সাধের স্বর্ণপর্ণী দুর্বৃত্ত নাৎসি নেতাদের রোগ সারানোর কাজে ব্যবহার হবে।

এইসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ এরিখের দিকে চোখ পড়তে দেখি, সে ভারী অদ্ভুতভাবে আমার দিকে চেয়ে আছে—ভাবটা যেন, সে একটা কিছু বলতে চায়। এবং তার জন্য সাহস সঞ্চয় করছে।

দুজনে চোখাচোখি হবার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই এরিখ চেয়ার থেকে উঠে কেমন যেন অনুনয়ের দৃষ্টি নিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়াল।

'কী ব্যাপার, এরিখ?'

'হের্ প্রোফেসর,' কাতরকণ্ঠে বলল এরিখ, 'আজ একমাস হলো আমার এক ব্যারাম দেখা দিয়েছে, যার ফলে হয়তো আমার চাকরি আর থাকবে না।'

'কী ব্যারাম?'

'এপিলেপসি।'

মৃগী রোগ। বিশ্রী ব্যারাম। আচমকা আক্রমণ করে। আর তার ফলে মানুষ দাঁত মুখ খিঁচিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

'তিনবার এটা হয়েছে আমার', বলল এরিখ।

'কিন্তু কপালজোরে কাজের সময় হয়নি। ডাক্তার দেখিয়েছি, ওষুধ খাচ্ছি। কিন্তু সারতে নাকি সময় লাগবে। দুশ্চিন্তায় রাত্রে আমার ঘুম হচ্ছে না। দোহাই প্রোফেসর, তুমি ছাড়া আমার গতি নেই।'

ব্ল্যাকশার্টের এই দশা দেখে আমার হাসিও পেল, মায়াও হলো। শিশি আমার পকেটেই ছিল, দুটো বড়ি বার করে এরিখকে দিলাম।

'ফিয়ের, বিটে, ফিয়ের!'

এও চারটে চাইছে!

দিলাম দিয়ে আরও দুটো। এরিখ সেগুলো গিলে আন্তরিকভাবে আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবার নিজের জায়গায় গিয়ে বসল।

গোয়রিং শার্ট বদলাতে গেছে। কতই বা সময় লাগবে? দশ মিনিট? আমি সোফায় হেলান দিয়ে বসে বাঁ পাটা ডান পায়ের উপর তুলে দিয়ে প্লাস্টারের নকশা করা সিলিং-এর দিকে চেয়ে গত চব্বিশ ঘণ্টার কথা ভাবতে লাগলাম। কী অদ্ভুত অভিজ্ঞতা! অ্যাদ্দিন যা খবরের কাগজের পাতায় পড়েছি, এখন তার সবই দেখছি চোখের সামনে।

সময় আছে দেখে সুটকেস থেকে আমার নোটবইটা বার করে বার্লিনের ঘটনা লিখতে শুরু করলাম। বোম্বাই থেকে জাহাজে ওঠার সময় থেকেই আমি ডায়রি লিখতে শুরু করেছি।

খানিকটা লিখে একটা অদ্ভুত শব্দ পেয়ে থেমে গেলাম।

আমার দৃষ্টি এরিখের দিকে ঘুরে গেল। তার মাথা নুইয়ে পড়েছে বুকের উপর। শব্দটা হচ্ছে তার নাক ডাকার। বোঝো! এমন কর্তব্যনিষ্ঠ সদা তৎপর পুলিশ, সে কিনা আমাকে পাহারা দিতে দিতে ঘুমিয়ে পড়ল! গোয়রিং এসে দেখলে তো তুলকালাম কাণ্ড হবে!

কিন্তু গোয়রিং আসবে কি? আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে যে, চারটে বড়ি ওভার ডোজ হয়ে গেছে, এবং প্রয়োজনের বেশি খাওয়ার একটা ফল হচ্ছে প্রথম অবস্থায় ঘুমে ঢলে পড়া। আমি যে এতদিন দুটো দিয়ে এসেছি সেটা তো আন্দাজে, আর প্রথম ব্যারামে দুটোতেই কাজ দেওয়াতে প্রতিবারই দুটো দিয়েছি।

আরও পাঁচ মিনিটে আমার দিনলিপি শেষ করে আমি উঠে পড়লাম। এরিখের নাসিকা গর্জন এখন আগের চেয়েও বেড়েছে। গোয়রিং যখন এখনও এল না, তখন আমার ধারণা বদ্ধমূল হলো যে, সেও ঘুমিয়ে পড়েছে।

আমি নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরোলাম। বড়ো হলটায় পা দিতেই দেখলাম একটি চাকর ব্রেকফাস্টের ট্রে হাতে করে আমারই দিকে এগিয়ে আসছে। আমাকে ঘরের বাইরে দেখে একটু অবাক হয়েই সে বলল, ইর ফ্র্যুস্টুক, হের প্রোফেসর।'—ফ্রুস্টুক হলো ব্রেকফাস্ট।'

আমি বললাম, 'তা তো দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু তোমার মনিবের কেন এত দেরি হচ্ছে বলতে পার?'

'ইয়া, ইয়া।'

'কেন?'

'এর শ্লেফ্‌ট।'—অর্থাৎ তিনি ঘুমোচ্ছেন। অর্থাৎ আমার ধারণা নির্ভুল।

আমি চাকরকে বললাম ব্রেকফাস্ট টেবিলের উপর রেখে দিতে। চাকর ট্রে সমেত রিসেপশন রুমে ঢুকে গেল।

কপালজোরে এই সুযোগ জুটেছে। এটার সদ্ব্যবহার না করলেই নয়।

আমি হল থেকে বেরিয়ে বাইরে এলাম।

ওই যে ডাইমলার দাঁড়িয়ে আছে, গাড়ির চালক পকেটে হাত দিয়ে তার পাশে পায়চারি করছে।

আমি এগিয়ে গেলাম। কী করব তা স্থির করে ফেলেছি।

আমায় আসতে দেখে ড্রাইভার দাঁড়িয়ে পড়ল। পকেট থেকে তার হাত দুটো বেরিয়ে এল। সে অবাক হয়েছে। আমার আসাটা তার হিসেবের বাইরে।

আমি এগিয়ে গিয়ে ওর সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, 'আমাকে বার্লিন নিয়ে চলো। যেখান থেকে এসেছি সেখানে।'

ড্রাইভার হাঁ-হাঁ করে উঠল।

'নাইন ! ইখ কান এস্ নিখ্‌ট!'—না, আমি তা করতে পারি না।

'এবার পার?'

আমি পকেট থেকে সন্ডার্সের দেওয়া লুগার অটোম্যাটিকটা বার করে ড্রাইভারের দিকে উচিয়ে ধরেছি।

ড্রাইভারের মুখ মুহূর্তে ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

'ইয়া,ইয়া, ইয়া!'

ড্রাইভার নিজেই দরজা খুলে দিল। আধ ঘণ্টার মধ্যে সতেরো নম্বর ফ্রিডরিখস্ট্রাসেতে পৌঁছে গেলাম।

স্টাইনার পরিবারের তিনজনই আমার জন্য গভীর উৎকণ্ঠায় সময় কাটাচ্ছিল। প্রোফেসর স্টাইনার আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। নরবার্ট বলল, 'কী ব্যাপার? কোথায় নিয়ে গিয়েছিল তোমাকে?'

আমি সংক্ষেপে ঘটনাটা বলে বললাম, 'তোমরা এক্ষুনি তোড়জোড় শুরু করো। কালই প্যারিস চলে যাও। কেউ তোমাদের বাধা দেবে না। আমি আজই বিকেলের প্লেনে লন্ডনে ফিরে যাব। নরবার্ট, তুমি দয়া করে বুকিং-এর ব্যবস্থাটা করে দাও।'

বিকেলে চারটের ফ্লাইটে উড়ন্ত প্লেনে বসে বুঝলাম, মনের মধ্যে দুটো বিপরীত ভাবের দ্বন্দ্ব চলেছে। অন্তত একটা ইহুদি পরিবারকে নাৎসি নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করতে পেরেছি বলে যেমনই আনন্দ হচ্ছে, তেমনই অভক্তি হচ্ছে ভেবে যে, আমার ওষুধের ফলে দুটি নরপিশাচ ব্যারামের হাত থেকে রেহাই পেল।

সন্ডার্স ভাবতে পারেনি আমি এত তাড়াতাড়ি ফিরব। বার্লিনে কী হলো জানবার জন্য সকলেই উৎসুক। 'তোমার যাত্রা সফল কি না সেটা আগে বলো।'

আমি বললাম, 'একদিক দিয়ে অভাবনীয়ভাবে সফল। স্টাইনার সুস্থ এবং তাদের সমস্ত সমস্যা দূর।'

'ব্রাভো!'

'কিন্তু সেইসঙ্গে আরেকটা ব্যাপার আছে, যেটা শুনে তুমি মোটেই খুশি হবে না।'

'কী ?'

'তোমার অনুমানে ভুল ছিল না, সন্ডার্স!'

'তোমাকে নাৎসিদের খপ্পরে পড়তে হয়েছিল?'

'হ্যাঁ।'

আমি ব্ল্যাকশার্ট গোয়রিং সংক্রান্ত ঘটনার একটা রুদ্ধশ্বাস বর্ণনা দিয়ে বললাম, 'চারটে করে মিরাকিউরলের বড়ি যদি শুধু ওদের ঘুম পাড়িয়ে আমাকে পালাবার সুযোগ করে দিত তা হলে কথা ছিল না। কিন্তু সেইসঙ্গে ওই দুই পাষণ্ডের দুই বিশ্রী ব্যারাম সারিয়ে দিল ভাবতে আমার মনটা বিষিয়ে উঠছে। তুমি বিশ্বাস করো, সন্ডার্স!'

কিন্তু এটা কি! সন্ডার্সের ঠোঁটের কোণে হাসি কেন?

এবার সে তার প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে আমার অচেনা একটা শিশি বার করল, তাতে সাদা বড়ি।

'এই নাও তোমার মিরাকিউরল।'

'মানে?'

'খুব সহজ। সেদিন তুমি আর ডরথি বেরোলে, আমি প্রবন্ধ লেখার জন্য রয়ে গেলাম। সেই ফাঁকে আমি তোমার বাক্স খুলে তোমার শিশি থেকে মিরাকিউরল বার করে তার জায়গায় অব্যর্থ ঘুমের ওষুধ সেকোন্যালের বড়ি ভরে দিয়েছিলাম। একসঙ্গে চারটে সেকোন্যালের বড়ি যে মারাত্মক ব্যাপার—দশ মিনিটের মধ্যে নিদ্রা অবধারিত !... মাই ডিয়ার শঙ্কু—তোমার মহৌষধ বিশ্বের হীনতম প্রাণীর উপকারে আসবে এটা আমি চাইনি, চাইনি, চাইনি!'

আমার মন থেকে সব অন্ধকার দূর হয়ে গেল। সন্ডার্সের হাতটা মুঠো করে ধরলাম—মুখে কিছু বলতে পারলাম না।

আনন্দমেলা। পূজাবার্ষিকী ১৩৯৭

প্রাসঙ্গিক নির্দেশিকা

প্রশ্নের কাঠামো ও নম্বর বিভাজন

	বহু বিকল্পীয় প্রশ্ন (MCQ)	অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন (Very Short Answer Type)	রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay Type)	পূর্ণমান (Total)
সহায়ক গ্রন্থ	১ × ৩ =৩	১ × ২ = ২	৫ × ১ = ৫	১০

নির্ধারিত শব্দসংখ্যা

০৫ নম্বরের প্রশ্নের জন্য : কম-বেশি ১৫০টি

০১ নম্বরের প্রশ্নের জন্য : কম-বেশি ১৫টি

শিক্ষাবর্ষে পাঠ-পরিকল্পনা

প্রথম পর্যায়	ব্যোমযাত্রীর ডায়রি
দ্বিতীয় পর্যায়	কর্ভাস
তৃতীয় পর্যায়	স্বর্ণপর্ণী

নতুন প্রশ্নের কাঠামো অনুসারে বিভিন্ন প্রশ্নের নমুনা :

১. ঠিক উত্তরটি বেছে নাও :

১.১ প্রোফেসর শঙ্কুর জন্মদিন হলো—

(ক) ২০ জানুয়ারি (খ) ৩ মে

(গ) ১৬ জুন (ঘ) ২৫ ডিসেম্বর

১.২ কর্ভাস হলো কাক জাতীয় পাখির .... নাম।

(ক) ল্যাটিন (খ) গ্রিক (গ) জার্মান (ঘ) স্পেনীয়

১.৩ প্রোফেসর ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কুর ডায়রিটি লেখক পান—

(ক) প্রহ্লাদের কাছ থেকে

(খ) অবিনাশবাবুর কাছ থেকে

(গ) তারক চাটুজ্যের কাছ থেকে

(ঘ) সত্যজিৎ রায়ের কাছ থেকে

২. কম-বেশি ১৫টি শব্দে উত্তর লেখো :

২.১ ‘কর্ভাস যে এখন সাধারণ কাকের থেকে নিজেকে আলাদা রাখতে চায়’— প্রোফেসর শঙ্কু কীভাবে তার প্রমাণ পেলেন ?

২.২ ‘কিন্তু এ কী! সন্ডার্সের ঠোঁটের কোণে হাসি কেন?’— বক্তা এই প্রশ্নের কী উত্তর পেলেন তা সংক্ষেপে লেখো।

৩. কম-বেশি ১৫০টি শব্দে উত্তর লেখো :

৩.১ প্রোফেসর শঙ্কুর ‘মিরাকিউরল’ ওষুধ আবিষ্কার কাহিনি ‘স্বর্ণপর্ণী’ গল্প অবলম্বনে লেখো।

৩.২ বিধুশেখর বলল, ‘গবাক্ষ উদ্‌ঘাটন করহ’।— বিধুশেখরের কথা শোনার ফলে প্রোফেসর শঙ্কুর যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা গল্প অনুসারে আলোচনা করো।